কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা

প্রস্তুতি সহায়ক তাফসীর নোট

মাউন ফাউন্ডেশন

সূচীপত্র

ভূমিকা	২
নোট-১: সূরা ফজর	৩
নোট-২: সূরা গাশিয়াহ	১৭
নোট-৩: সূরা আ'লা	২৮
নোট-৪: সূরা ত্বারিক	৩৯
নোট-৫: সূরা বুরুজ	৪৭
নোট-৬: সূরা নিসা (১-১০ আয়াত)	৬৪
নোট-৭: সূরা নিসা (১১-১৪ আয়াত)	৭৩
নোট-৮: সূরা নিসা (১৫-২২ আয়াত)	৮৪
নোট-৯: সূরা নিসা (২৩-৩৩ আয়াত)	৯১
নোট-১০: সূরা আনকাবুত (১-১৩ আয়াত)	১০৩
নোট-১১: সূরা আনকাবুত (১৪-২২ আয়াত)	১১৭
নোট-১২: সূরা আনকাবুত (২৩-৩০ আয়াত)	১২৭
নোট-১৩: সূরা আনকাবুত (৩১-৪৪ আয়াত)	১২৯
নোট-১৪: সূরা হাদীদ (১-১০ আয়াত)	১৩৮
নোট-১৫: সূরা হাদীদ (১১-১৯ আয়াত)	১৪৯
নোট-১৬: সূরা হাদীদ (২০-২৯ আয়াত)	১৫৭
নোট-১৭: সূরা সফ (১-৯ আয়াত)	১৬৭
নোট-১৮: সূরা সফ (১০-১৪ আয়াত)	১৭৮
নোট-১৯: সূরা মুযাম্মিল	১৮৩
নোট-২০: সূরা কিয়ামাহ	১৯৭
নোট-২১: ইলমুত তাজওঈদ	২১০
নোট-২২: লুগাতুল কুরআন	২১৪
নোট-২৩: উলুমুল কুরআন	২১৫
মাউন পরিচিতি	২১৯

ভূমিকা

একটি আর্দশিক ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ গাইডলাইন নিয়ে কুরআন এসেছে। এই কুরআন বুঝার ও অধ্যয়ন ব্যাপারে বেশিভাগই মানুষ গাফিল। কুরআন তিলাওয়াত আমরা প্রায় সময় করে থাকলেও কুরআন অধ্যয়ন অনেক সময় হয়ে উঠে না। কুরআন অধ্যয়নের জন্য প্রয়োজন প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়া'লা ও কুরআনের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধির দৃঢ় আকাংখা। তবেই সম্ভব নিয়মিত কুরআন অধ্যয়ন করা। কুরআন অধ্যয়নের ব্যাপারে আগ্রহী করে তুলার লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে আমাদের কর্মসূচী - **কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা**।

কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতার কিছু অর্জন হলো-

- বিগত তিন বছরে প্রায় ৯ হাজার কুরআন প্রেমী মানুষ আমাদের সাথে যুক্ত ছিলেন।
- কুরআন বুঝা কতটা সহজ ও উপভোগ্য তা আমরা সফলতার সাথে তুলে ধরতে পেরেছি।
- ৫টি তাফসীরের সমন্বয়ে আমরা নোট করে প্রদান করেছি যার থেকে সবাই খুব বেশী উপকৃত হয়েছেন।
- অনুবাদ, তাফসীর, নামকরণ, ফুটনোট, সূরাগুলো পারস্পারিক সম্পর্ক ইত্যাদি উল্লেখপূর্বক আমরা একটি স্যান্ডার্ড ফরমেট দিয়েছি কুরআন অধ্যয়নের জন্য।
- বাছাইকৃত সূরা ও আয়াত দিয়ে সিলেবাস তৈরী করার কারণে কুরআন অধ্যয়নে আগ্রহী করতে পারছি পিপাসার্ত কুরআন প্রেমীদের।
- সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো শুধুমাত্র সময় অপচয় না করে কিভাবে এর উত্তম ব্যবহারে জ্ঞানার্জনের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা যায় এই উদাহরণ স্থাপন করেছে- কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা।

রামাদান মাস এক মহা সুযোগ। তাই রামাদান মাসে ঘিরে আমাদের আয়োজন- কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা। আমরা চেষ্টা করছি এমন একটা প্ল্যাটফর্ম দিতে যাতে কুরআন অধ্যয়নের প্রতি আগ্রহ বাড়ে এবং এটি পরিণত হয় অভ্যাসে। আমরা প্রতি রামাদানেই এমন আয়োজন করে থাকি। তারই ধারাবাহিকতায়- বিগত প্রতিযোগিতার সাড়া, আগ্রহ এবং উচ্ছ্বাস দেখে আমাদের মনে হয়েছে আমাদের আয়োজন বিফলে যায় নি। কুরআন অধ্যয়নের তৃষ্ণা মানুষের মধ্যে আছে। একটু মোটিভেশন, গাইডলাইন এবং সহযোগিতা পেলে নিয়মিত কুরআন অধ্যয়নে আগ্রহী হয়ে উঠবেন। তাই প্রতিবারের ন্যায় ২০২৪ সালেও ভিন্ন সিলেবাস নিয়ে আয়োজন করা হয়েছে- 'কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা-২০২৪'

প্রতিযোগীদের অধ্যয়ন সহজ করে দিতে এবং রিসোর্স সমস্যা কাটিয়ে উঠতে আমরা তৈরী করে দিয়েছি **'প্রস্তুতি সহায়ক তাফসীর নোট'**। প্রস্তুতি সহায়ক এই নোট তৈরী করতে তাফসীরে ইবনে কাসীর, তাফসীরে যাকারিয়া, তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন, তাফহীমুল কুরআন, তাফসীরে আহসানুল বায়ান, ফাতহুল মাজীদ, তাফসীরে জালালাইন সহ বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থ থেকে হুবহু তথ্য নেওয়া হয়েছে। আমাদের সীমাবদ্ধতার কারণে রেফারেন্সগুলো সঠিকভাবে উল্লেখ করতে পারি পারিনি এজন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। এছাড়াও বিভিন্ন ভাই-বোনের তৈরী করা দারস/নোট এবং ইন্টারনেট থেকে প্রাপ্ত তথ্য ইত্যাদির সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে। আল্লাহ্ প্রত্যকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমীন।

আমাদের এই নোটগুলোতে কোনো ধরনের ভুল পরিলক্ষিত হলে অথবা অন্য কোনো পরামর্শ থাকলে আমাদের জানাবেন ইনশাআল্লাহ।

আমরা বিশ্বাস করি একমাত্র কুরআন উপলব্ধির মাধ্যমেই দুনিয়ার মানুষের অন্তরের প্রশান্তি আসবে, নীতি-নৈতিকতার ভিত্তি তৈরী হবে এবং নানামুখী অস্থিরতা দূর হবে। আল্লাহ্ যেন প্রতিযোগী, আয়োজক, সেচ্ছাসেবক এবং শুভাকাঙ্ক্ষীসহ প্রতিযোগিতার সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে কবুল করেন। আমীন।।

মাউন ফাউন্ডেশন
www.maunfoundation.org

কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২৪
প্রস্তুতি সহায়ক তাফসীর নোট পর্বঃ ১

সূরা ফজর

আল ফাজ্‌র কুরআনের ৮৯তম সূরা। আল ফাজ্‌র শব্দের অর্থ ভোর। আয়াত সংখ্যা ৩০। মক্কায় অবতীর্ণ।

নামকরণঃ

প্রথম শব্দ (الْفَجْرِ)কে এই সূরার নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

এই সূরার বিষয়বস্তু থেকে জানা যায়, এটি এমন এক যুগে নাযিল হয় যখন মক্কা মুয়াযযমায় ইসলাম গ্রহণকারীদের ওপর ব্যাপকভাবে নিপীড়ন নির্যাতন চলছিল। তাই মক্কাবাসীদেরকে আদ, সামূদ ও ফেরাউনের পরিণাম দেখিয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্যঃ

এই সূরার বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্যকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

প্রথম ১৪টি আয়াতে পাঁচটি বিষয়ের (ফজর, দশটি রাত, জোড় ও বেজোড় এবং বিদায়ী রাতের) কসম খেয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে, আল্লাহর প্রতিষ্ঠিত এই বিজ্ঞান সম্মত ব্যবস্থাপনা প্রত্যক্ষ করার পরও যে আল্লাহ এই ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছেন তিনি আখেরাত কায়েম করার ক্ষমতা রাখেন এবং মানুষের কাছ থেকে তার কার্যাবলীর হিসেব নেয়া তাঁর এ বিজ্ঞতাপূর্ণ ব্যবস্থাপনার অপরিহার্য দাবী, একথার সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করার জন্য কি আর কোন জিনিসের প্রয়োজন থাকে? এরপর মানব জাতির ইতিহাস থেকে প্রমাণ পেশ করে উদাহরণ স্বরূপ আদ ও সামূদ জাতি এবং ফেরাউনের পরিণাম পেশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, যখন তারা সীমা পেরিয়ে গেছে এবং পৃথিবীতে ব্যাপক বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে তখন আল্লাহর আযাব তাদেরকে গ্রাস করেছে।

সম্পদের প্রাচুর্য বা অপ্রাচুর্যের মধ্যে কারু সম্মান বা অসম্মান নির্ভর করে না। বরং বান্দাকে সৎকাজের তাওফীক দান করাই হ'ল আল্লাহর পক্ষ হ'তে তাকে সম্মানিত করা এবং এর বিপরীতটার অর্থ হল তাকে অসম্মানিত করা। অতঃপর অকৃতজ্ঞ লোকদের চারটি মন্দ আচরণের কথা বর্ণনা করা হয়েছে ১৫ থেকে ২০ আয়াতে।

শেষ দশ আয়াতে স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়েছে, সম্মানিত ও অসম্মানিত ব্যক্তি চূড়ান্তভাবে যাচাই হবে ক্বিয়ামতের দিন। যেদিন আল্লাহ সকলের সম্মুখে উপস্থিত হবেন এবং বান্দাকে তার কর্মের যথাযোগ্য প্রতিদান ও প্রতিফল দান করবেন

পূর্বের ও পরের সূরার সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী সূরা আল গাশিয়াহতে পূণ্যবান ও পাপীদের প্রতিদান ও প্রতিফলের কথা বিবৃত হয়েছে আর সূরা ফজরে এমন সব কাজের কথার উল্লেখ রয়েছে যেগুলোর প্রতিফল শুধু শাস্তি। অবিশ্বাসী ও কাফের সম্প্রদায়ের ধ্বংসের কথাও আলোচিত হয়েছে।

সূরা আল ফজরে বেশীরভাগ অসৎকার্যের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী সূরা আল বালাদে অধিকাংশ আলোচনা রয়েছে সৎকর্ম ও ভালোকাজের।

তাফসীর

وَ الْفَجْرِ

১. শপথ ফজরের,

فَجْرٌ অর্থ প্রভাতরশ্মি। শপথের পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে প্রথম বিষয় হচ্ছে ফজর অর্থাৎ সুবহে সাদেকের সময়। এখানে 'ফজর' কোন উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে এ ব্যাপারে কয়েকটি মত রয়েছে।

এক. প্রত্যেক দিনের প্রভাতকাল উদ্দেশ্য। কারণ, প্রভাতকাল বিশ্বে এক মহাবিপ্লব আনয়ন করে এবং আল্লাহ্ তা'আলার অপার কুদরতের দিকে পথ প্রদর্শন করে।

দুই. এখানে বিশেষ দিনের প্রভাতকাল বোঝানো হয়েছে। সে হিসেবে কারো কারো মতে এর দ্বারা মহররম মাসের প্রথম তারিখের প্রভাতকাল উদ্দেশ্য; কারণ এ দিনটি ইসলামী চন্দ্র বছরের সূচনা। কেউ কেউ এর অর্থ নিয়েছেন, যিলহজ্ব মাসের দশম তারিখের প্রভাতকাল।

তিন. আবার কেউ বলেছেন : এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ফজরের সালাত ইত্যাদি।

অধিকাংশ তাফসীরে উল্লেখ রয়েছে, ফজর শব্দ দ্বারা প্রতি দিনের সাধারণ ফজরকে বুঝানো হয়েছে। কোন নির্দিষ্ট দিনের ফজর উদ্দেশ্য নয়।

'ফজর' যা দু'প্রকার : সুবহে কাযেব (মিথ্যা প্রভাত), যা অতি ভোরে পূর্বাকাশে সরু ও দীর্ঘ শুভ্ররেখা হিসাবে দেখা যায়। অতঃপর সুবহে সাদেক (সত্য প্রভাত), যা সুবহে কাযেব-এর পরে দীর্ঘ ও উত্তর-দক্ষিণে প্রশস্ত হয়ে উদিত হয়। এটি মৌসুমভেদে সূর্যোদয়ের ১ ঘণ্টা ১৭ মিনিট থেকে ১ ঘণ্টা ৩২ মিনিট পূর্বে হয়ে থাকে। আলোচ্য আয়াতে সুবহে সাদিক-এর শপথ করা হয়েছে।

وَلَيَالٍ عَشْرٍ

২. শপথ দশ রাতের,

শপথের দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে দশ রাত্রি। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু, কাতাদা ও মুজাহিদ প্রমুখ তাফসীরবিদদের মতে এতে যিলহজের দশ দিন বোঝানো হয়েছে। [ইবন কাসীর] যা সর্বোত্তম দিন বলে বিভিন্ন হাদীসে স্বীকৃত। হাদীসে এসেছে, "এদিনগুলোতে নেক আমল করার চেয়ে অন্য কোন নেক আমল করা আল্লাহ্‌র নিকট এত উত্তম নয়, অর্থাৎ জ্বিলহজের দশ দিন। সাহাবায়ে কিরাম বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর পথে জিহাদও নয়? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদও নয়। তবে সে ব্যক্তির কথা ভিন্ন যে নিজের জান ও মাল নিয়ে জিহাদে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি"। [বুখারী: ৯৬৯, আবু দাউদ: ২৩৪৮, তিরমিযী: ৭৫৭]

তাছাড়া এই দশ দিনের তাফসীরে জাবের রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "নিশ্চয় দশ হচ্ছে কোরবানীর মাসের দশদিন, বেজোড় হচ্ছে আরাফার দিন আর জোড় হচ্ছে কোরবানীর দিন।" [মুসনাদে আহমাদ: ৩/৩২৭] সুতরাং এখানে দশ রাত্রি বলে যিলহজের দশ দিন বোঝানো হয়েছে। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ মুসা আলাইহিস সালাম-এর কাহিনীতে (وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ) বলে এই দশ রাত্রিকেই বোঝানো হয়েছে। ইমাম কুরতুবী বলেন, জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হাদীস থেকে জানা

গেল যে, যিলহজ্বের দশ দিন সর্বোত্তম দিন এবং এ হাদীস থেকে জানা গেল যে, মূসা আলাইহিস সালাম এর জন্যেও এ দশ দিনই নির্ধারিত করা হয়েছিল।

وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ

৩. শপথ জোড় ও বেজোড়ের

এ দুটি শব্দের আভিধানিক অর্থ যথাক্রমে 'জোড়' ও 'বিজোড়'। এই জোড় ও বিজোড় বলে আসলে কি বোঝানো হয়েছে, আয়াত থেকে নির্দিষ্টভাবে তা জানা যায় না। তাই এ ব্যাপারে তাফসীরকারগণের উক্তি অসংখ্য। কিন্তু জাবের রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "বেজোড় এর অর্থ আরাফা দিবস (যিলহজ্বের নবম তারিখ) এবং জোড় এর অর্থ ইয়াওমুন্নাহর (যিলহজ্বের দশম তারিখ)"। [মুসনাদে আহমাদ: ৩/৩২৭] কোন কোন তাফসীরবিদ বলেন, জোড় বলে যাবতীয় সালাত আর বেজোড় বলে বিতর ও মাগরিবের সালাত বোঝানো হয়েছে। কোন কোন তাফসীরবিদ বলেন, জোড় বলে সমগ্র সৃষ্টজগৎ বোঝানো হয়েছে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত সৃষ্টিকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন।
তিনি বলেন, (وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا) অর্থাৎ আমি সবকিছু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি। [সূরা আন-নাবা: ৮] যথা: কুফর ও ঈমান, সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য, আলো ও অন্ধকার, রাত্রি ও দিন, শীত-গ্রীষ্ম, আকাশ ও পৃথিবী, জিন ও মানব এবং নর ও নারী। এগুলোর বিপরীতে বিজোড় একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা। [ইবনে কাসীর; ফাতহুল কাদীর] তবে যেহেতু জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসে এর একটি তাফসীর এসেছে সেহেতু সে তাফসীরটি বেশী অগ্রগণ্য।

وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ

৪. শপথ রাতের যখন তা গত হয়ে থাকে-

রাত যখন আগত হয় এবং যখন বিদায় নেয়। কেননা, سَيْر(চলা) শব্দটি আসা যাওয়া উভয় অর্থে ব্যবহার হয়ে থাকে। অন্য সূরায় ঠিক তেমনি শপথ করা হয়েছে সূরা মুদাসসিরের ৩৩ নং আয়াতে- وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ শপথ রাত্রির, যখন ওর অবসান ঘটে।

هَلْ فِي ذَٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ

৫. নিশ্চয়ই এর মধ্যে শপথ রয়েছে বোধসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য।

ذلك(এর) বলে উল্লিখিত যে সকল বস্তুর কসম খাওয়া হয়েছে তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ, এই সমস্ত বস্তুর কসম বুদ্ধিমান ও জ্ঞানীদের জন্য যথেষ্ট নয় কি? প্রশ্নবোধকটি এখানে স্বীকৃতিসূচক। তাই বঙ্গানুবাদটিও করা হয়েছে সোজাসুজি। অর্থাৎ নিশ্চয় এই কোরআনের মধ্যে রয়েছে জ্ঞানবানদের জন্য শপথ। এখানে 'ক্বসামুন' অর্থ শপথ, কসম। এখানকার 'তানভীন'টি শ্রেষ্ঠত্বার্থক। অর্থাৎ নিশ্চয় বর্ণিত বিষয়গুলোর শপথ বিরাট এক ব্যাপার। এমতো শপথই যথেষ্ট। আর কোনোকিছুর শপথের প্রয়োজন পড়ে না । কেননা যে বিষয়গুলোর উল্লেখ করে শপথ করা হয়েছে, সে বিষয়গুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিষয়গুলো আল্লাহপাকের বিচিত্র শক্তিমত্তা ও অতুলনীয় গুণবত্তার পরিচায়ক।

حِجْرএর শাব্দিক অর্থ বাধা দেয়া। মানুষের বিবেক মানুষকে মন্দ ও ক্ষতিকর বিষয়াদি থেকে বাধাদান করে। তাই حِجْرএর অর্থ বিবেকও হয়ে থাকে। এখানে তাই বোঝানো হয়েছে।,

উপরোক্ত পাঁচটি শপথ উল্লেখ করার পর আল্লাহ তা'আলা গাফেল মানুষকে চিন্তাভাবনা করার জন্যে বলেছেন, "এতে কি বিবেকবানরা শপথ নেয়ার মত গুরুত্ব খুঁজে পায়? এই প্রশ্ন প্রকৃতপক্ষে মানুষকে গাফিলত থেকে জাগ্রত করার একটি কৌশল। পরবর্তী আয়াতসমূহে কাফেরদের ওপর আযাব আসার কথা বর্ণনা করেও এ কথা ব্যক্ত করা হয়েছে যে, কুফর ও গোনাহের শাস্তি আখেরাতে **হওয়া** তো স্থিরীকৃত বিষয়ই। মাঝে মাঝে দুনিয়াতেও তাদের প্রতি আযাব প্রেরণ করা হয়। এ ক্ষেত্রে তিনটি জাতির আযাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে-(এক) আদ বংশ, (দুই) সামূদ গোত্র এবং (তিন) ফিরআউন সম্প্রদায়।

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ

৬. আপনি দেখেননি আপনার রব কি (আচরণ) করেছিলেন আদ বংশের—

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, হে নবী (সঃ)! তুমি কি দেখনি তোমার প্রতিপালক স্তম্ভসদৃশ আদ জাতির সাথে কি করে ছিলেন? কিভাবে তিনি তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন? তারা ছিল হঠকারী এবং অহংকারী। তারা আল্লাহর নাফরমানী করতো। রাসূলকে অবিশ্বাস করতো এবং নিজেদেরকে নানা প্রকারের পাপকর্মে নিমজ্জিত রাখতো। তাদের নিকট আল্লাহর রাসূল হযরত হূদ (আঃ) আগমন করেছিলেন।

আল্লাহ তা'আলা তাদের মধ্যকার ঈমানদারদেরকে মুক্তি দিয়েছিলেন এবং বাকি সব বেঈমানকে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ের মাধ্যমে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। ক্রমাগত সাত রাত্র ও আট দিন পর্যন্ত ঐ সর্বনাশা ঘূর্ণিঝড় প্রবাহিত হয়েছিল। তাতে আদ সম্প্রদায়ের সমস্ত কাফির ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। তাদের একজনও ভয়াবহ শাস্তি হতে রক্ষা পায়নি। মাথা ও দেহ ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় পড়ে রয়েছিল। কুরআনের মধ্যে কয়েক জায়গায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। সূরা আল হাককাহতেও এর বর্ণনা রয়েছে। সেখানে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থাৎ "আর আদ সম্প্রদায়, তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রচণ্ড ঝঞ্জা বায়ু দ্বারা; যা তিনি তাদের উপর প্রবাহিত করেছিলেন সপ্তরাত্রি ও অষ্টদিবস বিরামহীনভাবে। তখন তুমি উক্ত সম্প্রদায়কে দেখতে তারা সেথায় লুটিয়ে পড়ে আছে সারশূন্য বিক্ষিপ্ত খর্জুর কাণ্ডের ন্যায়। অতঃপর তাদের কাউকেও তুমি বিদ্যমান দেখতে পাও কি?" (সূরা আল-হাক্কাহ :৬-৮)

إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ

৭. ইরাম গোত্রের প্রতি—যারা অধিকারী ছিল সুউচ্চ প্রাসাদের?

'ইরাম' একটি গোত্রের নাম। আবার বলা হয় إِرَمَ আদ জাতির পিতামহের নাম।

এখানে প্রথম আদ (আদেউলা) এর কথা বলা হয়েছে। এ সম্প্রদায়ের দুটি উপাধি ছিল আদ ও ইরাম। আদ আসের, আস্ ইরামের এবং ইরাম ছিল নূহ-তনয় সামের পুত্র। সুতরাং, কখনও তাদেরকে পিতার নামে আদ বলা হয়, আবার কখনও দাদার নামে ইরাম বলা হয়। ইরামের অপর পুত্র ছিল আবের এবং আবেরের পুত্র ছিল সামুদ। এই নামে একটি বংশ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। অতএব, আদ আসের মধ্যস্থতায় এবং সামূদ আবেরের মধ্যস্থতায় ইরামের সাথে মিলিত হয়ে যায়। আয়াতে আদের সাথে ইরামকে যুক্ত করার কারণ এই যে, আদ বংশের দুটি স্তর রয়েছে– পূর্ববর্তী যাদেরকে প্রথম আদ বলা হয় এবং পরবর্তী, যাদেরকে দ্বিতীয় আদ বলা হয়। ইরাম শব্দ যোগ করায় ইঙ্গিত হয়ে গেল যে, এখানে প্রথম আদ বোঝানো হয়েছে। তারা দ্বিতীয় আদের তুলনায়

আদের পূর্বপুরুষ ইরামের নিকটতম বিধায় তাদেরকে عاد إرام 'আদে-ইরাম' শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে এবং সূরা আন-নাজমে (وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ) শব্দ দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে।

এখানে তাদের বিশেষণে বলা হয়েছে ذَاتِ الْعِمَادِ মূলত عِمَاد শব্দের অর্থ স্তম্ভ। তারা অত্যন্ত দীর্ঘকায় জাতি ছিল বিধায় তাদের(ذَاتِ الْعِمَادِ) বলা হয়েছে। অপর কারো কারো মতে তারা যেহেতু অট্টালিকায় বাস করত সেহেতু তাদেরকে(ذَاتِ الْعِمَادِ) বলা হয়েছে। কারণ অট্টালিকা নির্মাণ করতে স্তম্ভ নির্মানের প্রয়োজন হয়। তারা সর্বপ্রথম এ জাতীয় অট্টালিকা নির্মাণ করে। দুনিয়ায় তারাই সর্বপ্রথম উঁচু উঁচু স্তম্ভের ওপর ইমারত নির্মাণ করার কাজ শুরু করে। কুরআন মজীদের অন্য জায়গায় তাদের এই বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা হয়েছে: হূদ আলাইহিস সালাম তাদেরকে বললেন, "তোমাদের এ কেমন অবস্থা, প্রত্যেক উচু জায়গায় অনর্থক একটি স্মৃতিগৃহ তৈরি করছে এবং বড় বড় প্রাসাদ নির্মাণ করছে, যেন তোমনা চিরকাল এখানে থাকবে।" [সূরা আশ শু'আরা: ১২৮–১২৯] অন্য আয়াতে আছে, (وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ) "আর তারা পাহাড় কেটে ঘর নির্মাণ করত নিরাপদ বাসের জন্য। [সূরা আল-হিজর: ৮২]

الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ

৮. যার সমতুল্য কোন দেশে সৃষ্টি করা হয়নি

আদ জাতি দৈহিক গঠন ও শক্তি-সাহসে অন্য সব জাতি থেকে স্বতন্ত্র ছিল। কুরআনের অন্যান্য স্থানে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, "দৈহিক গঠনের দিক দিয়ে তোমাদের অবয়বকে অত্যন্ত সমৃদ্ধ করেছেন।" [সূরা আল আরাফঃ ৬৯] আল্লাহ অন্যত্র আরো বলেছেন, "আর তাদের ব্যাপারে বলতে গেলে বলতে হয়, তারা কোন অধিকার ছাড়াই পৃথিবীর বুকে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের অহংকার করেছে। তারা বলেছে, কে আছে আমাদের চাইতে বেশী শক্তিশালী? [সূরা হা-মীম আস সাজদাহঃ ১৫] আরও বলেছেন, "আর তোমরা যখন কারো ওপর হাত উঠিয়েছে প্রবল পরাক্রান্ত হয়েই উঠিয়েছো।" [সূরা আশ শু'আরাঃ ১৩০]

وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ

৯. এবং সামূদের প্রতি? –যারা উপত্যকায় পাথর কেটে ঘর নির্মাণ করেছিল;

উপত্যকা বলতে 'আলকুরা' উপত্যকা বুঝানো হয়েছে। সামূদ জাতির লোকেরা সেখানে পাথর কেটে কেটে তার মধ্যে এভাবে ইমারত নির্মাণের রীতি প্রচলন করেছিল। এরা স্বালেহ (আঃ)-এর জাতি ছিল। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে পাথর খোদাই কাজের বিশেষ দক্ষতা ও ক্ষমতা দান করেছিলেন। যেমন কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে, ''তোমরা তো নৈপুণ্যের সাথে পাহাড় কেটে গৃহ নির্মাণ করছ।'' [সূরা শুআরা ১৪৯]

সামূদ' গোত্র হল 'ইরম' বংশের অন্যতম শাখা। 'আদ ও সামূদ উভয় গোত্রের মূল দাদা হলেন 'ইরম'। ইরমের বংশধররা আম্মান ও হাযারামাউত এলাকায় বসবাস করত। তাদের প্রধান শহরের নাম ছিল 'হিজর' । সামুদ জাতি জাতি পাহাড়ের ভেতর খোদাই করে নিজেদের গৃহ নির্মাণ করতো, এজন্য তাদেরকে 'আসহাবুল হিজর' সম্বোধন করা হয়েছে। আরবের উত্তর-পশ্চিম এলাকায় শাম হতে মক্কার পথে অবস্থিত এই শহরকে এখন 'মাদায়েনে সালেহ' বলা হয়।

হিজরী ৯ম সনে তাবূক যুদ্ধে যাবার পথে মুসলিম বাহিনী যখন ‘হিজর’ এলাকা অতিক্রম করে, যা ছিল খায়বরের অদূরে ‘ওয়াদিল ক্বোরা’ এলাকায় অবস্থিত এবং এটাই ছিল ছামূদ জাতির গযবের এলাকা। তখন রসূল (সাঃ) তাঁর সাহাবীদের বলেছিলেন, শাস্তিপ্রাপ্ত কোন জাতির অঞ্চল হয়ে অতিক্রম করার সময় কাঁদতে কাঁদতে অর্থাৎ, আল্লাহর আযাব থেকে পানাহ চাইতে চাইতে অতিক্রম কর। (বুখারীঃ নামায অধ্যায়, মুসলিম যুহদ অধ্যায়)

وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ

১০. এবং কীলকওয়ালা ফিরআউনের প্রতি?

أَوْتَادশব্দটি وتدএর বহুবচন। এর অর্থ কীলক। ফিরআউনের জন্য ‘যুল আউতাদ’। (কীলকধারী) শব্দ এর আগে সূরা সাদের ১২ আয়াতেও ব্যবহার করা হয়েছে। ফিরআউনকে কীলকওয়ালা বলার বিভিন্ন কারণ তাফসীরবিদগণ বর্ণনা করেছেন। কারও কারও মতে এর দ্বারা যুলুম নিপীড়ন বোঝানোই উদ্দেশ্য। কারণ, ফিরআউন যার উপর ক্রোধান্বিত হত, তার হাত-পা চারটি পেরেকে বেঁধে অথবা চার হাত পায়ে পেরেক মেরে রৌদ্রে শুইয়ে রাখত। বা কোন গাছের সাথে পেরেক মেরে রাখত। অথবা পেরেক মেরে দেহের উপর সাপ-বিচ্ছু ছেড়ে দিত। কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, এখানে তার সেনাবাহিনীকেই কীলকের সাথে তুলনা করা হয়েছে এবং সেই অর্থে কীলকধারী মানে সেনাবাহিনীর অধিকারী। কারণ তাদেরই বদৌলতে তার রাজত্ব এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল যেমন কীলকের সাহায্যে তাবু মজবুতভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে। তাছাড়া এর অর্থ সেনা দলের সংখ্যাধিক্যও হতে পারে। এক্ষেত্রে এর অর্থ হবে, তার সেনাদল যেখানে গিয়ে তাবু গাড়তো সেখানেই চারদিকে শুধু তাবুর কীলকই পোঁতা দেখা যেতো। কারও কারও মতে, এর দ্বারা ফিরআউনের প্রাসাদ-অট্টালিকা বোঝানো হয়েছে। এসবের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। ফিরআউন মূলত: এসবেরই অধিকারী ছিল। [ইবনে কাসীর, ফাতহুল কাদীর]

الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ

১১. যারা দেশে সীমালংঘন করেছিল,

فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ

১২. অতঃপর সেখানে অশান্তি বৃদ্ধি করেছিল।

আদ, সামূদ ও ফেরাঊন স্ব স্ব অঞ্চলে সীমাহীন অত্যাচার ও নির্যাতনের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে সামাজিক অশান্তি ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করেছিল।

فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ

১৩. ফলে আপনার রব তাদের উপর শাস্তির কশাঘাত হানলেন।

سَوْطَ عَذَابٍ অর্থ نصيب عذاب ‘শাস্তির অংশ। এর দ্বারা শাস্তির কঠোরতা বুঝানো হয়েছে। কেননা السوط শব্দ দ্বারা আরবদের নিকটে কঠোরতম শাস্তিকে বুঝানো হয়। আরবরা একথাটি সকল প্রকার কঠোরতম শাস্তির ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকে। আল্লাহ প্রেরিত প্রতিটি শাস্তিই سوط عذاب বা শাস্তির কশাঘাত। [তাফসীরে কুরতুবী] উক্ত তিনটি সম্প্রদায়ের উপরে ইতিহাসের কঠোরতম শাস্তিই নাযিল হয়েছিল। ‘আদ ও সামূদ জাতি যেমন প্রবল ঝঞ্ঝাবায়ু এবং প্রচন্ড নিনাদসহ ভূমিকম্পে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। ফেরাঊন তেমনি তার সৈন্য-সামন্ত ও লোক-লশকরসহ চোখের নিমিষে সাগরে ডুবে ধ্বংস হয়েছিল। অন্যদিকে মজলুম বনু ইসরাঈলগণ মূসা (আঃ)-এর নেতৃত্বে মুক্তি পেয়েছিল [সূরা বাক্বারাহ ৪৯-৫০; সূরা ইউনুস ৯০-৯২]।

إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ

১৪. নিশ্চয় আপনার রব সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।

এখানে مرصاد ও مرصد শব্দের অর্থ সতর্ক দৃষ্টি রাখার ঘাঁটি, যাকোন উচ্চ স্থানে স্থাপিত হয়ে থাকে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তাআলা প্রতিটি লোকের প্রতিটি ক্রিয়া-কর্ম ও গতিবিধির উপর দৃষ্টি রাখছেন এবং সবাইকে প্রতিদান ও শাস্তি দেবেন।

فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ

১৫. মানুষ তো এরূপ যে, তার রব যখন তাকে পরীক্ষা করেন সম্মান ও অনুগ্রহ দান করে, তখন সে বলে, আমার রব আমাকে সম্মানিত করেছেন।

وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ

১৬. আর যখন তাকে পরীক্ষা করেন তার রিয্ক সংকুচিত করে, তখন সে বলে, আমার রব আমাকে হীন করেছেন।

পরপর বর্ণিত দু'টি আয়াতে একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে যে, দুনিয়াতে মানুষকে দেয়া সম্মান ও অসম্মান, সচ্ছলতা বা অসচ্ছলতা আল্লাহর নিকটে কারো প্রিয় বা অপ্রিয় হওয়ার নিদর্শন নয়। বরং সবকিছু হয়ে থাকে বান্দাকে পরীক্ষা করার জন্য আল্লাহর ফায়ছালা ও তাঁর পূর্ব নির্ধারণ (قضاء وقدر) অনুযায়ী। প্রকৃত মুমিন বান্দা সচ্ছল ও অসচ্ছল, কষ্ট ও আনন্দ উভয় অবস্থায় সবর করে ও আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকে।

আল্লাহ্ তা'আলা যখন কাউকে জীবনোপকরণে সমৃদ্ধি ও স্বাচ্ছন্দ্য, ধনসম্পদ ও সুস্বাস্থ্য দান করেন, তখন শয়তান তাকে দু'টি ভ্রান্ত ধারণায় লিপ্ত করে দেয় — এক. সে মনে করতে থাকে যে, এটা আমার ব্যক্তিগত প্রতিভা, গুণগরিমা ও কর্ম প্রচেষ্টারই অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি, যা আমার লাভ করাই সঙ্গত। আমি এর যোগ্যপাত্র। দুই. আমি আল্লাহর কাছেও প্রিয়পাত্র। যদি প্রত্যাখ্যাত হতাম, তবে তিনি আমাকে এসব নিয়ামত দান করতেন না। এমনিভাবে কেউ অভাব- অনটন ও দারিদ্র্যের সম্মুখীন হলে একে আল্লাহর কাছে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার দলীল মনে করে এবং তাঁর প্রতি এ কারণে ক্রুদ্ধ হয় যে, সে অনুগ্রহ ও সম্মানের পাত্র ছিল কিন্তু তাকে অহেতুক লাঞ্ছিত ও হেয় করা হয়েছে। কাফির ও মুশরিকদের মধ্যে এ ধরনের ধারণা বিদ্যমান ছিল এবং কোরআন পাক কয়েক জায়গায় তা উল্লেখও করেছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে আজকাল অনেক মুসলমানও এ বিভ্রান্তিতে লিপ্ত রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন- 'আমি আশ্চর্য হই মুমিনের উপর যখন তার কল্যাণ লাভ হয়, তখন সে আল্লাহর প্রশংসা করে ও শুকরিয়া আদায় করে। আবার যখন সে কষ্টে পতিত হয়, তখনও সে আল্লাহর প্রশংসা করে ও সবর করে। [আহমাদ- ১৪৯২, মিশকাত-৭৩৩]। অন্য হাদীসে এসেছে, 'মুমিনের ব্যাপারটাই আশ্চর্যজনক। তার সকল কাজই কল্যাণকর। মুমিন ছাড়া অন্যের ব্যাপারটা এরূপ নয়। তার জন্যে আনন্দের কিছু ঘটলে সে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে। এতে তার মঙ্গল হয়। আবার ক্ষতিকর কিছু ঘটলে সে ধৈর্যধারণ করে। এটাও তার জন্য কল্যাণকর হয়'। (মুসলিম- ২৯৯৯)। বরং এসবই আল্লাহর পরীক্ষা মাত্র। যেমন তিনি বলেন, 'তিনি সেই মহান সত্তা যিনি মরণ ও জীবন সৃষ্টি করেছেন কে তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম আমল করে সেটা পরীক্ষা করার জন্য। তিনি মহাপরাক্রান্ত ও ক্ষমাশীল' [মুলক ২]।

অতএব ধনিক ও শাসকশ্রেণী যেন অহংকারে স্ফীত হয়ে একথা না ভাবে যে, এসবকিছুই তাদের প্রতি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ মাত্র এবং তারা অবশ্যই আল্লাহর বিশেষ প্রিয়পাত্র। এদেরকে সাবধান করে আল্লাহ বলেন, 'তারা কি মনে করে যে, আমরা তাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে সাহায্য করছি'। 'আর আমরা তাদের জন্য সর্বপ্রকার মঙ্গল ত্বরান্বিত করছি? বরং তারা (আসল তাৎপর্য) বুঝে না' (মুমিনূন ৫৫-৫৬)। পক্ষান্তরে ঈমানদার বান্দাগণের উদ্দেশ্যে আল্লাহ বলেন, 'অবশ্যই আমরা তোমাদের পরীক্ষা করব কিছু কিছু ভয়, ক্ষুধা, মাল, জান ও ফল-ফসলের ক্ষতির মাধ্যমে। তবে তুমি সুসংবাদ দাও ধৈর্যশীলদের'। 'যাদের উপর কোন বিপদ আপতিত হ'লে তারা বলে, নিশ্চয় আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তাঁরই নিকটে ফিরে যাব' (সূরা বাক্বারাহ ১৫৫-১৫৬)।

অতএব দুনিয়াতে কাউকে সম্মানিত করার অর্থ আল্লাহর নিকটে তার সম্মানিত হওয়া নয় এবং দুনিয়ায় কাউকে অসম্মানিত করার অর্থ আল্লাহর নিকটে তার অসম্মানিত হওয়া নয়। বরং উভয় অবস্থায় আল্লাহর নিকটে সম্মানিত হওয়ার মানদন্ড হ'ল আল্লাহভীরুতা ও আল্লাহর প্রতি আনুগত্য। কখনো সম্মানিত কখনো অসম্মানিত করে, কখনো সচ্ছল কখনো অসচ্ছল করে আল্লাহ তার বান্দাকে পরীক্ষা করেন, সে সর্বাবস্থায় আল্লাহর আনুগত্যের উপরে টিকে থাকে কি-না। এক্ষণে পরীক্ষায় ভীত হয়ে যদি সে শয়তানের ফাঁদে পা না দেয় এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি দৃঢ় থাকে, তবে তার সম্পর্কে আল্লাহর সুসংবাদ হল, 'তারা হল ঐ সকল ব্যক্তি যাদের প্রতি আল্লাহর অফুরন্ত আশীষ ও অনুগ্রহ রয়েছে এবং এরাই হল সুপথপ্রাপ্ত' [সূরা বাক্বারাহ ১৫৭]।

كَلَّا ۖ بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ

১৭. কখনো নয়। বরং তোমরা ইয়াতীমকে সম্মান কর না,

كَلَّا শব্দটি 'প্রত্যাখ্যানকারী অব্যয়'। দুনিয়াতে জীবনোপকরণের স্বাচ্ছন্দ সৎ ও আল্লাহর প্রিয়পাত্র হওয়ার আলামত নয়, তেমনি অভাব-অনটন ও দারিদ্র প্রত্যাখ্যাত ও লাঞ্ছিত হওয়ার দলীল নয়। বিষয়টিকে পরোপুরি প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহ বলেন, كَلَّا 'কখনোই এরূপ নয়'। দু'টি ভাবনার কোনটাই সঠিক নয়। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যাপার সম্পূর্ণ উল্টো হয়ে থাকে। কোন কোন নবী-রাসূল কঠিন কষ্ট ভোগ করেছেন আবার কোনও কোনও আল্লাহদ্রোহী আরাম-আয়েশ্যে জীবন অতিবাহিত করে দিয়েছেন।

মানুষের উক্ত ভুল চিন্তাধারাকে প্রত্যাখ্যান করার পর এক্ষণে আল্লাহ অকৃতজ্ঞ লোকদের চারটি বদভ্যাসের কথা উল্লেখ করছেন। যার প্রথমটি হল এই যে, তারা ইয়াতীমকে সম্মান করে না। তোমরা ইয়াতীমদের প্রাপ্য আদায় কর না এবং তাদের প্রয়োজনীয় ব্যয় বহন কর না। কিন্তু 'সম্মান কর না' বলার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইয়াতীমদের প্রাপ্য আদায় এবং তাদের ব্যয় ভার বহন করলেই তোমাদের যৌক্তিক, মানবিক ও আল্লাহ্ প্রদত্ত ধনসম্পদের কৃতজ্ঞতা সম্পর্কিত দায়িত্ব পালিত হয়ে যায় না বরং তাদেরকে সম্মানও করতে হবে। নিজেদের সন্তানদের মুকাবিলায় তাদেরকে হেয় মনে করা যাবে না। কাফিররা যে দুনিয়ার সুখ স্বাচ্ছন্দোকে সম্মান এবং অভাব-অনটনকে অপমান মনে করত, এটা বাহ্যত তারই জওয়াব। এখানে বলা হয়েছে যে, তোমরা কোন সময় অভাব-অনটনের সম্মুখীন হলে তা এ কারণে হয় যে, তোমরা ইয়াতীমের ন্যায় দয়াযোগ্য বালক-বালিকাদের প্রাপ্যও আদায় করো না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "জন্নাতে আমি ও ইয়াতীমের তত্ত্বাবধানকারী এভাবে থাকবে" এটা বলে তিনি তার মধ্যমা ও তর্জনী আংগুলদ্বয় একসাথ করে দেখালেন। [বুখারী: ৬০০৫]

وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ

১৮. এবং তোমরা মিসকীনকে খাদ্যদানে পরস্পরকে উৎসাহিত কর না,

এটা হল কাফেরদের দ্বিতীয় বদভ্যাস। তারা নিজেরা তো মিসকীনদের খাদ্য দান করে না। এমনকি অন্যকেও এ ব্যাপারে উৎসাহিত করে না। এর মধ্যে ধনীদের প্রতি যেমন দান করার নির্দেশ রয়েছে, তেমনি যারা দান করার সামর্থ্য রাখে না তাদের প্রতিও নির্দেশ রয়েছে, যেন তারা সক্ষম ব্যক্তিদেরকে এব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করে।

وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا

১৯. আর তোমরা উত্তরাধিকারের সম্পদ সম্পূর্ণরূপে খেয়ে ফেল

এটি হল কাফিরদের তৃতীয় বদভ্যাস। তারা তাদের বাপ-দাদাদের রেখে যাওয়া সম্পদ-সম্পত্তিতে হালাল-হারাম বাছ-বিচার না করে দু'হাতে ভোগদখল করে। দুর্বল ওয়ারিছদের তারা সাধ্যমত বঞ্চিত করে। আরবরা নারী ও শিশুদের সম্পত্তির উত্তরাধিকার দিত না। কারণ তারা যুদ্ধ করতে পারত না এবং যুদ্ধে পরাজিত হলে তারা বিজয়ীদের দখলে চলে যেত।

বস্ততঃ দুর্বল শরীককে ফাঁকি দেওয়ার এ বদভ্যাস কেবল সে যুগের কাফিরদের মধ্যে ছিল না, এযুগের কাফের ও মুসলমান ফাসেকদের মধ্যেও ব্যাপকভাবে দেখা যায়। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি কারু এক বিঘত যমীন অন্যায়ভাবে ভোগ-দখল করে, ক্বিয়ামতের দিন তাকে সাত তবক যমীনের বেড়ী পরানো হবে'। (বুখারী-৩১৯৮, মুসলিম-১৬১০)। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কোন জমি দখল করল, তাকে ক্বিয়ামতের দিন ঐ মাটির বোঝা বহন করে চলতে বাধ্য করা হবে'। (আহমাদ-১৭৫৯৪, ১৭৬০৫) অতঃপর এই মীরাস যদি ইয়াতীমের হয়, তাহলে তার অন্যায় ভোগ-দখল হবে আরো বেশী মারাত্মক।

وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا

২০. আর তোমরা ধন-সম্পদ খুবই ভালবাস

কাফেরদের ৪র্থ বদভ্যাস হল সীমাহীন ধনলিপ্সা। তারা যত পায়, তত চায়। তাদের চাহিদার শেষ থাকে না। جَمًّا শব্দটি كثير বা অত্যধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অত্যধিক বলার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ধনসম্পদের ভালবাসা এক পর্যায়ে নিন্দনীয় নয় বরং মানুষের জন্মগত তাগিদ। তবে সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া এবং তাতে মজে যাওয়া নিন্দনীয়। প্রাচুর্যের লালসা তাদেরকে এমন বানিয়ে নিয়েছে যে, তারা সম্পদ থাকা-না থাকাই সম্মানের কারণ হিসাবে বিবেচনা করছে। রাসূলুল্লাহ বলেছেন : আদম সন্তানের যদি একটি পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ থাকে তাহলে তারা চাইবে যদি এরূপ দুটি স্বর্ণের পাহাড় হত। মূলত তাদের মুখ মাটি ছাড়া কিছুই ভরতে পারবে না। (সহীহ বুখারী- ৬৪৩৯)

كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا

২১. কখনো নয়। যখন যমীনকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হবে,

কাফিরদের চারটি মন্দ অভ্যাস বর্ণনা করার পর আবার আসল বিষয়বস্তু পরকালের প্রতিদান ও শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে প্রথমে কিয়ামত আগমনের কথা বলা হয়েছে।

دَكٌّ এর শাব্দিক অর্থ কোন বস্তুকে আঘাত করে ভেঙ্গে দেওয়া। এখানে কিয়ামতের ভূকম্পন বোঝানো হয়েছে যা পর্বতমালাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেবে। دَكًّا دَكًّا বারবার বলায় ইঙ্গিত হয়েছে যে, কিয়ামতের ভূকম্পন একের পর এক অব্যাহত থাকবে। যখন ভূকম্পনের মত হয় সবকিছু ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে; তখন কার কি অবস্থা হবে একটু চিন্তা করা দরকার। যে শাস্তি ও পুরস্কারের বিষয়টি অস্বীকার করে তোমরা এই জীবন পদ্ধতি অবলম্বন করেছো সেটি কোন অসম্ভব ও কাল্পনিক ব্যাপার নয়। বরং সে বিষয়টি অবশ্যি সংঘটিত হবে। সামনের দিকে সেটি কখন সংঘটিত হবে সে সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে।

وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا

২২. আর যখন আপনার রব আগমন করবেন ও সারিবদ্ধভাবে ফেরেশতাগণও

মূলে বলা হয়েছে(وَجَاءَ رَبُّكَ) এর শাব্দিক অনুবাদ হচ্ছে, “আপনার রব আসবেন।” এখানে ‘হাশরের মাঠে আল্লাহর আগমন’ সাব্যস্ত করা হয়েছে। তিনি (আল্লাহ) অবশ্যই হাশরের মাঠে বিচার ফয়সালা করার জন্য স্বয়ং আসবেন। আল্লাহ তা'আলা হাশরের মাঠে আগমন করবেন এটা সত্য। যেভাবে আসা তাঁর জন্য উপযুক্ত তিনি সেভাবে আসবেন। এই আগমনের অর্থ আমরা বুঝি কিন্তু তিনি কিভাবে আগমন করবেন তা তিনি ব্যতীত কেউ জানে না।

কিয়ামতের দিন যখন ফিরিশতাগণ আসমান হতে নিচে অবতরণ করবেন, তখন প্রত্যেক আসমানের ফিরিশতাদের আলাদা আলাদা কাতার বা সারি হবে। এইরূপ সাতটি কাতার হবে যাঁরা সারা পৃথিবীকে বেষ্টন করে নেবে।

وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ ۚ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ

২৩. আর সেদিন জাহান্নামকে আনা হবে। সেদিন মানুষ স্মরণ করবে, তখন এ স্মরণ তার কি কাজে আসবে?

সেদিন জাহান্নামকে আনা হবে বা সামনে উপস্থিত করা হবে। হাদীসে এসেছে, “জাহান্নামকে ফেরেশতারা টেনে নিয়ে আসবে, সেদিন জাহান্নামের সত্তর হাজার লাগাম হবে, প্রতি লাগামে সত্তর হাজার ফেরেশতা থাকবে।” [মুসলিম: ২৮৪২, তিরমিযী: ২৫৭৩]

জাহান্নামকে আরশের বাম দিকে উপস্থিত করা হবে। তা দেখে সকল নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা ও আম্বিয়া (‘আলাইহিমুস সালাম)-গণ হাঁটু গেড়ে লুটিয়ে পড়বেন। আর ‘ইয়া রাব্ব! নাফসী নাফসী’ বলতে থাকবেন। [ফাতহুল ক্বাদীর]

يَتَذَكَّرُ -এর দু'টি অর্থ হতে পারে। এক. يَتَذَكَّرُ -এর অর্থ এখানে বুঝে আসা। সুতরাং সেদিন মানুষ সচেতন হবে। সে উপদেশ গ্রহণ করবে। সে বুঝতে পারবে, নবীগণ তাকে যা কিছু বলেছিলেন তাই ছিল সঠিক এবং তাদের কথা না মেনে সে বোকামি করেছে। কিন্তু সে সময় সচেতন হওয়া, উপদেশ গ্রহণ করা এবং নিজের ভুল বুঝতে পারায় কী লাভ? (ফাতহুল কাদীর) দুই. অথবা يَتَذَكَّرُ -অর্থ স্মরণ করা। অর্থাৎ সেদিন মানুষ দুনিয়ায় যা

কিছু করে এসেছে তা স্মরণ করবে এবং সেজন্য লজ্জিত হবে। কিন্তু তখন স্মরণ করায় এবং লজ্জিত হওয়ায় কোন লাভ হবে না। [ইবনে কাসীর]

يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِ

২৪. সে বলবে, হায়! আমার এ জীবনের জন্য আমি যদি কিছু অগ্রিম পাঠাতাম?

এই সময় কাফের ও পাপী মানুষ কেবলই অনুতাপ করবে, আর বলবে হায়! দুনিয়ায় থাকতে যদি দৃঢ় বিশ্বাস করতাম ও সে অনুযায়ী নেক আমল করতাম, তাহলে আজ তার সুফল পেতাম। উল্লেখ্য যে, অবিশ্বাসী কাফেরও দুনিয়াতে অনেক সময় সৎকর্ম করে থাকে। কিন্তু তা আল্লাহর কাছে গৃহীত হবে না। কারণ সে তো আল্লাহকেই বিশ্বাস করত না। তাঁর রাসূলকে বিশ্বাস করতো না। তাঁর প্রেরিত ইসলাম অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করত না। অতএব সে কিভাবে আল্লাহর রহমত পেতে পারে? ফলে অবিশ্বাসী হওয়ার কারণে তার কোন সৎকর্ম ঐদিন কবুল করা হবে না। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন : "জালিম ব্যক্তি সেদিন নিজ দু'হাত দংশন করতে করতে বলবে, 'হায়, আমি যদি রাসূলের সাথে সৎপথ অবলম্বন করতাম!" (সূরা ফুরকান ২৭)

فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ

২৫. সেদিন তাঁর শাস্তির মত শাস্তি কেউ দিতে পারবে না,

ক্বিয়ামতের দিন অবাধ্যদের শাস্তি আল্লাহ যেভাবে দিবেন, তার চাইতে কঠিনভাবে শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা কারু নেই। কেননা দুনিয়ার যেকোন কঠোরতম শাস্তি আখেরাতের শাস্তির তুলনায় কিছুই নয়। এখানে عذاب অর্থ تعذيب 'কঠিনভাবে শাস্তি দেওয়া'। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 'আমার বান্দাদের সংবাদ দাও যে, নিশ্চয়ই আমি ক্ষমাশীল ও দয়াবান'। 'এবং আমার শাস্তিও অতীব যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি' (হিজর ৪৯-৫০)।

وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ

২৬. এবং তার বাঁধার মত বাঁধতে কেউ পারবে না।

এই জন্য যে, সেদিন সমস্ত প্রকার ইচ্ছা ও এখতিয়ার কেবলমাত্র আল্লাহরই হাতে হবে। অন্য কারো তাঁর সামনে কিছু করবার ক্ষমতা থাকবে না। তাঁর অনুমতি ছাড়া কেউ কারো সুপারিশ পর্যন্তও করতে পারবে না। এই অবস্থায় কাফেরদের যে আযাব হবে এবং যেভাবে তারা আল্লাহর বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে, তার কল্পনাও করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়; তা অনুমান করা তো দূরের কথা। এ অবস্থা তো যালেম ও অপরাধীদের হবে। পক্ষান্তরে ঈমানদার এবং আল্লাহর অনুগত বান্দাগণের অবস্থা হবে এর সম্পূর্ণ বিপরীত; যেমন পরবর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে।

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ

২৭. হে প্রশান্ত আত্মা!

পূর্বের আয়াতগুলিতে (২৩-২৬) অবিশ্বাসী কাফের-মুনাফিকদের কঠিন শাস্তির বর্ণনা শেষে এবার (২৭-৩০ আয়াতে) প্রকৃত বিশ্বাসী মুমিন নর-নারীদের অবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে। এখানে মুমিনদের হৃদয়কে 'নফসে মুত্বমাইন্নাহ' বা প্রশান্ত আত্মা বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

‘প্রশান্ত আত্মা’ বলে এমন মানুষকে বুঝানো হয়েছে যে, কোন প্রকার সন্দেহ সংশয় ছাড়াই পূর্ণ নিশ্চিন্ততা সহকারে ঠাণ্ডা মাথায় এক ও লা-শরীক আল্লাহকে নিজের রব এবং নবীগণ যে সত্য দ্বীন এনেছিলেন তাকে নিজের দ্বীন ও জীবন বিধান হিসেবে গণ্য করেছে। আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কাছ থেকে যে বিশ্বাস ও বিধানই পাওয়া গেছে তাকে সে পুরোপুরি সত্য বলে মেনে নিয়েছে। আল্লাহর দ্বীন যে জিনিসটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে তাকে সে অনিচ্ছা সত্ত্বেও নয় বরং এই বিশ্বাস সহকারে বর্জন করেছে যে, সত্যিই তা খারাপ। সত্য-প্রীতির পথে যে কোন ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে সে নির্দ্ধিধায় তা করেছে। এই পথে যেসব সংকট, সমস্যা, কষ্ট ও বিপদের মুখোমুখি হতে হয়েছে হাসি মুখে সেগুলো বরদাশত করেছে। অন্যায় পথে চলে লোকদের দুনিয়ায় নানান ধরনের স্বার্থ, ঐশ্বর্য ও সুখ-সম্ভার লাভ করার যেসব দৃশ্য সে দেখছে তা থেকে বঞ্চিত থাকার জন্য তার নিজের মধ্যে কোন ক্ষোভ বা আক্ষেপ জাগেনি। বরং সত্য দ্বীন অনুসরণ করার ফলে সে যে এই সমস্ত আবর্জনা থেকে মুক্ত থেকেছে, এজন্য সে নিজের মধ্যে পূর্ণ নিশ্চিন্ততা অনুভব করেছে। কুরআনের অন্যত্র এই অবস্থাটিকে ‘শারহে সদর’ বা হৃদয় উন্মুক্ত করে দেয়া অর্থে বর্ণনা করা হয়েছে। (আল আন’আম, ১২৫)

উল্লেখ্য যে, ‘নফস’ তিন প্রকার। এক- নফসে মুত্বমাইন্নাহ- প্রশান্ত হৃদয়। দুই- নফসে লাউয়ামাহ- তিরষ্কারকারী আত্মা অর্থাৎ বিবেক এবং তিন- নফসে আম্মারাহ অর্থাৎ অন্যায় কাজে প্ররোচনা দানকারী অন্তর। শেষোক্ত অন্তরটি সর্বদা শয়তানের তাবেদারী করে। এর সঙ্গে সর্বদা লড়াই করেই টিকে থাকতে হয়। বান্দাকে তাই সর্বদা এমন পরিবেশে থাকতে হয় যাতে নফসে আম্মারাহ উত্তপ্ত হতে না পারে।

ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً

২৮. তুমি তোমার রবের কাছে ফিরে আস সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে।

ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ– অর্থাৎ নিজের পালনকর্তার দিকে ফিরে যাও। ফিরে যাওয়া বাক্যের দ্বারা বোঝা যায় যে, তার প্রথম বাসস্থানও পালনকর্তার কাছে ছিল। সেখানেই ফিরে যেতে বলা হচ্ছে। এতে সে হাদীসের সমর্থন রয়েছে যাতে বলা হয়েছে যে, মু’মিনগণের আত্মা তাদের আমলনামাসহ সপ্তম আকাশে আরসের ছায়াতলে অবস্থিত ইল্লিয়্যীনে থাকবে। সমস্ত আত্মার আসল বাসস্থান সেখানেই। সেখানে থেকে এনে মানব দেহে প্রবিষ্ট করানো হয় এবং মৃত্যুর পর সেখানেই ফিরে যায়।

رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً

‘আন-নাফসুল মুতমায়িন্নাহ’ - আত্মা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট এবং আল্লাহ তা'আলাও তার প্রতি সন্তুষ্ট। কেননা, বান্দার সন্তুষ্টির দ্বারাই বোঝা যায় যে, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট। আল্লাহ বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট না হলে বান্দা আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট হওয়ার তাওফীকই পায় না। এমনি আত্মা মৃত্যুকালে মৃত্যুতেও সন্তুষ্ট ও আনন্দিত হয়।

فَادْخُلِي فِي عِبَادِي

২৯. অতঃপর আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও,

প্রশান্ত আত্মাকে সম্বোধন করে বলা হবে, আমার বিশেষ বান্দাদের কাতারভুক্ত হয়ে যাও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর। এ আদেশ হতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, জান্নাতে প্রবেশ করা নেককার সৎ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ওপর নির্ভরশীল। তাদের সাথেই জান্নাতে প্রবেশ করা যাবে। এ কারণেই সুলাইমান আলাইহিস সালাম

দোআ প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "এবং আপনার অনুগ্রহে আমাকে আপনার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের শামিল করুন।" [সূরা আন-নামল: ১৯]

অনুরূপভাবে ইউসুফ আলাইহিস সালামও দো'আ করতে গিয়ে বলেছিলেন, "আর আমাকে সৎকর্মপরায়ণদের সাথে মিলিয়ে দিন" [সূরা ইউসুফ: ১০১] এমনকি ইবরাহীম আলাইহিস সালামও দোআ করে বলেছিলেন, "হে আমার রব! আমাকে প্রজ্ঞা দান করুন এবং আমাকে সৎকর্মপরায়ণদের সাথে মিলিয়ে দিন"। [সূরা আশ-শু'আরা: ৮৩] এতে বোঝা গেল, সৎসংসর্গ একটি মহা নেয়ামত, যা নবী-রাসূলগণও উপেক্ষা করতে পারেন না।

وَادْخُلِي جَنَّتِ

৩০. আর আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।

এখানে 'আমার জান্নাত' বলা হয়েছে জান্নাতের বিশেষ মর্যাদা প্রকাশ করার জন্য। কেননা এটা কেবল একটি শান্তির বাগিচা নয়, বরং আল্লাহর সন্তুষ্টির স্থল।

আলোচ্য আয়াতসমূহে বণিত মু'মিনগণকে আল্লাহ্ তা'আলার সম্মানসূচক এ সম্বোধন কখন হবে, সে সম্পর্কে কোন কোন তফসীরকার বলেন, কিয়ামতে হিসাব-নিকাশের পর এ সম্বোধন হবে। আয়াতসমূহের পূর্বাপর বর্ণনার দ্বারাও এর সমর্থন হয়। কারণ, পূর্বোল্লিখিত কাফিরদের আযাব কিয়ামতের পরেই হবে। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, মু'মিনদের প্রতি এ সম্বোধনও তখনই হবে। কেউ কেউ বলেনঃ এ সম্বোধন মৃত্যুর সময় দুনিয়াতেই হয়। অনেক হাদীসও এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। তাই ইবনে কাসীর বলেছেন: উভয় সময়েই মু'মিনদের আত্মাকে এই সম্বোধন করা হবে মৃত্যুর সময়েও এবং কিয়ামতেও।

যেসব হাদীস থেকে মৃত্যুর সময় সম্বোধন হবে বলে জানা যায়, তন্মধ্যে একটি হচ্ছে পূর্বোল্লিখিত ওবাদা ইবনে সামেত (রা)-এর হাদীস। অপর একটি হাদীস হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে মসনদে আহমদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজায় বর্ণিত আছে, যাতে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন: যখন মু'মিনের মৃত্যুর সময় আসে, তখন রহমতের ফেরেশতা সাদা রেশমী বস্ত্র সামনে রেখে তার আত্মাকে সম্বোধন করে اخرجي راضيه مرضيه الى روح الله وريحان الله অর্থাৎ তুমি আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট এবং আল্লাহ্ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট–এমতাবস্থায় তুমি এ দেহ থেকে বের হয়ে আস। আল্লাহ্ রহমত এবং জান্নাতের চিরন্তন সুখের দিকে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন আমি একদিন রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সামনে يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ আয়াতখানি পাঠ করলাম।

হযরত আবু বকর (রা) মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেনঃ ইয়া রসূলুল্লাহ্ । এটা কি চমৎকার সম্বোধন ও সম্মান প্রদর্শন। রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : শুনে রাখুন, মৃত্যুর পর ফেরেশতা আপনাকে এই সম্বোধন করবে। (ইবনে কাসীর)

ফুটনোট

◘ ১৪টি আয়াতে ৫টি বিষয়ের (ফজর, দশটি রাত, জোড় ও বেজোড় এবং বিদায়ী রাতের) কসম করা হয়েছে।

◘ 'ফজর' যা দু'প্রকার : সুবহে কাযেব (মিথ্যা প্রভাত), সুবহে সাদেক (সত্য প্রভাত)।

◘ শপথের ক্ষেত্রে উল্লেখিত দশ হচ্ছে কোরবানীর মাসের দশদিন (যিলহজ্বের দশ দিন), বেজোড় হচ্ছে আরাফার দিন (যিলহজ্বের নয় তারিখ) আর জোড় হচ্ছে কোরবানীর দিন (যিলহজ্বের দশ তারিখ) ।

◘ এ সূরায় তিনটি জাতির আযাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে-(এক) আদ বংশ, (দুই) সামূদ গোত্র এবং (তিন) ফিরআউন সম্প্রদায়।

◘ 'ইরাম'একটি গোত্রের নাম। আবার বলা হয় إِرَمَ আদ জাতির পিতামহের নাম।

◘ আদ জাতি দৈহিক গঠন ও শক্তি-সাহসে অন্য সব জাতি থেকে স্বতন্ত্র ছিল।

◘ সামূদ' গোত্র হল 'ইরম' বংশের অন্যতম শাখা। 'আদ ও সামূদ উভয় গোত্রের মূল দাদা হলেন 'ইরম'।

◘ সূরায় উল্লেখিত উপত্যকা বলতে 'আলকুরা' উপত্যকা বুঝানো হয়েছে। সামূদ জাতির লোকেরা সেখানে পাথর কেটে কেটে তার মধ্যে এভাবে ইমারত নির্মাণের রীতি প্রচলন করেছিল। এরা স্বালেহ (আঃ)-এর জাতি ছিল।

◘ ইরমের বংশধররা আম্মান ও হাযারামাউত এলাকায় বসবাস করত। তাদের প্রধান শহরের নাম ছিল 'হিজর'। সামুদ জাতি জাতি পাহাড়ের ভেতর খোদাই করে নিজেদের গৃহ নির্মাণ করতো, এজন্য তাদেরকে 'আসহাবুল হিজর' সম্বোধন করা হয়েছে। আরবের উত্তর-পশ্চিম এলাকায় শাম হতে মক্কার পথে অবস্থিত এই শহরকে এখন 'মাদায়েনে সালেহ' বলা হয়।

◘ ফিরআউনকে 'যুল আউতাদ' (কীলকধারী) বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

◘ 'আদ ও সামূদ জাতি যেমন প্রবল ঝঞ্ঝাবায়ু এবং প্রচন্ড নিনাদসহ ভূমিকম্পে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। ফেরাঊন তেমনি তার সৈন্য-সামন্ত ও লোক-লশকরসহ চোখের নিমিষে সাগরে ডুবে ধ্বংস হয়েছিল।

◘ ১৫-১৬ নং আয়াতে একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে যে, দুনিয়াতে মানুষকে দেয়া সম্মান ও অসম্মান, সচ্ছলতা বা অসচ্ছলতা আল্লাহর নিকটে কারো প্রিয় বা অপ্রিয় হওয়ার নিদর্শন নয়। বরং সবকিছু হয়ে থাকে বান্দাকে পরীক্ষা করার জন্য আল্লাহর ফায়ছালা ও তাঁর পূর্ব নির্ধারণ (قضاء وقدر) অনুযায়ী। প্রকৃত মুমিন বান্দা সচ্ছল ও অসচ্ছল, কষ্ট ও আনন্দ উভয় অবস্থায় সবর করে ও আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকে।

◘ ১৭-২০ নং আয়াতে কাফিরদের চারটি মন্দ অভ্যাস বর্ণনা-

- ইয়াতীমকে সম্মান না করা,
- মিসকীনকে খাদ্যদানে পরস্পরকে উৎসাহিত না করা,
- উত্তরাধিকারের সম্পদ সম্পূর্ণরূপে খেয়ে ফেলা,
- সীমাহীন ধনলিপ্সা।

◘دَكًّا دَكًّا বারবার বলায় ইঙ্গিত হয়েছে যে, কিয়ামতের ভূকম্পন একের পর এক অব্যাহত থাকবে।

◘ পূর্বের আয়াতগুলিতে (২৩-২৬) অবিশ্বাসী কাফের-মুনাফিকদের কঠিন শাস্তির বর্ণনা শেষে এবার (২৭-৩০ আয়াতে) প্রকৃত বিশ্বাসী মুমিন নর-নারীদের অবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে।

◘ মুমিনদের হৃদয়কে 'নফসে মুত্বমাইন্নাহ' বা প্রশান্ত আত্মা বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

◘ 'নফস' তিন প্রকার। এক- নফসে মুত্বমাইন্নাহ- প্রশান্ত হৃদয়। দুই- নফসে লাউয়ামাহ- তিরষ্কারকারী আত্মা অর্থাৎ বিবেক এবং তিন- নফসে আম্মারাহ অর্থাৎ অন্যায় কাজে প্ররোচনা দানকারী অন্তর।

◘ প্রশান্ত আত্মাকে সম্বোধন করে বলা হবে, আমার বিশেষ বান্দাদের কাতারভুক্ত হয়ে যাও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর। 'আমার জান্নাত' বলা হয়েছে জান্নাতের বিশেষ মর্যাদা প্রকাশ করার জন্য। কেননা এটা কেবল একটি শান্তির বাগিচা নয়, বরং আল্লাহর সন্তুষ্টির স্থল।

কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২৪
প্রস্তুতি সহায়ক তাফসীর নোট পর্বঃ ২

সূরা গাশিয়াহ

সূরা আল গাশিয়াহ্ কুরআনের ৮৮ তম সূরা, এর আয়াত সংখ্যা ২৬। সূরা আল গাশিয়াহ্ মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। সূরার নামের অর্থ আচ্ছন্নকারী।

নামকরণ

প্রথম আয়াতের اَلْغَاشِيَةِ শব্দকে এর নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরাটির সমগ্র বিষয়বস্তু একথা প্রমাণ করে যে এটিও প্রথম দিকে অবতীর্ণ সূরাগুলোর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এটি এমন সময় নাযিল হয় যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচারের কাজ শুরু করেন এবং মক্কার লোকেরা তাঁর দাওয়াত শুনে তাঁর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করতে থাকে।

বিষয়বস্তু

অত্র সূরায় ক্বিয়ামত দিবসে জান্নাতী ও জাহান্নামী দু’দল মানুষের দু’রকমের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে (১-১৬ আয়াত)। অতঃপর মরুচারী আরবদের পথ প্রদর্শনের জন্য তাদের অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল চারটি নিদর্শন উল্লেখ করে এসবের সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহর অপার কুদরতের বিষয় চিন্তা-গবেষণা করার আহবান জানানো হয়েছে (১৭-২০ আয়াত)। সবশেষে রাসূল (সাঃ)-কে সান্ত্বনা দিয়ে বলা হয়েছে যে, তুমি তাদের উপর শাসক নও। বরং তোমার দায়িত্ব কেবল উপদেশ দেওয়া। অতঃপর তাদের যথাযথ প্রতিফল দানের দায়িত্ব আমার উপরে ন্যস্ত (২১-২৬ আয়াত)

গুরুত্ব

নু‘মান বিন বাশীর (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) দুই ঈদ ও জুম‘আর সালাতে সূরা আ‘লা ও গাশিয়াহ পাঠ করতেন। এমনকি জুম‘আ ও ঈদ একদিনে হলেও তিনি উক্ত দু’টি সূরাই পাঠ করতেন’।

আগের ও পরের সূরার সাথে সম্পর্ক

আগের সূরা আল আ’লা- এর অন্যতম বিষয় হলো পরিশুদ্ধি। ৯ম ও ১০ আয়াতে উপদেশ দান করা, মনে করিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে পরিশুদ্ধিতে সহায়তার কথা বলা হয়েছে। মানুষ শুধু আরেকজনকে উপদেশ দিতে পারে। অন্যকে পরিশুদ্ধ করতে পারে না। যার নিজের মধ্যে আল্লাহর ভয় আছে সেই নিজেকে পরিশুদ্ধ করে নিতে পারে। এই বিষয়টির আরো বিস্তারিত ব্যাখ্যা এসেছে পরের সূরা আল গশিয়াহ তে। সূরা আ'লাতে পরকালের জন্য প্রস্তুত হওয়ার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। আর এই সূরায় পরকালের জন্য তৈরী না হলে শাস্তির কথা শুনিয়ে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও সূরা আল গাশিয়াহতে পূণ্যবান ও পাপীদের প্রতিদান ও প্রতিফলের কথা বর্ণনা করা হয়েছে আর পরবর্তী সূরা আল ফজরে এমন সব কাজের কথার উল্লেখ রয়েছে যেগুলোর প্রতিফল শুধু শাস্তি। অবিশ্বাসী ও কাফের সম্প্রদায়ের ধ্বংসের কথাও আলোচিত হয়েছে।

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ

১. আপনার কাছে কি আচ্ছন্নকারীর (কিয়ামতের) সংবাদ এসেছে?

هَلْ أَتَاكَ বাক্যে هَلْ প্রশ্নবোধক অব্যয় হলেও প্রকৃত অর্থ হবে قد অর্থাৎ 'অবশ্যই তোমার নিকট ক্বিয়ামতের খবর পৌঁছেছে'। যেমন هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ (দাহর ১)-এর অর্থ قد أتى 'অবশ্যই এসেছে'। বক্তব্যকে শ্রোতার হৃদয়ে প্রোথিত করার জন্য এটি আরবদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বাকরীতি।
'গাশিয়াহ'-এর আভিধানিক অর্থ 'আচ্ছন্নকারী'। এখানে অর্থ হবে 'ক্বিয়ামত'। সেদিনের ভয়াবহতা ও ভয়ংকর অবস্থা সবকিছুকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে। ইবনু আববাস, ক্বাতাদাহ ও ইবনু যায়েদ বলেন, 'গাশিয়াহ' হল ক্বিয়ামত দিবসের অন্যতম নাম'।

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ

২. সেদিন অনেক চেহারা হবে অবনত,

চেহারা শব্দটি এখানে ব্যক্তি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মানুষের শরীরের সবচেয়ে উল্লেখ যোগ্য ও সবচেয়ে সুস্পষ্ট অংশ হচ্ছে তার চেহারা। এর মাধ্যমে তার ব্যক্তিত্বের পরিচিতি ফুটে ওঠে। মানুষ ভালো-মন্দ যে অবস্থারই সম্মুখীন হয়, তার প্রকাশ ঘটে তার চেহারায়। তাই "কিছু লোক" না বলে "কিছু চেহারা" বলা হয়েছে।
কিয়ামতে মুমিন ও কাফের আলাদা আলাদা বিভক্ত দু'দল হবে এবং মুখমণ্ডল দ্বারা পৃথকভাবে পরিচিত হবে। এই আয়াতে কাফিরদের মুখমণ্ডলের এক অবস্থা এই বর্ণিত হয়েছে যে,خاشعة অর্থাৎ হেয় হবে। خشوع - শব্দের অর্থ নত হওয়া ও লাঞ্ছিত হওয়া। নামাযে খশুর অর্থ আল্লাহর সাওড়ট নত হওয়া, হেয় হওয়া। যারা দুনিয়াতে আল্লাহর সামনে খুশু অবলম্বন করেনি, কিয়ামতে এর শাস্তিস্বরূপ তাদের মুখমণ্ডল লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে। [মাআ'রিফুল কুরআন]

عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ

৩. ক্লিষ্ট, ক্লান্ত

দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থা হবে (عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ) বাকপদ্ধতিতে অবিরাম কর্মের কারণে পরিশ্রান্ত ব্যক্তিকে عَامِلَةٌএবং ক্লান্ত ও ক্লিষ্ট ব্যক্তিকে বলা হয় نَاصِبَةٌ। [ফাতহুল কাদীর] কাফেরদের এ অবস্থা কখন হবে? এ নিয়ে কয়েকটি মত রয়েছে। কোন কোন মুফাসসিরের মতে, কাফেরদের এ দুরাবস্থা দুনিয়াতেই হবে। কেননা, আখেরাতে কোন কর্ম ও মেহনত নেই। [ফাতহুল কাদীর] কেননা, অনেক কাফের দুনিয়াতে মুশরিকসুলভ ইবাদত এবং বাতিল পন্থায় অধ্যবসায় ও সাধনা করে থাকে। হিন্দু যোগী ও নাসারা পাদ্রী অনেক এমন আছে, যারা আন্তরিকতা সহকারে আল্লাহ্ তা'আলারই সন্তুষ্টির জন্যে দুনিয়াতে ইবাদত ও সাধনা করে থকে এবং এতে অসাধারণ পরিশ্রম স্বীকার করে। কিন্তু এসব ইবাদত মুশরিক সুলভ ও বাতিল পন্থায় হওয়ার কারণে আল্লাহর কাছে সওয়াব ও পুরস্কার লাভের যোগ্য হয় না।

অতএব, তাদের মুখমণ্ডল দুনিয়াতেও ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত রইল এবং আখেরাতে তাদেরকে লাঞ্ছনা ও অপমানের অন্ধকার আচ্ছন্ন করে রাখবে। খলীফা ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু 'আনহু যখন শাম সফর করেন তখন জনৈক নাসারা বৃদ্ধ পাদ্রী তাঁর কাছ দিয়ে যেতে দেখলেন। সে তাঁর ধর্মীয় ইবাদত সাধনা ও মোজাহাদায় এত বেশী

আত্মনিয়োগ করেছিল যে, অতিরিক্ত পরিশ্রমের কারণে চেহারা বিকৃত এবং দেহ শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। তার পোশাকের মধ্যেও কোন শ্রী ছিল না। খলীফা তাকে দেখে অশ্রু সংবরণ করতে পারলেন না। ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বললেনঃ এই বৃদ্ধার করুণ অবস্থা দেখে আমি ক্রন্দন করতে বাধ্য হয়েছি। বেচারী স্বীয় লক্ষ্য অজর্নের জন্যে জীবনপণ পরিশ্রম ও সাধনা করেছে কিন্তু সে তার লক্ষ্য অজর্নে ব্যর্থ হয়েছে এবং আল্লাহর সন্তুটি অর্জন করতে পারেনি। তারপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন। [ইবন কাসীর]

কাতাদাহ রাহেমাহুল্লাহর মতে, তাদের অবিরাম কষ্ট ও ক্লান্তি দু'টোই আখেরাতে হবে। সে হিসেবে আয়াতের অর্থ, যারা দুনিয়াতে আল্লাহর ইবাদত করতে অহংকার করেছিল তাদেরকে সেদিন কর্মে খাটানো হবে এবং তাদেরকে জাহান্নামে প্রতিষ্ঠিত করা হবে; এমতাবস্থায় যে তারা তাদের ভারী জিঞ্জির ও ভারী বোঝাসমূহ বহন করতে থাকবে। অনুরূপভাবে তারা হাশরের মাঠের সে বিপদসংকুল সময়ে নগ্ন পা ও শরীর নিয়ে কঠিন অবস্থায় অবস্থান করতে থাকবে, যার পরিমান হবে পঞ্চাশ হাজার বছর। হাসান বসরী ও সাঈদ ইবনে জুবাইর রাহেমাহুমাল্লাহ বলেন, তারা যেহেতু দুনিয়াতে আল্লাহর জন্য কোন নেক আমল করেনি, সেহেতু সেখানে তারা জাহান্নামে কঠিন খাটুনি ও কষ্ট করবে। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, তাদেরকে কঠিন কঠিন পাহাড়ে ওঠা-নামার কাজে লাগানো হবে। পরে কষ্ট ও ক্লান্তি উভয়টিরই সম্মুখীন হবে। [ফাতহুল কাদীর]

تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً

৪. তারা প্রবেশ করবে জ্বলন্ত আগুনে;

তারা এমন অগ্নিতে প্রবেশ করবে, যা চূড়ান্তভাবে উত্তপ্ত। যে আগুনকে যুগ যুগ ধরে উত্তপ্ত করা হয়েছে, যার সমতুল্য উত্তাপ আর নেই। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, যখন তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে, তখন তার উৎক্ষিপ্ত গর্জন শুনতে পাবে'। 'তখন মনে হবে জাহান্নাম যেন ক্রোধে ফেটে পড়ছে' (মুলক ৭-৮)। কেননা ঐ সময় জাহান্নামকে আরো বেশী উত্তপ্ত করা হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, 'যেদিন জাহানামকে উত্তপ্ত করা হবে' (তাকভীর ১২)। অর্থাৎ এখানে نَاراً حَامِيَةً বলতে 'চূড়ান্তভাবে উত্তপ্ত অগ্নি' বুঝানো হয়েছে।

تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ

৫. তাদেরকে অত্যন্ত উষ্ণ প্রস্রবণ থেকে পান করানো হবে;

এমন ঝর্ণার পানি, যা চূড়ান্তভাবে উত্তপ্ত । যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 'তারা জাহান্নামের আগুন ও ফুটন্ত পানির মধ্যে ছুটাছুটি করবে' (সূরা আর রহমান ৪৪)।

لَّيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ

৬. তাদের জন্য খাদ্য থাকবে না কাঁটাযুক্ত গুল্ম ছাড়া,

ضَرِيعٌশব্দের অর্থ করা হয়েছে, কাঁটাযুক্ত গুল্ম। অর্থাৎ জাহান্নামীরা কোন খাদ্য পাবে না কেবল এক প্রকার কণ্টকবিশিষ্ট ঘাস। পৃথিবীর মাটিতে এ ধরনের গুল্ম ছড়ায়। দুর্গন্ধযুক্ত বিষাক্ত কাঁটার কারণে জন্তু-জানোয়ার এর ধারে কাছেও যায় না। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত যে, ضَرِيعٌহচ্ছে জাহান্নামের একটি গাছ। যা খেয়ে কেউ মোটা তাজা হবে না এবং এতে ক্ষুধা থেকেও মুক্তি পাওয়া যাবে না। [ফাতহুল কাদীর]

লক্ষণীয় যে, কুরআন মজীদে কোথাও বলা হয়েছে, জাহান্নামের অধিবাসীদের খাবার জন্য "যাক্কুম" দেয়া হবে। কোথাও বলা হয়েছে, "গিস্‌লীন" (ক্ষতস্থান থেকে ঝরে পড়া তরল পদার্থ) ছাড়া তাদের আর কোন খাবার থাকবে না। আর এখানে বলা হচ্ছে, তারা খাবার জন্য কাঁটাওয়ালা শুকনো ঘাস ছাড়া আর কিছুই পাবে না। এ বর্ণনাগুলোর মধ্যে মূলত কোন বৈপরীত্য নেই। এর অর্থ এও হতে পারে যে, জাহান্নামের অনেকগুলো পর্যায় থাকবে। বিভিন্ন অপরাধীকে তাদের অপরাধ অনুযায়ী সেই সব পর্যায়ে রাখা হবে। তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের আযাব দেয়া হবে। আবার এর অর্থ এও হতে পারে যে, তারা "যাক্কুম" খেতে না চাইলে "গিস্‌লীন" পাবে এবং তা খেতে অস্বীকার করলে কাটাওয়ালা ঘাস ছাড়া আর কিছুই পাবে না। মোটকথা, তারা কোন মনের মতো খাবার পাবে না। [তাফহীমুল কুরআন]

لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ

৭. যা তাদেরকে পুষ্ট করবে না এবং তাদের ক্ষুধা নিবৃত্ত করবে না।

পূর্ববর্তী বাক্যের ব্যাখ্যা হিসাবে এসেছে যে, এমন ঘাস যা খেয়ে জাহান্নামীরা পুষ্ট হবে না বা তাদের ক্ষুধাও মিটবে না। অথচ প্রচুর ক্ষুধায় বাধ্য হয়ে ওটাই তারা খাবে গোগ্রাসে। নিঃসন্দেহে এটি হবে আরও কষ্টদায়ক।

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ

৮. অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে আনন্দোজ্জ্বল,

১ হতে ৭ আয়াত পর্যন্ত হতভাগ্যদের পরিণতি বর্ণনা শেষে এবার সৌভাগ্যবানদের বর্ণনা শুরু হয়েছে। অর্থাৎ ক্বিয়ামতের দিন তাদের চেহারা হবে সুন্দর, সজীব ও প্রফুল্ল। স্বীয় কর্মফলে সন্তুষ্ট। দুনিয়ায় তারা যে সৎকর্মাদি করেছিল, জান্নাত হবে তারই প্রতিদান। যেমন আল্লাহ সেদিন তাদের ডেকে বলবেন, 'এই যে জান্নাতের উত্তরাধিকারী তোমরা হয়েছ, এটা তোমাদের কৃতকর্মের প্রতিদান স্বরূপ' (যুখরুফ ৭২)। তিনি বলবেন, 'তোমরা এখানে খুশীমনে খাও ও পান কর তোমাদের কর্মের বিনিময় স্বরূপ' (মুরসালাত ৪৩)। তিনি বলেন, 'যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদের কৃতকর্মের প্রতিদানস্বরূপ তাদের আপ্যায়নের জন্য জান্নাত হবে তাদের বাসস্থান' (সাজদাহ ১৯)।

তবে কেবল আমলই যথেষ্ট নয়, যদি না তার সাথে আল্লাহর রহমত শামিল থাকে। যেমন আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, 'তোমাদের আমল তোমাদের কাউকে নাজাত দিবে না। তারা বললেন, আপনাকেও নয় হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন, আমাকেও না। যদি না আল্লাহ আমাকে নিজ অনুগ্রহ দ্বারা আবৃত করেন। অতএব তোমরা দৃঢ়ভাবে সৎকর্ম করে যাও এবং মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর'। [বুখারী ৬৪৬৩, মুসলিম ২৮১৬]

لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ

৯. নিজেদের কাজের সাফল্যে পরিতৃপ্ত

অর্থাৎ দুনিয়ায় তারা যেসব প্রচেষ্টা চালিয়ে ও কাজ করে এসেছে আখেরাতে তার চমৎকার ফল দেখে তারা আনন্দিত হবে। তারা এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে যাবে যে, দুনিয়ায় ঈমান, সততা ও তাকওয়ার জীবন অবলম্বন করে তারা নিজেদের প্রবৃত্তি ও কামনা-বাসনার যে কুরবানী দিয়েছে, দায়িত্ব পালন করার ব্যাপারে যে কষ্ট স্বীকার করেছে, আল্লাহর বিধানের আনুগত্য করতে গিয়ে যেসব জুলুম-নিপীড়নের শিকার হয়েছে, গোনাহ থেকে বাঁচতে

গিয়ে যেসব ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে এবং যেসব স্বার্থ ও স্বাদ আস্বাদন থেকে নিজেকে বঞ্চিত করেছে তা সবই আসলে বড়ই লাভজনক কারবার ছিল। [তাফহীমুল কুরআন]

فِيْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ

১০. সুউচ্চ জান্নাতে—

কুরতুবী বলেন, এটা এজন্য বলা হয়েছে যে, জান্নাত হবে আসমানসমূহের উপরে। বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, জান্নাতে একশত স্তর থাকবে। প্রতিটি স্তরের মধ্যকার দূরত্ব আসমান ও যমীনের মধ্যকার দূরত্বের ন্যায় হবে'। ফেরদৌস হল সর্বোচ্চ স্তর। সেখান থেকেই প্রবাহিত হয় চারটি ঝর্ণাধারা। আর তার উপরেই রয়েছে আল্লাহর আরশ। অতএব যখন তোমরা চাইবে, তখন জান্নাতুল ফেরদৌস চাইবে'। উক্ত চারটি ঝর্ণাধারা হল : নির্মল পানি, দুধ, শারাব ও মধু (মুহাম্মাদ ১৫)।

لَّا تَسْمَعُ فِيْهَا لَاغِيَةً

১১. সেখানে তারা অসার বাক্য শুনবে না

জান্নাতে মানুষ যে সমস্ত নিয়ামত লাভ করবে তার মধ্যে একটি বড় নিয়ামত হবে এই যে, সেখানে কোন আজেবাজে অর্থহীন ও কটু কথা শোনা যাবে না। সেখানকার সমগ্র সমাজ হবে পাক-পবিত্র, পরিচ্ছন্ন ও ক্লেদমুক্ত। প্রত্যেক ব্যক্তির প্রকৃতিই হবে ভারসাম্যপূর্ণ। সেখানকার বাসিন্দারা পরনিন্দা, পরচর্চা, গালি-গালাজ, অশ্লীল গান ও অন্যান্য অশালীন ধ্বনি একেবারেই শুনবে না। সেখানে মানুষ শুধুমাত্র ভালো, ন্যায়সঙ্গত ও যথার্থ কথাই শুনবে। এ দুনিয়ায় যে ব্যক্তি একটি যথার্থ পরিচ্ছন্ন ও শালীন, রুচির অধিকারী একমাত্র সে-ই এ নিয়ামতের কদর বুঝতে পারে। কারণ একমাত্র সে-ই অনুভব করতে পারে যে, মানুষের জন্য এমন একটি পূতিগন্ধময় সমাজে বাস করা কত বড় বিপদ যেখানে কোন মুহূর্তেই তার কান মিথ্যা, পরনিন্দা, ফিতনা, ফাসাদ, অশ্লীল অশালীন, গীবত ও চোগলখুরী, অপবাদ, গালি, অহংকার ও বাজে গালগপ্প বিদ্রূপ ও উপহাস, তিরস্কার ও বদনামমূলক কথাবার্তা থেকে সংরক্ষিত থাকে না।

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, (لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا) "সেখানে তারা 'শান্তি' ছাড়া কোন আসার বাক্য শুনবে না এবং সেখানে সকালসন্ধ্যা তাদের জন্য থাকবে জীবনোপকরণ।" [সূরা মারইয়াম: ৬২] আরও এসেছে, (لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا) "সেখানে তারা শুনবে না কোন অসার বা পাপবাক্য"। [সূরা আল-ওয়াকি'আহ: ২৫] আরও বলা হয়েছে, (لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا) "সেখানে তারা শুনবে না অসার ও মিথ্যা বাক্য" [সূরা আন-নাবা: ৩৫] এ থেকে জানা গেল যে, দোষারোপ ও অশালীন কথাবার্তা খুবই পীড়াদায়ক। তাই জান্নাতীদের অবস্থায় একে গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করা হয়েছে।

فِيْهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ

১২. সেখানে থাকবে বহমান প্রস্রবণ,

যেখানে থাকবে প্রবহমান ঝরণাসমূহ'। যা কখনো বন্ধ হবে না। عَيْنٌ একবচন এলেও অর্থ বহুবচন হবে। কেননা عَيْنٌএখানে জাতিবোধক।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) বলেন : জান্নাতের ঝর্ণাসমূহ মিশকের টিলা বা পাহাড় হতে প্রবাহিত। (সহীহ ইবনু হিব্বান হা. ২৬২২)।

فِيْهَا سُرُرٌ مَّرْفُوْعَةٌ

১৩. সেখানে থাকবে উন্নত শয্যাসমূহ,

এ উন্নত অবস্থা সার্বিক দিকেই হবে। এ সমস্ত শয্যা অবস্থান, মর্যাদা ও স্থান সবদিক থেকেই উন্নত। সাধারণত মানুষ এ ধরনের শয্যা পছন্দ করে থাকে। আল্লাহর বন্ধুরা যখন এ সমস্ত শয্যায় বসতে চাইবে, তখনি সেগুলো তাদের জন্য নিচু হয়ে আসবে। [ইবনে কাসীর]

وَّ اَكْوَابٌ مَّوْضُوْعَةٌ

১৪. আর প্রস্তুত থাকবে পানপত্র,

اكواب শব্দটি كوب এর বহুবচন। অর্থ পানপাত্র, যথা গ্লাস ইত্যাদি। موضوعঅর্থাৎ নির্দিষ্ট জায়গায় পানির সন্নিকটে রক্ষিত থাকবে। এতে একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক নীতি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ পানপাত্র পানির কাছে নির্দিষ্ট জায়গায় থাকা উচিত। যদি এদিক-সেদিক থাকে এবং পানি পান করার সময় তালাশ করতে হয়, তবে এটা কষ্টকর ব্যাপার। তাই সব ব্যবহারের বস্তু—যেমন বদনা, গ্লাস, তোয়ালে ইত্যাদি নির্দিষ্ট জায়গায় থাকা এবং ব্যবহারের পর সেখানেই রেখে দেওয়ার ব্যাপারে প্রত্যেকেরই যত্নবান হওয়া উচিত যাতে অন্যদের কষ্ট না হয়। জান্নাতীদের পানপাত্র পানির কাছে রক্ষিত থাকবে —একথা উল্লেখ করে আল্লাহ্ তা'আলা উপরোক্ত নীতির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। [মাআরিফুল কুরআন]

وَّ نَمَارِقُ مَصْفُوْفَةٌ

১৫. ও সারি সারি বালিশসমূহ।

ইবনু আববাস (রাঃ) বলেন, نَمَارِق অর্থ وَسَائِد তাকিয়া বা বালিশসমূহ, যাতে ঠেস দিয়ে বসা হয় বা শোওয়া হয়। একবচনে نُمْرُقَةٌ । অর্থাৎ বিছানার চারপাশে এগুলি মওজুদ থাকবে।[কুরতুবী]

وَّ زَرَابِيُّ مَبْثُوْثَةٌ

১৬. এবং বিছানা গালিচা;

مَبثُوثَةমানে বিছানো বা ছড়ানো। অর্থাৎ, এ সব আসন বিভিন্ন জায়গায় বিছানো থাকবে। জান্নাতীরা যেখানে ইচ্ছা সেখানে আরাম করতে পারবে। জান্নাতের যেখানেই তারা অবস্থান করবে সেখানেই তারা বালিশ, বিছানা, তাকিয়া, চেয়ার, পানপাত্র- সবকিছু হাতের নাগালের মধ্যে পাবে। যা সংখ্যায় একটি নয়। বরং বিক্ষিপ্তভাবে চারিদিকে। যেখানেই তারা যাবে, সেখানেই পাবে সবকিছু প্রস্তুত।

اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ

১৭. তবে কি তারা তাকিয়ে দেখে না উটের দিকে, কিভাবে তা সৃষ্টি করা হয়েছে?

কিয়ামতের অবস্থা এবং মু'মিন ও কাফিরের প্রতিদান এবং শাস্তি বর্ণনা করার পর কিয়ামতে অবিশ্বাসী হঠকারীদের পথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কুদরতের কয়েকটি নিদর্শন সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করার কথা বলেছেন। আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন আকাশ ও পৃথিবীতে অসংখ্য। এখানে মরুচারী আরবদের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যশীল চারটি নিদর্শনের উল্লেখ করা হয়েছে। আরবরা উঠে সওয়ার হয়ে দূর-দূরান্তে সফর করে।

তখন তাদের সর্বাধিক নিকটে থাকে উট, উপরে আকাশ, নিচে ভূপৃষ্ঠ এবং অগ্র-পশ্চাতে সারি সারি পর্বতমালা। এই চারটি বস্তু সম্পর্কেই তাদেরকে চিন্তাভাবনা করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ অন্যান্য নিদর্শন বাদ দিয়ে যদি এ চারটি বস্তু সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করা হয়, তবে আল্লাহর অপার কুদরত চাক্ষুষ দেখা যাবে।

উটের প্রতি গভীর মনোযোগের সাথে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে যে, ওকে অদ্ভুতভাবে এবং শক্তি ও সুদৃঢ়ভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও এই জন্তু অতি নম্র ও সহজভাবে বোঝা বহন করে থাকে এবং অত্যন্ত আনুগত্যের সাথে চলাফেলা করে। মানুষ ওর গোশত ভক্ষণ করে, ওর। পশম তাদের কাজে লাগে, তারা ওর দুধ পান করে থাকে এবং ওর দ্বারা তারা আরো নানাভাবে উপকৃত হয়। সর্বাগ্রে উটের কথা বলার কারণ এই যে, আরবের লোকেরা সাধারণতঃ উটের দ্বারাই সবচেয়ে বেশী উপকৃত হয়ে থাকে। উট আরববাসীদের নিকট সর্বাধিক ব্যবহৃত প্রাণী। উটের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টিপাত করার আদেশকরণের কারণ এই যে, এই জন্তুর পানাহার পদ্ধতি, চালচলন, প্রাকৃতিক ক্রিয়া, সঙ্গম, প্রণালী, বসার নিয়ম ইত্যাদি অন্যান্য জন্তু হতে সম্পূর্ণ পৃথক। এই জন্তু একবার পানাহার করলে এক সপ্তাহ আর পানাহারের প্রয়োজন হয় না। [ইবনে কাসীর] মরুভূমির একমাত্র বাহন হিসাবে উটকে سَفِيْنَةُ الْبَرِّ বা 'মরু জাহায' বলা হয়।

وَ اِلَى السَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ

১৮. এবং আসমানের দিকে, কিভাবে তা ঊর্ধ্বে স্থাপন করা হয়েছে?

উটের পরে আল্লাহ আকাশের প্রতি বান্দার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আকাশকে বহু উঁচুতে রাখা হয়েছে। পাঁচশত বছরের দূরত্বের পথ; তা বিনা খুঁটিতে দাঁড়িয়ে আছে। তাতে কোন ফাটল ও বক্রতা নেই। পরন্তু তাকে আমি নক্ষত্র দ্বারা সৌন্দর্যমন্ডিত করেছি। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন- 'তারা কি দেখে না তাদের মাথার উপরে আকাশের দিকে, কিভাবে আমরা তাকে নির্মাণ করেছি এবং সৌন্দর্যমন্ডিত করেছি এবং তাতে নেই কোন ফাটল' (ক্বাফ ৬)।

وَ اِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ

১৯. এবং পর্বতমালার দিকে, কিভাবে তা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে?

প্রাণীজগতে উট, নভোজগতে আকাশ, অতঃপর ভূ-জগতে পাহাড় আল্লাহর এক একটি বিস্ময়কর সৃষ্টি। এখানে সেদিকেই বান্দার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

পাহাড়সমূহ মোটামুটি চারভাগে বিভক্ত। **এক-** পাথরের পাহাড়। এতে কোন গাছ-পালা জন্মে না। সঊদী আরবের তেহামাসহ অনেক স্থানে এরূপ পাহাড় দেখা যায়। প্রচন্ড দাবদাহের সময় এগুলি এমন উত্তপ্ত হয় যে, সেদিকে তাকানো যায় না। **দুই-** ভূমিজ পাহাড়। যাতে গাছ-পালা, তরু-লতা ইত্যাদি জন্মে। যেমন ফিলিস্তীন, তাবারিস্তান, দার্জিলিং ও পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়সমূহ। যাতে অসংখ্য বনজ, ফলজ ও ঔষধি গাছ বান্দার উপকারের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। বলা চলে যে, বিশ্বের অধিকাংশ পাহাড়-পর্বত এই শ্রেণীভুক্ত। **তিন-** বরফাবৃত পাহাড়। যেমন হিমালয় পর্বতশৃঙ্গ, দামেষ্ক পাহাড়, আলপস পর্বতমালা এবং পৃথিবীর অন্যান্য বিশাল পর্বতশৃঙ্গ সমূহ। এই সব পর্বতশৃঙ্গের বরফ গলেই সৃষ্টি হয়েছে দেশে দেশে বড় বড় নদী। যেমন বাংলাদেশের গঙ্গা, পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র ইত্যাদি।

চার- আগ্নেয়গিরি। ফিলিপাইনসহ বিভিন্ন দেশে এরূপ পাহাড় রয়েছে। তবে উপমহাদেশে এরূপ পাহাড়ের সন্ধান মেলেনি। এসব পাহাড় দিয়ে ভূগর্ভস্থ গ্যাসীয় চাপ অনেক সময় লাভাস্রোত আকারে বেরিয়ে যাওয়াতে ভূপৃষ্ঠ সুস্থির থাকে।

পাহাড়সমূহ পৃথিবীকে দৃঢ় ও স্থিত রাখে, যাতে তা টলতে না পারে। যেমন আল্লাহ বলেন, 'পৃথিবীতে পাহাড় স্থাপন করেছি যাতে জীবকুল নিয়ে পৃথিবী হেলে না পড়ে' (আম্বিয়া ৩১)। এছাড়া মেঘমালাকে আটকে দিয়ে এইসব পাহাড় বৃষ্টি ঝরাতে সাহায্য করে। নিজের বুক থেকে ঝর্ণা ঝরিয়ে আল্লাহর হুকুমে পাহাড় আমাদেরকে পানি সরবরাহ করে ও বৃক্ষরাজি উৎপাদনের মাধ্যমে আমাদের রূযির ব্যবস্থা করে। এছাড়াও পাহাড়ের গর্ভে রয়েছে অসংখ্য মূল্যবান খনিজ সম্পদ এবং এর নীচে রয়েছে গ্যাসের অফুরন্ত ভান্ডার। সবই মানুষের ভোগ ও সেবার জন্য আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। যেমন তিনি বলেন, 'তোমরা কি দেখ না নভোমন্ডলে ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে, সবকিছুকে আল্লাহ তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নে'মতসমূহ পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন? অথচ মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা জ্ঞান, পথনির্দেশ ও উজ্জ্বল কিতাব ছাড়াই আল্লাহ সম্পর্কে বাক-বিতন্ডা করে' (লোকমান ২০)।

وَ اِلَى الۡاَرۡضِ كَيۡفَ سُطِحَتۡ

২০. এবং ভূতলের দিকে, কিভাবে তা বিস্তৃত করা হয়েছে?

বান্দার বসবাস ও সহজ বিচরণের জন্য পৃথিবীকে আল্লাহ বিস্তৃত করে দিয়েছেন। মাটিকে তিনি সর্বংসহা করেছেন এবং বান্দার রূযির জন্য শস্য উৎপাদনের উপযোগী করেছেন। পাহাড়ের মত ভূপৃষ্ঠ চার শ্রেণীতে বিভক্ত। **এক-** ঝোপ-জঙ্গলে পূর্ণ এলাকা। যেমন আফ্রিকার ঘন জঙ্গল বেষ্টিত অঞ্চলসমূহ। তাছাড়া প্রায় প্রত্যেক দেশেই কিছু না কিছু এলাকায় বনভূমি আছে। যার পরিমাণ কমপক্ষে ২৫ শতাংশ হওয়া উচিৎ। নইলে আবহাওয়া বিরূপ হয়ে যায়। **দুই-** সাগর-নদী বেষ্টিত এলাকা। যেমন বাংলাদেশ এবং পৃথিবীর অন্যান্য এলাকা। **তিন-** পাহাড়, মরুভূমি ও উপত্যকা বেষ্টিত এলাকা। যেমন আরব উপদ্বীপ ও আফ্রিকার সাহারা মরুভূমি এলাকা। **চার-** তৃণভূমি বেষ্টিত এলাকা। যেমন অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশসহ পৃথিবীর অন্যান্য এলাকা। এছাড়া আবহাওয়ার হিসাবে পৃথিবী ৬টি অঞ্চলে বিভক্ত। যেমন তুন্দ্রা অঞ্চল, উষ্ণ অঞ্চল, মৌসুমী অঞ্চল, নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল, তুষার অঞ্চল ও নিরক্ষীয় অঞ্চল।

এভাবে ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন অঞ্চলকে আল্লাহ এক একভাবে সাজিয়েছেন। যাতে প্রত্যেক এলাকার বাসিন্দা অন্য এলাকার বাসিন্দা থেকে উপকৃত হতে পারে। প্রত্যেকে প্রত্যেকের উপরে নির্ভরশীল থাকে। যাতে এর ফলে মানবজাতি আপোষে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে বসবাস করে এবং আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকতে পারে। আল্লাহ বলেন, 'তারা কি তোমার পালনকর্তার রহমত বণ্টন করে? আমরা তাদের মধ্যে পার্থিব জীবনে তাদের জীবিকা বণ্টন করে দিয়েছি এবং তাদের একের মর্যাদাকে অন্যের উপরে উন্নীত করেছি, যাতে তারা একে অপর থেকে কাজ নিতে পারে। বস্ত্ততঃ তারা যা সঞ্চয় করে তার চেয়ে তোমার পালনকর্তার রহমত অনেক উত্তম' (যুখরুফ ৩২)।

মোটকথা এখানে এমন সব জিনিসের কথা বলা হয়েছে যেগুলো কুরআনের প্রথম ও প্রধান সম্বোধন স্থল আরববাসীদের চোখের সামনে সব সময় থাকে। একজন বেদুঈন যখন তার উটের পিঠে সওয়ার হয়ে বেরিয়ে পড়ে তখন তার পায়ের তলায় থাকে জমীন, মাথার উপর থাকে আসমান, পাহাড় থাকে তার চোখের সামনে, সে

নিজের উটের পিঠে আরোহীরূপে থাকে। এ সব কিছুতে স্রষ্টার সীমাহীন কুদরত, শিল্প নৈপুণ্য সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়।

উপরে বর্ণিত চারটি আয়াতে আল্লাহ আরবদের উদ্দেশ্যে চিন্তা-গবেষণার আহবান জানালেও এর মাধ্যমে পৃথিবীব্যাপী মানব জাতিকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, দুনিয়া ও আখেরাতের উন্নতি ও অগ্রগতি সম্ভব নয় যতক্ষণ না তারা আল্লাহর অস্তিত্বকে হৃদয় দিয়ে অনুভব করবে এবং এসব মহান সৃষ্টির সৌন্দর্য ও গূঢ় রহস্য উপলব্ধি করবে। অতঃপর আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর বিধানসমূহ মেনে জীবন পরিচালনা করবে।
বিগত চারটি আয়াতে (১৭-২০) উটের বিস্ময়কর সৃষ্টি কৌশল, আকাশের সীমাহীন উচ্চতা, পাহাড়ের বিশালায়তন সুদৃঢ় স্থাপনা এবং ধরিত্রীর বিপুলা বিস্তৃতি ও তার সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে চিন্তাশীল মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের পর আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

فَذَكِّرْ ۗ إِنَّمَآ أَنْتَ مُذَكِّرٌ

২১. অতএব আপনি উপদেশ দিন; আপনি তো কেবল একজন উপদেশদাতা,

এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সান্ত্বনার জন্যে বলা হয়েছে, আপনার বর্ণিত ন্যায়সংগত যুক্তি মানতে যদি কোন ব্যক্তি প্রস্তুত না হয়, তাহলে মানা না মানা তার ইচ্ছা। আপনি তাদের শাসক নন যে, তাদেরকে মুমিন করতেই হবে। আপনার কাজ শুধু প্রচার করা ও উপদেশ দেয়া। লোকদেরকে ভুল ও সঠিক এবং সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য জানিয়ে দেয়া। তাদেরকে ভুল পথে চলার পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করা। কাজেই এ দায়িত্ব আপনি পালন করে যেতে থাকুন। এতটুকু করেই আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। তাদের হিসাব-নিকাশ, শাস্তি ও প্রতিদান আমার কাজ। [ইবনে কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ

২২. আপনি তাদের উপর শক্তি প্রয়োগকারী নন।

সুতরাং ঈমান আনার জন্য তাদেরকে বাধ্য করতে পার না। কোন কোন উলামাগণ বলেন যে, এটা হল হিজরতের পূর্বেকার নির্দেশ; যা জিহাদের আয়াত দ্বারা রহিত করা হয়েছে। কেননা, এর পর নবী (সাঃ) বলেছেন, "আমি আদেশপ্রাপ্ত হয়েছি যে, লোকেদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি; যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা 'আল্লাহ ছাড়া উপাস্য নেই' বলে সাক্ষ্য দেয়। অতএব যখন তারা তা বলবে, তখন তারা আমার হাত হতে ইসলামী হক ছাড়া তাদের জান-মালকে বাঁচিয়ে নেবে। আর (যে ব্যাপারে আমাদের অজানা সে ব্যাপারে) তাদের হিসাব আল্লাহর উপর। (সহীহ বুখারী যাকাত ওয়াজেব হওয়ার পরিচ্ছেদ, মুসলিম ঈমান অধ্যায়)

إِلَّا مَنْ تَوَلّٰى وَ كَفَرَ

২৩. তবে কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে ও কুফরী করলে

فَيُعَذِّبُهُ اللّٰهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ

২৪. আল্লাহ তাদেরকে দেবেন মহাশাস্তি।

অর্থ 'তুমি উপদেশ দেওয়ার পরেও যে ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে নেয় ও অস্বীকার করে, আল্লাহ তাকে সবচেয়ে বড় শাস্তি প্রদান করবেন'। অর্থাৎ চিরস্থায়ী জাহান্নাম। আর সেটাই হল সবচেয়ে বড় শাস্তি। এখানে الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ বলার

অর্থ এইসব হঠকারী কাফেররা দুনিয়াতে মূর্খতা, হঠকারিতা, ক্ষুধা, দুর্ভিক্ষ, কারা যন্ত্রণা, হত্যা ইত্যাদির মাধ্যমে যে কষ্ট পায়, তা খুবই নগণ্য। এর বিপরীতে জাহান্নামের শাস্তি হল বড় শাস্তি। তবে এর দ্বারা জাহান্নামে শাস্তির তারতম্য বুঝানো হতে পারে পাপের তারতম্য হিসাবে। কেননা জান্নাতের ন্যায় জাহান্নামেরও বহু স্তর থাকবে পাপীদের স্তর হিসাবে।

إِنَّ إِلَيْنَآ إِيَابَهُمْ

২৫. নিশ্চয় তাদের ফিরে আসা আমাদেরই কাছে;

'মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মাধ্যমে তারা আমাদের কাছে ফিরে আসবে'। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 'তোমরা সেদিনকে ভয় কর, যেদিন তোমরা সকলে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। অতঃপর প্রত্যেকে পূর্ণরূপে ফলাফল প্রাপ্ত হবে, যা তারা (দুনিয়াতে) অর্জন করেছিল। আর সেদিন তারা কেউ অত্যাচারিত হবে না' (বাক্বারাহ ২৮১)।

ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ

২৬. অতঃপর তাদের হিসাব গ্রহণের দায়িত্ব আমারই উপর

অর্থাৎ মৃত্যুর পরে তাদের জীবনব্যাপী কর্মের হিসাব আমরা নেব। অতঃপর সে অনুযায়ী তাদের প্রতিদান দেব। আল্লাহ অন্যত্র বলেন- 'যে ব্যক্তি এক সরিষাদানা পরিমাণ সৎকর্ম করবে, তা দেখা হবে'। 'এবং যে ব্যক্তি এক সরিষাদানা পরিমাণ অসৎকর্ম করবে, তাও দেখা হবে' (যিলযাল ৭-৮)।

ফুটনোট

◘ 'গাশিয়াহ' হল কিয়ামত দিবসের অন্যতম নাম'

◘ এ সূরায় "কিছু লোক" না বলে "কিছু চেহারা" বলা হয়েছে। কিয়ামতে মুমিন ও কাফের আলাদা আলাদা বিভক্ত দু'দল হবে এবং মুখমণ্ডল দ্বারা পৃথকভাবে পরিচিত হবে।

◘ কিয়ামতের দিন হতভাগ্যাদের/কাফিরদের তিনটি অবস্থা হবে- **মুখমন্ডল অবনত**, ক্লিষ্ট, ক্লান্ত।

◘ ضَرِيعٌহচ্ছে জাহান্নামের একটি গাছ। যা খেয়ে কেউ মোটা তাজা হবে না এবং এতে ক্ষুধা থেকেও মুক্তি পাওয়া যাবে না।

◘ তারা এমন খাবার ও পানীয় পান করবে যা তাদের উপকারের পরিবর্তে আরো ক্ষতি হবে।

◘ ৮-১৬ নং আয়াতে রয়েছে কিয়ামতের দিন সৌভাগ্যদের বর্ণনা ও তাদের প্রতিদান-

- কিয়ামতের দিন তাদের মুখমন্ডল থাকবে আনন্দোজ্জ্বল।
- নিজেদের কাজের সাফল্যে পরিতৃপ্ত
- তাদের অবস্থান হবে সুউচ্চ জান্নাতে—
- জান্নাতে মানুষ যে সমস্ত নিয়ামত লাভ করবে তার মধ্যে একটি বড় নিয়ামত হবে এই যে, সেখানে কোন আজেবাজে অর্থহীন ও কটু কথা শোনা যাবে না।
- যেখানে থাকবে প্রবহমান ঝরণাসমূহ'।
- সেখানে থাকবে উন্নত শয্যাসমূহ,
- আর প্রস্তুত থাকবে পানপত্র,
- ও সারি সারি বালিশসমূহ

◘ মু'মিন ও কাফিরের প্রতিদান এবং শাস্তি বর্ণনা করার পর আল্লাহ্ তাঁর কুদরতের চারটি নিদর্শন সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করার কথা বলেছেন- উট, আকাশ, ভূপৃষ্ঠ এবং পর্বতমালা।

◘ পৃথিবীতে চার ধরনের পাহাড় দেখা যায়- **এক**- পাথরের , **দুই**- ভূমিজ পাহাড়, **তিন**- বরফাবৃত পাহাড় এবং **চার**- আগ্নেয়গিরি।

◘ পাহাড়ের মত ভূপৃষ্ঠ চার শ্রেণীতে বিভক্ত। **এক**- ঝোপ-জঙ্গলে পূর্ণ এলাকা, **দুই**- সাগর-নদী বেষ্টিত, **তিন**- পাহাড়, মরুভূমি এবং **চার**- তৃণভূমি বেষ্টিত এলাকা।

◘ (১৭-২০) আয়াতে উটের বিস্ময়কর সৃষ্টি কৌশল, আকাশের সীমাহীন উচ্চতা, পাহাড়ের বিশালায়তন সুদৃঢ় স্থাপনা এবং ধরিত্রীর বিপুলা বিস্তৃতি ও তার সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে চিন্তাশীল মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের পর আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আপনি তো কেবল উপদেশদাতা। ঈমান আনার জন্য তাদেরকে বাধ্য করতে পার না। তুমি উপদেশ দেওয়ার পরেও যে ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে নেয় ও অস্বীকার করে, আল্লাহ তাকে সবচেয়ে বড় শাস্তি প্রদান করবেন'।

কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২৪
প্রস্তুতি সহায়ক তাফসীর নোট পর্বঃ ৩

সূরা আ'লা

সূরা আল আ'লা পবিত্র কুরআনের ৮৭ তম সূরা; এতে আয়াত সংখ্যা ১৯টি এবং রূকুর সংখ্যা ১টি। এই সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। আ'লা অর্থ সর্বোচ্চ।

নামকরণ

الْأَعْلَى মহান আল্লাহর একটি সিফাত বা গুণবাচক নাম, যার অর্থ সুউচ্চ। প্রথম আয়াতে উল্লিখিত গুণবাচক নাম থেকেই সূরার নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এর আলোচ্য বিষয় থেকে জানা যায়, এটি একেবারে প্রথম দিকে অবতীর্ণ সূরাগুলোর অন্যতম। ষষ্ঠ আয়াতে "আমি তোমাকে পড়িয়ে দেবো, তারপর তুমি আর ভূলবে না" এ বাক্যটিও একথা জানিয়ে দিচ্ছে যে, এটি এমন সময়ে অবতীর্ণ হয়েছিল, যখন রসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভালোভাবে অহী আয়ত্ত্ব করার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারেননি। এবং অহী নাযিলের সময় তার কোন শব্দ ভুলে যাবেন বলে তিনি আশংকা করতেন। এই আয়াতের সাথে যদি সূরা ত্ব-হা'র ১১৪ আয়াত ও সুরা কিয়ামাহ'র ১৬-১৯ আয়াতগুলোকে মিলিয়ে পড়া হয় এবং তিনটি সূরার সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলোর বর্ণনাভংগী ও পরিবেশ পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা হয়, তাহলে এখানে উল্লেখিত ঘটনাবলীকে নিম্নোক্তভাবে সাজানো যায়: সর্বপ্রথম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিশ্চয়তা দান করা হয়েছে যে, তুমি চিন্তা করো না, আমি এ বাণী তোমাকে পড়িয়ে দেবো এবং তুমি আর ভুলে যাবে না। তারপর বেশ কিছুকাল পরে যখন সূরা কিয়ামাহ নাযিল হতে থাকে তখন তিনি অবচেতনভাবে অহীর শব্দগুলো পুনরাবৃত্তি করতে থাকেন। তখন বলা হয় "হে নবী! এই অহী দ্রুত মুখস্থ করার জন্য নিজের জিহ্বা সঞ্চালন করো না। এগুলো মুখস্থ করানো ও পড়িয়ে দেবার দায়িত্ব আমার। কাজেই যখন আমরা এগুলো পড়ি তখন তুমি এর পড়া মনোযোগ সহকারে শুনতে থাকো, তারপর এর মানে বুঝিয়ে দেয়ার দায়িত্বও আমার।" শেষবার সূরা ত্ব-হা নাযিলের সময় মানবিক দুর্বলতার কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার এই পরপর নাযিল হওয়া ১১৩টি আয়াতের কোন অংশ স্মৃতি থেকে উধাও হয়ে যাবার আশংকা করেন, ফলে তিনি সেগুলো স্মরণ রাখার চেষ্টা করতে থাকেন। এর ফলে তাঁকে বলা হয়: "আর কুরআন পড়ার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করো না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার কাছে এর অহী সম্পূর্ণরূপে পৌঁছে না যায়।" এরপর আর কখনো এমনটি ঘটেনি। নবী (সাঃ) আর কখনো এ ধরনের আশংকা করেননি। কারণ এ তিনটি জায়গা ছাড়া কুরআনের আর কোথাও এ ব্যাপারে কোন ইঙ্গিত নেই।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এই ছোট্ট সূরাটিতে তিনটি বিষয়বস্তুর অবতারণা করা হয়েছে। এক, তাওহীদ। দুই, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উপদেশ দান। তিন, আখেরাত।

তাওহীদের শিক্ষাকে প্রথম আয়াতের একটি বাক্যের মধ্যেই সীমিত করে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে: আল্লাহর নামে তাসবীহ পাঠ করো। অর্থাৎ তাঁকে এমন কোন নামে স্মরণ করা যাবে না যার মধ্যে কোন প্রকার ত্রুটি, অভাব, দোষ, দুর্বলতা বা সৃষ্টির সাথে কোন দিক দিয়ে কোন প্রকার মিল রয়ে গেছে। কারণ দুনিয়ায় যতগুলো ভ্রান্ত আকীদার জন্ম হয়েছে তার সবগুলোর মূলে রয়েছে আল্লাহ সম্পর্কিত কোন না কোন ভুল ধারণা। আল্লাহর পবিত্র সত্তার জন্য কোন ভুল ও বিভ্রান্তিকর

নাম অবলম্বন করার মাধ্যমে এ ভুল ধারণাগুলো বিকশিত হয়েছে। কাজেই আকীদা সংশোধনের জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন হচ্ছে, মহান আল্লাহকে কেবলমাত্র তাঁর উপযোগী পূর্ণ গুণান্বিত ও সর্বাঙ্গ সুন্দর নামে স্মরণ করতে হবে।

এরপর তিনটি আয়াতে বলা হয়েছে, তোমাদের এমন এক রবের তাসবীহ পাঠ করার হুকুম দেয়া হয়েছে যিনি বিশ্ব-জাহানের প্রতিটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন। তার মধ্যে সমতা কায়েম করেছেন। তার ভাগ্য তথা তার ক্ষমতাগুলোর সীমারেখা নির্ধারণ করেছেন এবং যে কাজের জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে তা সম্পন্ন করার পথ তাকে বাতলে দিয়েছেন। তোমরা নিজের চোখে তাঁর ক্ষমতার বিস্ময়কর ও বিচিত্র প্রকাশ দেখে চলছো। তিনি মাটির বুকে উদ্ভিদ ও গাছপালা উৎপন্ন করেন আবার সেগুলোকে প্রাণহীন আবর্জনায় পরিণত করেন। তিনি ছাড়া আর কেউ বসন্তের সজীবতা আনার ক্ষমতা রাখেন না আবার পাতাঝরা শীতের আগমন রোধ করার ক্ষমতাও কারো নেই।

তারপর দু'টি আয়াতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উপদেশ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে: এই যে কুরআন তোমার প্রতি নাযিল হচ্ছে এর প্রতিটি শব্দ কিভাবে তোমার মুখস্ত থাকবে, এ ব্যাপারে তুমি কোন চিন্তা করো না। একে তোমার স্মৃতিপটে সংরক্ষিত করে দেয়া আমার কাজ। একে তোমার স্মৃতিপটে সংরক্ষিত রাখার পেছনে তোমার নিজস্ব কোন কৃতিত্ব নেই। বরং এটা আমার মেহেরবানীর ফল। নয়তো আমি চাইলে তোমার স্মৃতি থেকে একে মুছে ফেলতে পারি।

এরপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হয়েছে: প্রত্যেক ব্যক্তিকে সঠিক পথে পরিচালিত করার দায়িত্ব তোমাকে দেয়া হয়নি। বরং তোমার কাজ হচ্ছে শুধুমাত্র সত্যের প্রচার। আর এই প্রচারের সরল পদ্ধতি হচ্ছে, যে ব্যক্তি উপদেশ শুনতে ও তা মেনে নিতে প্রস্তুত থাকে তাকে উপদেশ দাও। আর যে ব্যক্তি তাতে প্রস্তুত নয় তার পেছনে লেগে থাকার প্রয়োজন নেই। যার মনে ভুল পথে চলার অশুভ পরিণামের ভয় থাকবে সে সত্য কথা শুনে তা মেনে নেবে এবং যে দুর্ভাগা তা শুনতে ও মেনে নিতে চাইবে না সে নিজের চোখেই নিজের অশুভ পরিণাম দেখে নেবে।

সবশেষে বক্তব্যের সমাপ্তি টেনে বলা হয়েছে: সাফল্য কেবল তাদের জন্য যারা আকীদা- বিশ্বাস, কর্ম ও চরিত্রে পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতা অবলম্বন করবে এবং নিজেদের রবের নাম স্মরণ করে নামায পড়বে। কিন্তু লোকেরা শুধুমাত্র এ দুনিয়ার আরাম-আয়েশ এবং এর স্বার্থ ও আশা আনন্দের চিন্তায় বিভোর হয়ে আছে। অথচ তাদের আসলে আখেরাতের চিন্তা করা উচিত। কারণ এ দুনিয়া তো ক্ষণস্থায়ী। অন্যদিকে আখেরাত চিরস্থায়ী। আর দুনিয়ার নিয়ামতের তুলনায় আখেরাতের নিয়ামত অনেক বেশী ও অনেক উন্নত পর্যায়ের। এ সত্যটি কেবল কুরআনেই কুরআনেই বর্ণনা করা হয়নি, হযরত ইব্রাহীম (আ) ও হযরত মূসার (আ) সহীফাসমূহেও মানুষকে এই একই সত্যের সন্ধান দেয়া হয়েছিল।

গুরুত্ব

হযরত নু'মান বিন বাশীর (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) দুই ঈদ ও জুম'আর সালাতে সূরা আ'লা ও গাশিয়াহ পাঠ করতেন। এমনকি জুম'আ ও ঈদ একদিনে হলেও তিনি উক্ত দু'টি সূরাই পড়তেন'। [মুসলিম-৮৭৮; মিশকাত-৮৪০]

বারা বিন আযেব (রাঃ) বলেন, রাসূল (সাঃ)-এর সাহাবীগণের মধ্যে মদীনায় প্রথম আসেন মুছ'আব বিন ওমায়ের ও আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম। তারা আমাদেরকে কুরআন পড়াতে থাকেন। অতঃপর আসেন 'আম্মার, বেলাল ও সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাছ। তারপর বিশ জনের একটি দল নিয়ে আসেন ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব। অতঃপর আসেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজে। আমি মদীনাবাসীকে কখনো এত খুশী হতে দেখিনি যত খুশী তাঁর আগমনে হতে দেখেছি। এমনকি ছোট্ট শিশু-কিশোররা বলতে থাকে, هَذَا رَسُوْلُ اللهِ قَدْ جَاءَ 'এই যে আল্লাহর রাসূল এসে গেছেন'। তিনি আসা পর্যন্ত আমি পাঠ করতাম সূরা আ'লা এবং অনুরূপ সূরা সমূহ'। [বুখারী -৪৯৪১ 'তাফসীর' অধ্যায়।]

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সাব্বি হিসমা রব্বিকাল আ'লা পাঠ করার পর বলতেন, সুবহা-না রবিবয়াল আ'লা (মহাপবিত্র আমার প্রতিপালক, যিনি সর্বোচ্চ)। [আহমাদ -২০৬৬; আবুদাঊদ-৮৮৩]

আগের ও পরের সূরার সাথে সম্পর্ক

আগের সূরা আত ত্বারিকে আল্লাহর নাম ও পরিচিতি সরাসরি বলা হয়নি কিন্তু এই সূরায় শুরুতেই আল্লাহর নামের প্রশংসা করতে বলা হয়েছে। সূরা আত ত্বরিক এর শুরুতে বড় সৃষ্টি যেমন আকাশ, তারা এর কথা এসেছে (আয়াত ১,৩)। আর এই সূরার শুরুতে সবচেয়ে সর্বোচ্চ স্রষ্টা আল্লাহর কথা এসেছে (আয়াত ১)। এছাড়া আগের সূরায় আল্লাহকে ছোট, দূর্বল মনে করে ষড়যন্ত্র করতে থাকে (আয়াত ১৩, ১৪, ১৫)। কিন্তু তিনি আসলে তাদের ধরাছোয়ার বাইরে, অনেক আ'লা (বড়) তা এই সূরার ১ম আয়াতেই বলা হয়েছে।

এর শেষে আল্লাহ তাঁর প্রিয় রাসূল (সাঃ) কে কাফেরদের পরিকল্পনা ও কর্মকান্ড জেনেও তাদের অবকাশ দেওয়ার জন্য আদেশ করেন। এবং তাদের দিকে মনোযোগ না দিয়ে এই সূরায় তিনি বরং আল্লাহর প্রশংসা করার জন্য আদেশ দেন।

সূরা আ'লার অন্যতম বিষয় হলো পরিশুদ্ধি। ৯ম ও ১০ আয়াতে উপদেশ দান করার কথা মনে করিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে পরিশুদ্ধিতে সহায়তার কথা বলা হয়েছে। মানুষ শুধু আরেকজনকে উপদেশ দিতে পারে। অন্যকে পরিশুদ্ধ করতে পারে না। যার নিজের মধ্যে আল্লাহর ভয় আছে সেই নিজেকে পরিশুদ্ধ করে নিতে পারে। এই বিষয়টির আরো বিস্তারিত ব্যাখ্যা এসেছে পরের সূরা আল গাশিয়াহ-তে।

তাফসীর

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى

১. আপনি আপনার সুমহান রবের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন,

এর শাব্দিক অনুবাদ হবে, "তোমার সুমহান রবের নামকে পবিত্র ও মহিমাময় করো।" এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে এবং সবকটিই এখানে প্রযোজ্য।

এক, আল্লাহকে এমন নামে স্মরণ করতে হবে যা তাঁর উপযোগী। তাঁর মহান সত্তার সাথে এমন নাম সংযুক্ত না করা উচিত যা অর্থের দিক দিয়ে তাঁর অনুপযোগী এবং তাঁর জন্য প্রযোজ্য নয়। অথবা যে নামে তাঁর জন্য কোন ত্রুটি, অমর্যাদা বা শিরকের চিহ্ন পাওয়া যায়। অথবা যাতে তাঁর সত্তা, গুণাবলী বা কার্যবালী সম্পর্কে কোন ভুল বিশ্বাস পাওয়া যায়। এজন্য কুরআন মজীদে আল্লাহ নিজেই নিজের জন্য যেসব নাম ব্যবহার করেছেন অথবা অন্য ভাষায় এই নামগুলোর সঠিক অনুবাদ যে শব্দগুলোর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে সেগুলো ব্যবহার করাই হবে সবচেয়ে বেশী সংরক্ষিত পদ্ধতি।

দুই, সৃষ্টির জন্য যেসব নাম নির্ধারিত রয়েছে সেগুলো আল্লাহর জন্য ব্যবহার করা অথবা আল্লাহর জন্য ব্যবহৃত নামগুলো সৃষ্টির জন্য ব্যবহার করা যাবে না। আর যদি এমন কিছু গুণবাচক নাম থাকে যেগুলো শুধু আল্লাহর জন্য বিশেষভাবে ব্যবহৃত না হয়ে থাকে বরং বান্দার জন্যও সেগুলোর ব্যবহার বৈধ হয় যেমন রউফ (পরম স্নেহশীল) রহীম (পরম করুণাময়) করীম (মেহেরবান), সামী (সবকিছু শ্রবণকারী), বসীর (সর্বদ্রষ্টা) ইত্যাদি, তাহলে এক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। অর্থাৎ আল্লাহর জন্য এ শব্দগুলো যেভাবে ব্যবহার করা হয় বান্দার জন্য ঠিক সেভাবে ব্যবহার করা যাবে না।

তিন, পরম শ্রদ্ধা, ভক্তি ও মর্যাদাসহকারে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে হবে। এমন কোন পদ্ধতিতে বা এমন কোন অবস্থায় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা যাবে না, যা তাঁর প্রতি মর্যাদাবোধের পরিপন্থী। যেমন হাসি-ঠাট্টা করতে করতে, মলমূত্র ত্যাগকালে অথবা কোন গোনাহ করার সময় তাঁর নাম উচ্চারণ করা। অথবা এমন লোকদের সামনে তাঁর নাম উচ্চারণ করা যারা তা শুনে বেআদবী করতে থাকবে। এমন মজলিসেও তাঁর নাম বলা যাবে না। যেখানে লোকেরা অশালীন কাজে লিপ্ত থাকে এবং তাঁর নাম উচ্চারিত হবার সাথে সাথেই তারা বিদ্রূপ করতে থাকবে। আবার এমন অবস্থায়ও তাঁর পবিত্র নাম মুখে আনা যাবে না যখন আশঙ্কা করা হবে যে, শ্রোতা তাঁর নাম শুনে বিরক্তি প্রকাশ করবে।

ইমাম মালেকের (র) জীবনেতিহাসে একথা উল্লেখিত হয়েছে যে, কোন প্রার্থী তাঁর কাছে কিছু চাইলে তিনি যদি তাকে তা দিতে না পারতেন তাহলে সাধারণ লোকদের মতো "আল্লাহ তোমাকে দেবেন" একথা না বলে অন্য কোনভাবে নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করতেন। লোকেরা এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, প্রার্থীকে কিছু না দিয়ে অক্ষমতা প্রকাশ করলে আসলে তার মনে বিরক্তি ও ক্ষোভের সঞ্চার হয়। এ অবস্থায় আল্লাহর নাম নেয়া আমি সঙ্গত মনে করি না। কারণ সে বিরক্তি ও ক্ষোভের সাথে আল্লাহর নাম শুনবে। [তাফহীমুল কুরআন]

الَّذِيْ خَلَقَ فَسَوّٰى

২. যিনি সৃষ্টি করেন অতঃপর সুঠাম করেন।

এখানে মূলত: আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার কারণ ও হেতুসমূহ বর্ণনা করা হচ্ছে। এ আয়াত এবং এর পরবর্তী কয়েকটি আয়াতে জগৎ সৃষ্টিতে আল্লাহর অপার রহস্য ও শক্তি সম্পর্কিত কতিপয় কর্মগত গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে।

خَلَقَ -এর অর্থ কেবল সৃষ্টি করাই নয় বরং কোন পূর্ব নমুনা ব্যতিরেকে কোন কিছুকে নাস্তি থেকে আস্তিতে আনয়ন করা। কোন সৃষ্টির এ কাজ করার সাধ্য নেই; একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার অপার কুদরতই কোন পূর্ব-নমুনা ব্যতিরেকে যখন ইচ্ছা, যাকে ইচ্ছা নাস্তি থেকে আস্তিতে আনয়ন করে।

فَسَوّٰى অর্থ সামঞ্জস্যপূর্ণ, মজবুত ও সুন্দর করেছেন। অর্থাৎ তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। আর যে জিনিসটিই সৃষ্টি করেছেন তাকে সঠিক ও সুঠাম দেহসৌষ্ঠব দান করেছেন। তার মধ্যে ভারসাম্য ও শক্তির অনুপাত সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাকে এমন আকৃতি দান করেছেন যে, তার জন্য এর চেয়ে ভালো আকৃতির কল্পনাই করা যেতে পারে না। একথাটিকে অন্যত্র বলা হয়েছে, "তিনি প্রত্যেকটি জিনিসকে চমৎকার তৈরি করেছেন।" [সুরা আস-সাজদাহ: ৭]

وَ الَّذِيْ قَدَّرَ فَهَدٰى

৩. আর যিনি নির্ধারণ করেন অতঃপর পথনির্দেশ করেন,

প্রতিটি জিনিস সৃষ্টি করার আগে দুনিয়ায় তাকে কি কাজ করতে হবে, এই কাজ করার জন্য তাকে কতটুকু সময় দেয়া হবে, তার আকার-আকৃতি কেমন হবে, তার মধ্যে কি কি গুণাবলী থাকবে, তার স্থান কোথায় হবে, তার জন্য প্রতিষ্ঠা ও স্থায়িত্ব এবং কাজের জন্য কি কি সুযোগ-সুবিধা ও উপায়-উপকরণ সরবরাহ করা হবে, কখন সে অস্তিত্ব লাভ করবে, নিজের অংশের কাজটুকু সে কতদিনে সম্পন্ন করবে এবং কবে কিভাবে খতম

হয়ে যাবে, এসব কিছুই ঠিক করে দিয়েছেন। এই সমগ্র পরিকল্পনাটির সামগ্রিক নাম হচ্ছে “তাকদীর।” বিশ্ব-জাহানের প্রতিটি জিনিসের জন্য এবং সামগ্রিকভাবে সমগ্র বিশ্ব-জাহানের জন্য মহান আল্লাহ এই তাকদীর গড়েছেন। এর অর্থ হচ্ছে, কোন রকম পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়াই এমনি হঠাৎ উদ্দেশ্যহীনভাবে এই সৃষ্টিকর্ম সম্পন্ন হয়নি। বরং স্রষ্টার সামনে এজন্য একটি পূর্ণ পরিকল্পনা ছিল। সবকিছুই সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী সম্পন্ন হচ্ছে।

অন্য আয়াতে আছেঃ প্রত্যেক বস্তুর জন্য তাকদীর নির্ধারণ করেছেন, তারপর পথনির্দেশ করেছেন।” [সূরা ত্বাহা: ৫০]

وَ الَّذِیۡۤ اَخۡرَجَ الۡمَرۡعٰی

৪. আর যিনি তৃণাদি উৎপন্ন করেন,

মূলে মারআ (مَرْعَى) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। তৃণভুক প্রাণীদের খাদ্যের জন্য এ শব্দটি ব্যবহার হয়ে থাকে। এই আয়াতের পরবর্তী আলাচনা থেকে বুঝা যায়, এখানে কেবল উদ্ভিদজাত খাদ্যের কথা বলা হয়নি বরং মাটিতে উৎপন্ন সব ধরনের উদ্ভিদের কথাই বলা হয়েছে। [তাফহীমুল কুরআন]

فَجَعَلَهٗ غُثَآءً اَحۡوٰی

৫. পরে তা ধূসর আবর্জনায় পরিণত করেন।

غُثَاءً শব্দের অর্থ খড়-কুটা, আবর্জনা; যা বন্যার পানির উপর ভাসমান থাকে। أَحْوَىٰশব্দের অর্থ কৃষ্ণাভ গাঢ় সবুজ রং।

৪-৫ নং আয়াতে আল্লাহ তৃণাদি বলে সকল প্রকারের উদ্ভিদ ও শস্যাদি বুঝিয়েছেন। অতঃপর সেই সবুজ উদ্ভিদ ক্রমে হলুদ অতঃপর এক সময় শুকিয়ে কৃষ্ণাভ হয়ে আবর্জনার রূপ ধারণ করে। এর মাধ্যমে মানুষকে তার ভবিষ্যৎ করুণ পরিণতির ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে যে, তার যৌবনের সৌন্দর্য ও সজীবতা, স্ফূর্তি ও চটুলতা আল্লাহর এক বিশেষ দান। এগুলি সব এক সময় নিঃশেষ হয়ে যাবে। মূল্যহীন আবর্জনা যেমন ঘরের বাইরে ফেলে দেওয়া হয়, তাকেও তার মৃত্যুর পরে তার সন্তান ও নিকটত্মীয়েরা অতি সাধের ঘর হ’তে কবরে ফেলে আসবে। যে মহান সত্তার অমোঘ নির্দেশে মানুষের জীবনে এই উত্থান-পতন ঘটে, হে মানুষ সেই সর্বশক্তিমান আল্লাহর বড়ত্ব ও পবিত্রতা ঘোষণা কর- সুবহানা রাব্বিয়াল আ‘লা।

سَنُقۡرِئُکَ فَلَا تَنۡسٰۤی

৬. শীঘ্রই আমরা আপনাকে পাঠ করাব, ফলে আপনি ভুলবেন না,

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌ তা’আলা স্বীয় কুদরত ও হিকমতের কতিপয় বহিঃপ্রকাশ বর্ণনা করার পর এস্থলে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) কে নবুয়তের কর্তব্য সম্পর্কে কয়েকটি জরুরী নির্দেশ দিয়েছেন। নির্দেশ দানের পূর্বে তাঁর কাজ সহজ করে দেওয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন। প্রথমদিকে যখন জিবরাঈল (আঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে কোরআনের কোন আয়াত শোনাতেন, তখন তিনি আয়াতের শব্দাবলী বিস্মৃত হয়ে যাওয়ার আশংকায় জিবরাঈল (আঃ)-এর সাথে সাথে তা পাঠ করতেন। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা’আলা কোরআন মুখস্থ করানোর দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেছেন এবং ব্যক্ত করেছেন যে, জিবরাঈল (আঃ)-এর চলে যাওয়ার পর কোরআনের আয়াতসমূহ বিশুদ্ধরূপে

পাঠ করানো এবং স্মৃতিতে সংরক্ষিত করা আমার দায়িত্ব। কাজেই আপনি চিন্তিত হবেন না। [মাআরিফুল কুরআন]

সূরা 'ত্বা-হা'র ১১৪ আয়াতে এবং সূরা 'কিয়ামাহ'র ১৬-১৯ আয়াতে এর আলোচনা এসেছে। এই আয়াত থেকে একথা প্রমাণিত হয়, কুরআন যেমন মু'জিযা হিসেবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর নাযিল করা হয়েছিল ঠিক তেমনি মুজিযা হিসেবেই তার প্রতিটি শব্দ তাঁর স্মৃতিতে সংরক্ষিত করে দেয়া হয়েছিল। এর কোন একটি শব্দ তিনি ভুলে যাবেন অথবা একটি শব্দের জায়গায় তাঁর সমার্থক অন্য একটি শব্দ তাঁর মুবারক কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হবে, এ ধরনের সকল সম্ভাবনার পথই বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। [তাফহীমুল কুরআন]

إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَ مَا يَخْفَىٰ

৭. আল্লাহ যা ইচ্ছে করেন তা ছাড়া। নিশ্চয় তিনি জানেন যা প্রকাশ্য ও যা গোপনীয়।

এই বাক্যটির কয়েকটি অর্থ হতে পারে। এক. কুরআনের কিছু আয়াত রহিত করার এক সুবিদিত পদ্ধতি হচ্ছে প্রথম আদেশের বিপরীতে পরিষ্কার দ্বিতীয় আদেশ নাযিল করা। এর আরেকটি পদ্ধতি হলো সংশ্লিষ্ট আয়াতটিই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সকল মুসলিমের স্মৃতি থেকে মুছে দেয়া। এ সম্পর্কে এক আয়াতে আছে, (مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا) অর্থাৎ "আমরা কোন আয়াত রহিত করি অথবা আপনার স্মৃতি থেকে উধাও করে দেই।" [সূরা আল-বাকারাহ: ১০৬] তাই "আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ছাড়া" বলে রহিত আয়াতগুলোর কথা বলা হয়েছে। দুই, অথবা আয়াতের উদ্দেশ্য, কখনো সাময়িকভাবে আপনার ভুলে যাওয়া এবং কোন আয়াত বা শব্দ আপনার কোন সময় ভুলে যাওয়া এই ওয়াদার ব্যতিক্রম। যে ব্যাপারে ওয়াদা করা হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, আপনি স্থায়ীভাবে কুরআনের কোন শব্দ ভুলে যাবেন না।

হাদীসে আছে, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন একটি সূরা তেলাওয়াত করলেন এবং মাঝখান থেকে একটি আয়াত বাদ পড়ল। ওহী লেখক উবাই ইবনে কা'ব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু মনে করলেন যে, আয়াতটি বোধ হয় মনসুখ হয়ে গেছে। কিন্তু জিজ্ঞাসার জওয়াবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ মনসুখ হয়নি, আমিই ভুলক্রমে পাঠ করিনি। [মুসনাদে আহমাদ: ৩/৪০৭] অন্য হাদীসে এসেছে, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক সাহাবীকে কোন আয়াত পড়তে শোনে বললেন, আল্লাহ তাকে রহমত করুন, আমাকে এ আয়াতটি ভুলিয়ে দেয়া হয়েছিল এখন মনে পড়েছে। [মুসলিম: ৭৮৮] অতএব, উল্লিখিত ব্যতিক্রমের সারমর্ম এই যে, সাময়িকভাবে কোন আয়াত ভুলে যাওয়া অতঃপর তা স্মরণে আসা বর্ণিত প্রতিশ্রুতির পরিপন্থী নয়। [কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর]

وَ نُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ

৮. আর আমরা আপনার জন্য সুগম করে দেব সহজ পথ।

এ কথাটিও ব্যাপক। যেমন, আমি তোমার জন্য অহীকে সহজ করে দেব, যাতে তা মুখস্থ করা এবং তার উপর আমল করা সহজ হয়ে যায়। তোমাকে সেই পথ প্রদর্শন করব, যা হবে সরল। যে আমল জান্নাতে নিয়ে যাবে, আমি তোমার জন্য সেই আমল সহজ করে দেব। আমি তোমার জন্য ঐ সমস্ত কর্ম ও কথাকে সহজ করে দেব, যাতে মঙ্গল নিহিত আছে এবং আমি তোমার জন্য এমন শরীয়ত নির্ধারণ করব, যা সহজ, সরল এবং মধ্যপন্থী হবে; যার মধ্যে কোন প্রকার বক্রতা, কঠিনতা ও সংকীর্ণতা নেই। [আহসানুল বায়ান]

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই এ দ্বীন সহজ। যে ব্যক্তি এতে কঠোরতা করবে, এটি তাকে পরাভূত করবে। অতএব তোমরা দৃঢ়ভাবে সৎকর্ম কর, মধ্যপন্থা অবলম্বন কর ও মানুষকে সুসংবাদ প্রদান কর'। [বুখারী ৩৯] তিনি বলেন, 'তোমরা মানুষকে সুসংবাদ শুনাও, তাড়িয়ে দিয়ো না। সহজ কর, কঠিন করো না'। [বুখারী ৬৯]

فَذَكِّرۡ اِنۡ نَّفَعَتِ الذِّكۡرٰی

৯. অতঃপর উপদেশ যদি ফলপ্রসূ হয় তবে উপদেশ দিন;

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে নবুয়তের কর্তব্য পালনে আল্লাহর প্রদত্ত সুবিধাদির বর্ণনা ছিল। এ আয়াতে রসুলুল্লাহ (সা)-কে এই কর্তব্য পালনের আদেশ দেওয়া হয়েছে। অর্থ এই যে, উপদেশ ফলপ্রসূ হলে আপনি মানুষকে উপদেশ দিন। এখানে উদ্দেশ্য শর্ত নয় বরং আদেশকে জোরদার করাই উদ্দেশ্য। আমাদের পরিভাষায় এর দৃষ্টান্ত কাউকে এরূপ বলা যে, যদি তুমি মানুষ হও তবে তোমাকে কাজ করতে হবে। অথবা তুমি যদি অমুকের ছেলে হও তবে একাজ করা উচিত। বলা বাহুল্য, এখানে উদ্দেশ্য শর্ত নয় বরং কাজটি যে অপরিহার্য, তা প্রকাশ করাই লক্ষ্য। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, উপদেশ ও প্রচার যে ফলপ্রসূ, একথা নিশ্চিত, তাই এই উপকারী উপদেশ আপনি কোন সময় পরিত্যাগ করবেন না। [মাআরিফুল কুরআন]

এই আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ ওয়ায-নসীহত এবং শিক্ষাদানের একটি নীতি ও আদর্শ বর্ণনা করেছেন। যেমন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'তুমি যদি এমন কওমের কাছে কোন কথা বল যা তাদের বিবেকে ঢুকবে না, তাহলে সেটা তাদের কারও কারও জন্য বিপদের কারণ হবে। তারপর তিনি বললেন, মানুষ যা চিনে তা-ই শুধু তাদেরকে জানাও, তুমি কি চাও যে লোকেরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর মিথ্যারোপ করুক? [ইবনে কাসীর]

سَيَذَّكَّرُ مَنۡ يَّخۡشٰی

১০. যে ভয় করে সেই উপদেশ গ্রহণ করবে।

অর্থাৎ প্রমাণ নাযিল হওয়ার পরে এবং দলীল প্রকাশিত হওয়ার পরে যারা তা অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করার পরিণামে আল্লাহর শাস্তির ভয় করে, তারা সত্বর উপদেশ গ্রহণ করবে। এতে বুঝা যায় যে, আল্লাহভীরুতার গুণটি মানুষের ফিৎরাত বা স্বভাবজাত বিষয়। প্রতিটি মানুষের অবচেতন মনে আল্লাহকে স্বীকার করার ও তাঁর আদেশ পালন করার যোগ্যতা রয়েছে। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে, 'আল্লাহ প্রদত্ত ফিৎরাত (বা যোগ্যতা) সেটাই, যার উপরে তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। যার কোন পরিবর্তন নেই' (রূম ৩০)। হাদীসে এসেছে- 'প্রত্যেক মানবশিশু ফিৎরাতের উপরে জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদী, নাছারা বা মজূসী বানায়'। [বুখারী-১৩৮৫] অতঃপর প্রিয় বান্দাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ বলেন, 'যারা তাদের প্রতিপালকের আয়াতসমূহের মাধ্যমে উপদেশ দিলে অন্ধ ও বধির সদৃশ আচরণ করে না' (ফুরক্বান ৭৩)। কিন্তু হতভাগ্য যারা তারা শয়তানের কুহকে পড়ে নিজের স্বভাবধর্মের বিরুদ্ধে গিয়ে আল্লাহকে অস্বীকার করে ও তাঁর অবাধ্যতা করে। যেমন পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ বলেন-

وَ يَتَجَنَّبُهَا الۡاَشۡقَی

১১. আর তা উপেক্ষা করবে যে নিতান্ত হতভাগ্য,

যারা হতভাগ্য তারা এ কুরআন থেকে কোন শিক্ষা বা উপদেশ গ্রহণ করতে পারবে না। তারা হবে জাহান্নামের অধিবাসী। যেখানে কোনরূপ আরাম-আয়েশ ও শান্তি-সুখ নেই, বরং আছে চিরস্থায়ী আযাব ও নানা প্রকার যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন: "অতঃপর যারা হতভাগা তারা থাকবে অগ্নিতে এবং সেথায় তাদের জন্য থাকবে চীৎকার ও আর্তনাদ, সেথায় তারা স্থায়ী হবে যতদিন আকাশসমূহ ও পৃথিবী বিদ্যমান থাকবে যদি না তোমার প্রতিপালক অন্যরূপ ইচ্ছা করেন; নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক তাই করেন যা তিনি ইচ্ছা করেন। পক্ষান্তরে যারা ভাগ্যবান তারা থাকবে জান্নাতে সেথায় তারা স্থায়ী হবে, যত দিন আকাশসমূহ ও পৃথিবী বিদ্যমান থাকবে, যদি না তোমার প্রতিপালক অন্যরূপ ইচ্ছা করেন; এটা এক নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।" (সূরা হূদ ১১: ১০৬-১০৮)।

الَّذِیۡ یَصۡلَی النَّارَ الۡکُبۡرٰی

১২. যে ভয়াবহ আগুনে দগ্ধ হবে,

ثُمَّ لَا یَمُوۡتُ فِیۡهَا وَ لَا یَحۡیٰی

১৩. তারপর সেখানে সে মরবেও না বাঁচবেও না।

অর্থাৎ তার মৃত্যু হবে না। যার ফলে আযাব থেকে রেহাই পাবে না। আবার বাঁচার মতো বাঁচাবেও না। যার ফলে জীবনের কোন স্বাদ-আহলাদও পাবে না। [ইবন কাসীর] হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আর যারা জাহান্নামী; তারা সেখানে মরবেও না, বাঁচবেও না। তবে এমন কিছু লোক হবে যারা গোনাহ করেছিল (কিন্তু মুমিন ছিল) তারা সেখানে মরে যাবে। তারপর যখন তারা কয়লায় পরিণত হবে তখন তাদের জন্য সুপারিশের অনুমতি দেয়া হবে; ফলে তাদেরকে টুকরা টুকরা অবস্থায় নিয়ে এসে জান্নাতের নালাসমূহে প্রসারিত করে রাখা হবে। তারপর বলা হবে, হে জান্নাতীরা তোমরা এদেরকে সিক্ত কর। এতে তারা বন্যায় ভেসে আসা বীজের ন্যায় আবার উৎপন্ন হবে।" [মুসলিম: ১৮৫]

এ হাদীস থেকে বোঝা গেল যে, আলোচ্য আয়াতে শুধু কাফের মুশরিকদের ক্ষেত্রেই বলা হয়েছে যে, তারা বাঁচবেও না আবার মরবেও না। অর্থাৎ তারা আরামের বাঁচা বাঁচবে না আবার মৃত্যুও হবে না যে, তারা আযাব থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে।

আল্লাহ বলেন, 'সেদিন জাহান্নামীরা তাদের দাররক্ষী (خازن) 'মালেক' ফেরেশতাকে চিৎকার দিয়ে ডেকে বলবে, 'হে মালেক! (এর চাইতে বরং) তোমার প্রতিপালক আমাদের মেরে ফেলে দিন। জবাবে সে বলবে, তোমরা তো এখানেই অবস্থান করবে'। '(আল্লাহ বলবেন,) আমরা তো তোমাদের নিকট সত্য পৌঁছে দিয়েছিলাম। কিন্তু তোমাদের অধিকাংশ ছিলে সত্যকে অপসন্দকারী' (যুখরুফ ৭৭-৭৮)। তাদের শাস্তি বিষয়ে আল্লাহ বলেন, 'যখন তাদের চামড়াগুলো দগ্ধ হয়ে যাবে, তখন আমরা তা পাল্টে দেব অন্য চামড়া দিয়ে, যাতে তারা শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করতে পারে' (নিসা ৫৬)। তিনি বলেন, 'তাদেরকে মৃত্যুর আদেশ দেওয়া হবে না যে তারা মরে যাবে এবং তাদের থেকে শাস্তিও লাঘব করা হবে না। এভাবেই আমরা প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে শাস্তি দিয়ে থাকি' (ফাত্বির ৩৬)।

পক্ষান্তরে ঈমানদারদের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। তারা জাহান্নামে গেলে সেখানে তাদের গোনাহ পরিমাণ শাস্তি ভোগ করার পর মৃত্যু প্রাপ্ত হবে, ফলে তারা অতিরিক্ত শাস্তি ভোগ থেকে মুক্তি পাবে। এরপর সুপারিশের মাধ্যমে সেখান থেকে বেরিয়ে আসবে।

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى

১৪. অবশ্যই সাফল্য লাভ করবে যে পরিশুদ্ধ হয়।

এখানে পরিশুদ্ধ বা পবিত্রতার অর্থ কুফর ও শির্ক ত্যাগ করে ঈমান আনা, অসৎ আচার-আচরণ ত্যাগ করে সদাচার অবলম্বন করা এবং অসৎকাজ ত্যাগ করে সৎকাজ করা। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যা নাযিল হয়েছে তার অনুসরণ করা। আয়াতের আরেক অর্থ, ধনসম্পদের যাকাত প্রদান করা। তবে যাকাতকেও এ কারণে যাকাত বলা হয় যে, তা ধন-সম্পদকে পরিশুদ্ধ করে। এখানে تَزَكّٰى শব্দের অর্থ ব্যাপক হতে পারে। ফলে ঈমানগত ও চরিত্রগত পরিশুদ্ধি এবং আর্থিক যাকাত প্রদান সবই এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে। [ফাতহুল কাদীর]

অর্থ্যাৎ প্রথমে হৃদয়জগতকে আল্লাহর সঙ্গে অন্য কাউকে শরীক করা হতে পরিশুদ্ধ করা ও নিজের আমলকে বিদ‘আত হতে পবিত্র করা। সঙ্গে সঙ্গে হিংসা-বিদ্বেষ, রিয়া ও অহংকারের মত ধ্বংসকারী রোগসমূহ হতে হৃদয়কে পরিচ্ছন্ন করা এবং পাপ থেকে নিজেকে বিরত রাখা ও সর্বদা আল্লাহর হুকুম মান্য করা। আর্থিক শুদ্ধিতা অর্জনের জন্য আয়-উপার্জনকে হালাল করা ও যাবতীয় হারাম থেকে বেঁচে থাকা এবং যাকাত, ওশর, ছাদাক্বাতুল ফিৎর ও অন্যান্য নফল ছাদাক্বাসমূহ আদায়ের মাধ্যমে নিজেকে কৃপণতার কালিমা হতে পরিশুদ্ধ করা বুঝায়। অর্থাৎ বিশ্বাসে ও কর্মে, কথায় ও আচরণে শুদ্ধাচারী হওয়া।

وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى

১৫. এবং তার রবের নাম স্মরণ করে ও সালাত কায়েম করে।

কেউ কেউ অর্থ করেছেন, তারা তাদের রবের নাম স্মরণ করে এবং সালাত আদায় করে। বাহ্যতঃ এতে ফরয ও নফল সবরকম সালাত অন্তর্ভুক্ত। কেউ কেউ ঈদের সালাত দ্বারা এর তাফসীর করে বলেছেন যে, যে যাকাতুল ফিতর এবং ঈদের সালাত আদায় করে। কোন কোন মুফাসসির বলেন, ‘‘নাম স্মরণ করা’ বলতে আল্লাহকে মনে মনে স্মরণ করা এবং মুখে তা উচ্চারণ করাও উদ্দেশ্য হতে পারে। অর্থাৎ আল্লাহকে মনে মনে বা মুখে উচ্চারণ করে স্মরণ করেছে, তারপর সালাত আদায় করেছে। সে শুধু আল্লাহর স্মরণ করেই ক্ষান্ত থাকেনি বরং নিয়মিত সালাত আদায়ে ব্যাপৃত ছিল। মূলত: এ সবই আয়াতের অর্থ হতে কোন বাধা নেই। [ফাতহুল কাদীর]

মোদ্দাকথা আয়াত দু’টির প্রকাশ্য অর্থ এই যে, সেই ব্যক্তি সফলকাম হবে, যে ব্যক্তি পরিশুদ্ধি অর্জন করবে। যা শিরক ও নিফাক হতে আত্মার পরিশুদ্ধি এবং ফরয যাকাত ও নফল সাদাক্বাসমূহ আদায়ের মাধ্যমে মালের পরিশুদ্ধি সবকিছুকে শামিল করে। অতঃপর বিশুদ্ধ অন্তরে আল্লাহর নাম স্মরণ করবে এবং সালাত আদায় করবে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِيْ ‘তুমি সালাত কায়েম কর আমাকে স্মরণ করার জন্য’ (ত্বোয়াহা -১৪)। এই সালাত ফরয, সুন্নাত, নফল সকল প্রকার সালাতকে শামিল করে। যা স্রেফ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হবে। কোনরূপ রিয়া বা শ্রুতির উদ্দেশ্যে নয়।

بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا

১৬. কিন্তু তোমরা দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দাও,

অর্থাৎ তোমরা আখেরাতের উপর পার্থিব জীবনকেই প্রাধান্য দিচ্ছ, অথচ প্রকৃতপক্ষে আখেরাতের জীবনকে দুনিয়ার জীবনের উপর প্রাধান্য দেয়ার মধ্যেই তোমাদের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। দুনিয়া তো হলো ক্ষণস্থায়ী, ভঙ্গুর অমর্যাদাকর। পক্ষান্তরে, আখেরাতের জীবন হলো চিরস্থায়ী ও মর্যাদাকর। কোন বুদ্ধিমান লোক অস্থায়ীকে স্থায়ীর উপর এবং মর্যাদাহীনকে মর্যাদাসম্পন্নের উপর প্রাধান্য দিতে পারে না। দুনিয়ার জীবনের জন্যে আখেরাতের জীবনের প্রস্তুতি পরিত্যাগ করতে পারে না।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা) বলেনঃ সাধারণ মানুষের ইহকালকে পরকালের উপর প্রাধান্য দেওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। এর কারণ এই যে, ইহকালের নিয়ামত ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য উপস্থিত এবং পরকালের নিয়ামত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দৃষ্টি থেকে উধাও ও অনুপস্থিত। তাই অপরিণামদর্শী লোকেরা উপস্থিতকে অনুপস্থিতের উপর মধ্যে প্রাধান্য দিয়ে বসে। যা তাদের জন্য চিরস্থায়ী ক্ষতির কারণ হয়ে যায়। এ ক্ষতির কবল থেকে উদ্ধার করার জন্যই আল্লাহ তা'আলা আল্লাহর কিতাবও রসূলগণের মাধ্যমে পরকালের নিয়ামত ও সুখ-স্বাচ্ছাকে এমনভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, যেন সেগুলো উপস্থিত ও বিদ্যমান। একথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা যাকে নগদ মনে করে অবলম্বন কর, তা আসলে কৃত্রিম, অসম্পূর্ণ ও দ্রুত ধ্বংসশীল। এরূপ বস্তুতে মজে যাওয়া ও তার জন্য নিজ শক্তি বায় করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। এ সত্যকেই ফুটিয়ে তোলার জন্য অতঃপর বলা হয়েছে।

وَ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّ اَبْقٰى

১৭. অথচ আখিরাতই উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী।

আখেরাত দু'দিক দিয়ে দুনিয়ার মোকাবিলায় অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। প্রথমত তার সুখ, স্বাচ্ছন্দ, আরাম-আয়েশ দুনিয়ার সমস্ত নিয়ামতের চাইতে আনেক বেশী ও অনেক উচ্চ পর্যায়ের। দ্বিতীয়ত দুনিয়া ধ্বংসশীল এবং আখেরাত চিরস্থায়ী।

হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আখেরাতের তুলনায় দুনিয়া তো শুধু এমন যেন তোমাদের কেউ সমূদ্রে তার আঙ্গুল ডুবিয়েছে। তারপর সে যেন দেখে নেয় সে আঙ্গুল কি নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে?" [মুসলিম: ২৮৫৮] রাসূল (সাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি দুনিয়ার (ভোগ-বিলাস) অন্বেষণে লিপ্ত থাকে, আখেরাতকে সে ক্ষতিগ্রস্ত করে। আর যে ব্যক্তি আখেরাতের পাথেয় অন্বেষণে লিপ্ত থাকে, সে দুনিয়াকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। অতএব তোমরা চিরস্থায়ী আখেরাতের জন্য ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াকে ক্ষতিগ্রস্ত কর। [মিশকাত ৫১৭৯]

আখেরাতের সুখ-সম্ভার দুনিয়ার চাইতে কত উত্তম সে বিষয়ে আল্লাহ বলেন, 'কেউ জানে না তার কর্মের প্রতিদান হিসাবে কি কি চক্ষু শীতলকারী বস্তু তাদের জন্য লুকিয়ে আছে' (সাজদাহ ১৭)। রাসূল (সাঃ) বলেন, আল্লাহ বলেন,'আমি আমার সৎকর্মশীল বান্দাদের জন্য এমন সুখ-সম্ভার প্রস্তুত করে রেখেছি, যা কোন চোখ কখনো দেখেনি, কোন কান কখনো শোনেনি এবং মানুষের অন্তর কখনো কল্পনা করেনি'। [বুখারী ৭৪৯৮, মুসলিম ২৮২৪]

إِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الْأُوْلٰى

১৮. নিশ্চয় এটা আছে পূর্ববর্তী সহীফাসমূহে–

ইবনে কাসীর বলেন যে, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى থেকে (১৪-১৭) বর্ণিত আয়াতসমূহের বক্তব্য হল বিগত ইলাহী ধর্ম ও কিতাবসমূহের শিক্ষাসমূহের সারনির্যাস'। যা মানুষকে দুনিয়াবী লোভ-লালসার কলুষ-কালিমা হতে মুক্ত করে এবং আখেরাতের স্বচ্ছ গুণাবলীতে আলোকিত করে। অতঃপর তাকে দুনিয়া ও আখেরাতে সফলকাম ব্যক্তিত্বে পরিণত করে। আল্লাহ বলেন, এসব কথা ইবরাহীম ও মূসার কিতাব ও পুস্তিকাসমূহে পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে।

صُحُفِ إِبْرٰهِيْمَ وَ مُوْسٰى

১৯. ইবরাহীম ও মূসার সহীফাসমূহে।

এর মাধ্যমে পূর্বের আয়াতের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সাথে সাথে ইবরাহীম ও মূসা (আঃ)-এর ছহীফার উচ্চ মর্যাদা তুলে ধরা হয়েছে'। এখানে الصُحُفُ বলতে الكتب السماوية الماضية 'বিগত আসমানী কিতাবসমূহ' বুঝানো হয়েছে। প্রসিদ্ধ চারটি কিতাবের বাইরেও পুস্তিকা সমূহ ছিল। সবগুলিকে এখানে الصُحُفُ অর্থাৎ 'ছহীফাসমূহ' বলা হয়েছে। 'ছহীফা' অর্থ, পুস্তিকা।

এই দ্বিতীয়বারের মতো কুরআনে হযরত ইবরাহীম (আ) ও হযরত মূসা (আ) এর সহীফা শিক্ষার বরাত দেয়া হয়েছে। এর আগে সূরা আন নাজমের তৃতীয় রুকূ'তে আর একবার এ ধরনের বরাত দেয়া হয়েছে।

ফুটনোট

▣ সূরাটিতে তিনটি বিষয়বস্তুর অবতারণা করা হয়েছে। এক, তাওহীদ। দুই, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উপদেশ দান। তিন, আখেরাত।

▣ সূরার প্রথম আয়াত পড়ে سبحان ربي الأعلي বলা মুস্তাহাব।

▣রাসূলুল্লাহ (সাঃ) দুই ঈদ ও জুম'আর সালাতে সূরা আ'লা ও গাশিয়াহ পাঠ করতেন।

▣ রবের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন- এর অর্থ হলো-

- আল্লাহকে এমন নামে স্মরণ করতে হবে যা তাঁর উপযোগী।
- সৃষ্টির জন্য যেসব নাম নির্ধারিত রয়েছে সেগুলো আল্লাহর জন্য ব্যবহার করা অথবা আল্লাহর জন্য ব্যবহৃত নামগুলো সৃষ্টির জন্য ব্যবহার করা যাবে না।
- পরম শ্রদ্ধা, ভক্তি ও মর্যাদাসহকারে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে হবে।

▣ মানুষ পৃথিবীর পিছে ছুটতে থাকে কিন্তু যখন পৃথিবী তার হাতের মুঠোয় আসে তখন সে বুঝতে পারে যে, এটি ছিলো অর্থহীন, নগন্য, অস্থায়ী। তখন বুঝে আসে যে, সে বিফল হয়েছে। সুতরাং দুনিয়ার পিছে না ছুটে আখিরাতের পিছনে ছুটতে হবে। তাহলেই সফলতা আসবে।

▣ সফল সেই ব্যক্তি যে অন্তরকে পরিশুদ্ধ করেছে, আল্লাহকে স্মরণ করেছে এবং সালাত কায়েম করেছে।

কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২৪
প্রস্তুতি সহায়ক তাফসীর নোট পর্বঃ ৪

সূরা আত ত্বারিক

সূরা আত-তারিক্ব কুরআনের ৮৬ তম সূরা, এর আয়াত সংখ্যা ১৭। সূরা আত-তারিক্ব মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। সূরার নামের অর্থ রাত্রিতে আগমনকারী।

নামকরণ

প্রথম আয়াতে الطَّارِق শব্দটিকে এর নাম গণ্য করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

বক্তব্য বিষয়ের উপস্থাপনা পদ্ধতির দিক দিয়ে মক্কা মুআ'যযমার প্রাথমিক সূরাগুলোর সাথে এর মিল দেখা যায়। কিন্তু মক্কার কাফেররা যখন কুরআন ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য সব রকমের প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল ঠিক সে সময়ই এ সূরাটি নাযিল হয়।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

সর্বপ্রথম আকাশের তারকাগুলোকে এ মর্মে সাক্ষী হিসেবে পেশ করা হয়েছে যে, এ বিশ্ব-জাহানে কোন একটি জিনিসও নেই যা কোন এক সত্তার রক্ষনাবেক্ষণ ছাড়া নিজের জায়গায় প্রতিষ্ঠিত ও অস্তিত্বশীল থাকতে পারে। তারপর মানুষের দৃষ্টি তার নিজের সত্ত্বার প্রতি আকৃষ্ট করে বলা হয়েছে, দেখো কিভাবে এক বিন্দু শুক্র থেকে অস্তিত্ব দান করে তাকে একটি জ্বলজ্যান্ত গতিশীল মানুষে পরিণত করা হয়েছে। এরপর বলা হয়েছে, যে আল্লাহ এভাবে তাকে অস্তিত্ব দান করেছেন তিনি নিশ্চিতভাবেই তাকে দ্বিতীয়বার পয়দা করার ক্ষমতা রাখেন। দুনিয়ায় মানুষের যেসব গোপন কাজ পর্দার আড়ালে থেকে গিয়েছিল সেগুলোর পর্যালোচনা ও হিসেব-নিকেশই হবে এই দ্বিতীয়বার পয়দা করার উদ্দেশ্য। সে সময় নিজের কাজের পরিণাম ভোগ করার হাত থেকে বাঁচার কোন ক্ষমতাই মানুষের থাকবে না এবং তাকে সাহায্য করার জন্য কেউ এগিয়ে আসতেও পারবে না।

সবশেষে বলা হয়েছে, আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ এবং মাটি থেকে গাছপালা ও ফসল উৎপাদন যেমন কোন খেলা তামাসার ব্যাপার নয় বরং একটি দায়িত্বপূর্ণ কাজ, ঠিক তেমনি কুরআনে যেসব প্রকৃত সত্য ও নিগূঢ় তত্ত্ব বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলোও কোন হাসি তামাসার ব্যাপার নয়। বরং সেগুলো একেবারে পাকাপোক্ত ও অপরিবর্তনীয় কথা। কাফেররা এ ভুল ধারণা নিয়ে বসে আছে যে, তাদের চালবাজী ও কৌশল কুরআনের এই দাওয়াতকে ক্ষতিগ্রস্ত ও প্রতিহত করতে সক্ষম হবে। কিন্তু তারা জানে না, আল্লাহও একটি কৌশল অবলম্বন করছেন এবং তাঁর কৌশলের মোকাবিলায় কাফেরদের যাবতীয় চালবাজী ও কৌশল ব্যর্থ হয়ে যাবে। তারপর একটি বাক্যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা এবং পর্দান্তরালে কাফেরদের ধমক দিয়ে কথা এভাবে শেষ করা হয়েছে: তুমি একটু সবর করো এবং কিছুদিন কাফেরদেরকে ইচ্ছে মতো চলার সুযোগ দাও। কিছুদিন যেতে না যেতেই তারা টের পেয়ে যাবে, তাদের চালবাজী ও প্রতারণা কুরআনকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে না। বরং

যেখানে তারা কুরআনকে ক্ষতিগ্রস্ত ও প্রতিহত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সেখানে কুরআন বিজয়ীর আসনে প্রতিষ্ঠিত হবে।

খালেদ বিন আবূ জাবাল আল উদওয়ানী তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন: তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সাক্বীফের পূর্ব দিকে দেখলেন তিনি (সাঃ) ধনুক বা লাঠির ওপর ভর দিয়ে আছেন। তিনি তাদের নিকট সহযোগিতা চাওয়ার জন্য এসেছিলেন, আমি তাঁর মুখ থেকে সূরা ত্বারিক পাঠ করা শ্রবণ করলাম এবং মুখস্থ করে নিলাম। তখন আমি মুশরিক ছিলাম। অতঃপর মুসলিম হওয়ার পর আমি তা পাঠ করলাম। তারপর সাক্বীফ গোত্রের লোকেরা আমাকে ডেকে বলে: রাসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে কী শুনেছ? আমি তাদের কাছে এ সূরাটি পাঠ করলাম। তখন যেসব কুরাইশ ছিল তারা বলল: আমাদের সাথীর (মুহাম্মাদের) ব্যাপারে আমরা বেশি জানি। যদি আমরা তার কথা সত্য বলে জানতাম তাহলে আমরাই তার আনুগত্য করতাম। (আহমাদ ৩/৩৩৫, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৭/১৩৬)

পূর্বের ও পরের সূরার সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী সূরাতে (আল বুরুজ) মু'মিনদের জন্য ওয়াদা আর কাফেরদের জন্য ধমক সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। আর এই সুরায় তাদেরকে আজাব প্রদানের দলিল স্বরূপ তাদের কৃতকর্মসমূহকে সংরক্ষণ করার কথা আলোচিত হয়েছে। এ ছাড়া পুনরুত্থানের সম্ভাবনা এবং সংঘটন, এর উপর দলিল স্বরূপ কুরআনের সত্যতার বিবরণ দেওয়া হয়েছে, যা পুর্ববর্তী সূরার শেষ দিকেও ছিল। সূরা বুরুজের শেষে (আয়াত ২২) লাওহে মাহফুয এর কথা বর্নিত আছে যা আকাশে অবস্থিত। এবং সূরা আত ত্বারিক শুরু হয়েছে আকাশের কথা দিয়ে।

এ সূরা, আত ত্বারিকে প্রতিদান ও প্রতিফলের বর্ণনা আছে আর পরবর্তী সূরা আ'লাতে সর্বোচ্চ সফলতাকে প্রকৃত উদ্দেশ্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে, সাথে সাথে সফলতা অর্জনের জন্য কিছু কাজের কথাও বলা হয়েছে।

وَ السَّمَآءِ وَ الطَّارِقِ

১. শপথ আসমানের এবং রাতে যা আবির্ভূত হয় তার;

وَ مَآ اَدۡرٰىکَ مَا الطَّارِقُ

২. আর কিসে আপনাকে জানাবে রাতে যা আবির্ভূত হয় তা কী?

النَّجۡمُ الثَّاقِبُ

৩. উজ্জ্বল নক্ষত্র।

اَلطَّارِقُ-এর মূল হল الطَّرۡقُ যার অর্থ اَلدَّقُّ 'ধাক্কানো, খটখটানো'। সেখান থেকে হয়েছে اَلۡمِطۡرَقَةُ 'হাতুড়ি'। আভিধানিক অর্থে দিনে বা রাতে যেকোন সময়ের আগন্তুককে 'তারেক' বলা যায়। কেননা তিনি এলে দরজায় করাঘাত করেন। তবে আরবরা প্রত্যেক রাত্রির আগমুতককে 'তারেক' বলে থাকে *[কুরতুবী]*। আল্লাহ এখানে তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন النَّجۡمُ الثَّاقِبُ অর্থাৎ 'উজ্জ্বল তারকা' বলে। কেননা তা রাতের আকাশে আগমন করে ও উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হয়।

كَأَنه يثْقُب الظلامَ بضوئه فينفُذ الثَّاقِبُ এর মূল الثقب 'ছিদ্র'। এখানে الثاقب বিশেষণ এজন্য ব্যবহার করা হয়েছে فيه 'যেন সে তার আলো দ্বারা অন্ধকার ছিদ্র করে বেরিয়ে যায়'। যেমন আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ، 'আমরা দুনিয়ার আকাশকে সুসজ্জিত করেছি অসংখ্য দীপালীর মাধ্যমে' *(মূলক ৫)*।

السَّمَاءُ এসেছে سُمُوٌّ থেকে। অর্থ উঁচু হওয়া। যেমন বলা হয় 'তার দিকে আমার দৃষ্টি পড়ল'। সেখান থেকে السَّمَاءُ অর্থ 'আকাশ'। যা উচ্চে অবস্থিত। আকাশের সীমানা ও উচ্চতার কোন সীমা-সরহদ নেই। সীমাহীন নীলাকাশের সৌন্দর্য হল তারকারাজি। যা আমরা চর্মচক্ষুতে দেখতে পাই। এগুলি আল্লাহর এক অপূর্ব সৃষ্টি। নক্ষত্ররাজি কেবল আলো দেয় না, এরা রাতের অন্ধকারে আমাদের পথ দেখায়। আল্লাহ বলেন, 'তারকারাজির মাধ্যমে লোকেরা পথ খুঁজে পায়' *(নাহল ১৬)*। তারকারাজির সংখ্যারও কোন শেষ নেই। এমন বহু নক্ষত্র রয়েছে, যাদের আলো লক্ষ লক্ষ বছর পরেও পৃথিবীতে এসে পৌঁছবে কি-না সন্দেহ। মানুষের তুলনায় এসব সৃষ্টির বিশালতা বুঝানোর জন্যই আল্লাহ এখানে আকাশ ও তারকারাজির শপথ করেছেন।
الطَّارِقُ ও الثَّاقِبُ শব্দ দু'টি একবচন হলেও এখানে إسم جنس বা জাতিবোধক বিশেষ্য হয়েছে। অর্থাৎ রাত্রির উজ্জ্বল তারকারাজি।

اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ

৪. প্রত্যেক জীবের উপরই তত্ত্বাবধায়ক রয়েছে।

এটা শপথের জওয়াব। حَافِظٌশব্দের অর্থ তত্ত্বাবধায়ক। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা। আকাশ ও নক্ষত্রের শপথ করে বলেছেন, প্রত্যেক মানুষের ওপর তত্ত্বাবধায়ক বা আমলনামা লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছে। সে তার সমস্ত কাজকর্ম ও নড়াচড়া দেখে, জানে। [ফাতহুল কাদীর] এর পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের চিন্তা করা উচিত যে, সে দুনিয়াতে যা কিছু করছে, তা সবই কেয়ামতের দিন হিসাব-নিকাশের জন্যে আল্লাহর কাছে সংরক্ষিত রয়েছে। তাই কোন সময় আখেরাত ও কেয়ামতের চিন্তা থেকে গাফেল হওয়া অনুচিত। এখানে حَافِظٌশব্দ একবচনে উল্লেখ করা হলেও তারা যে একাধিক তা অন্য আয়াত থেকে জানা যায়। অন্য আয়াতে আছে (وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ * كِرَامًا كَاتِبِينَ) "নিশ্চয় তোমাদের উপর নিয়োজিত রয়েছে তত্ত্বাবধায়করা, সম্মানিত লেখকরা"। [সূরা আল-ইনফিতার; ১০-১১]

তাছাড়া حافظএর অপর অর্থ আপদ-বিপদ থেকে হেফাযতকারীও হয়ে থাকে। [ইবন কাসীর] আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক মানুষের হেফাযতের জন্যে ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন। তারা দিন-রাত মানুষের হেফাযতে নিয়োজিত থাকে। তবে আল্লাহ তা'আলা যার জন্যে যে বিপদ অবধারিত করে দিয়েছেন, তারা সে বিপদ থেকে হেফাযত করে না। অন্য এক আয়াতে একথা পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে, (لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ) অর্থাৎ মানুষের জন্যে পালাক্রমে আগমনকারী পাহারাদার ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছে। তারা আল্লাহর আদেশে সামনে ও পেছনে থেকে তার হেফাযত করে। [সূরা আর-রাদ: ১১]

অথবা হেফাযতকারী বলতে এখানে আল্লাহকেই বুঝানো হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর] তিনি আকাশ ও পৃথিবীর ছোট বড় সকল সৃষ্টির দেখাশুনা, তত্ত্বাবধান ও হেফাযত করছেন। তিনিই সব জিনিসকে অস্তিত্ব দান করেছেন তিনিই সবকিছুকে টিকিয়ে রেখেছেন। তিনি সব জিনিসকে ধারণ করেছেন বলেই প্রত্যেকটি জিনিস তার নিজের জায়গায় প্রতিষ্ঠিত আছে। তিনি সব জিনিসকে তার যাবতীয় প্রায়োজন পূর্ণ করার এবং তাকে একটি নির্দিষ্ট

সময়সীমা পর্যন্ত বিপদমুক্ত রাখার দায়িত্ব নিয়েছেন। এ বিষয়টির জন্য আকাশের ও রাতের অন্ধকারে আত্মপ্রকাশকারী প্রত্যেকটি গ্রহ ও তারকার কসম খাওয়া হয়েছে।

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ
৫. অতএব মানুষ যেন চিন্তা করে দেখে তাকে কী থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

فَلْيَنْظُرِ এখানে অর্থ 'দেখা উচিৎ'। এখানে نظر অর্থ চর্মচক্ষু দিয়ে দেখা নয়, বরং জ্ঞানচক্ষু দিয়ে দেখা। অর্থাৎ 'চিন্তা-গবেষণা করা'।

এখানে আল্লাহ তা'আলা যে মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম তার ওপর মানুষেরই নিজের সত্ত্ব থেকে প্রমাণাদি উপস্থাপন করছেন। মানুষ তার নিজের সম্পর্কে একটু চিন্তা করে দেখুক। তাকে কিভাবে কোত্থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে? তাকে অত্যন্ত দুর্বল বস্তু হতে সৃষ্টি করা হয়েছে। যিনি প্রথমবার তাকে সৃষ্টি করতে পারেন তিনি অবশ্যই দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করতে সক্ষম। যেমন অন্য আয়াতে বলেছেন, "তিনিই প্রথম সৃষ্টি করেন, পরে আবার তিনি তা করবেন, আর এটা তো তার জন্য সহজতর"। [সূরা আর-রূম: ২৭]

خُلِقَ مِنْ مَّآءٍ دَافِقٍ
৬. তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে স্খলিত পানি হতো

دَافِقٍ অর্থ 'সবেগে নির্গত'। সেখান থেকে مَّآءٍ دَافِقٍ অর্থ 'মাতৃগর্ভে স্থিত পানি'। অর্থাৎ পিতা ও মাতার মিলিত শুক্রবিন্দু। দু'টি মিলে একটি বিন্দু হওয়ায় مَّآءٍ دَافِقٍ একবচন হয়েছে। অন্য আয়াতে একে نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ বা 'মিশ্র শুক্রবিন্দু' বলা হয়েছে (দাহর ৭৬/২)।

আল্লাহ বলেন, তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে স্খলিত পানি থেকে যা তার মায়ের গর্ভে স্থিত থাকে। পিতা ও মাতা উভয়ের পানি সেখানে জমা হয়ে একটি পানি বিন্দু অর্থাৎ মিশ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, পিতা ও মাতা উভয়ের মিলিত একটি পানি বিন্দুই হল মানব সৃষ্টির উৎস। যা মায়ের গর্ভে স্থিতি লাভ করে এবং সেখানে পুষ্ট হয়ে সাধারণত ৯ মাস ১০ দিন পরে পূর্ণাঙ্গ মানব শিশুর রূপ ধারণ করে। মাটিতে বীজ বপন করার পর প্রয়োজনীয় তাপ, চাপ ও খাদ্য যোগানোর মাধ্যমে যেমন তা নির্ধারিত সময়ে অংকুর হিসাবে উদ্গত হয় ও পরে বীজ অনুযায়ী বিভিন্ন উদ্ভিদে পরিণত হয়। পিতার শুক্রাণু তেমনি বীজ হিসাবে মায়ের ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হয়ে সেখানে প্রয়োজনীয় তাপ, চাপ ও খাদ্য যোগানের মাধ্যমে স্বাভাবিক প্রবৃদ্ধি ঘটে। অতঃপর পূর্ণাঙ্গ মানব শিশু হিসাবে দুনিয়াতে ভূমিষ্ঠ হয়। সেকারণ সন্তান তার পিতা ও মাতা উভয়ের রং, রূপ ও স্বভাব কমবেশী প্রাপ্ত হয়।

يَّخْرُجُ مِنْۢ بَيْنِ الصُّلْبِ وَ التَّرَآئِبِ
৭. এটা নির্গত হয় মেরুদণ্ড ও পঞ্জরাস্থির মধ্য থেকে।

الصُّلْبِ অর্থ মেরুদন্ড বা পিঠ। التَّرَائِبِ একবচনে التَّرِيْبَةُ অর্থ عظام الصدر 'নারী ও পুরুষের বুকের উপর দিককার হাড্ডি'। ইবনু আববাস (রাঃ) বলেন, এর অর্থ موضع القلادة 'মেয়েদের কণ্ঠহারের স্থান'।

আয়াতে مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ বলতে পিতা ও মাতা প্রত্যেকের পিঠ ও বুকের মধ্য হ'তে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। কেননা দেহের সকল প্রধান অঙ্গের অবস্থান মূলত পিঠ ও বুকের মধ্যেই থাকে। দেহের কেন্দ্রবিন্দু হল

মস্তিষ্ক। আর তার প্রতিনিধি হিসাবে মেরুদন্ডের হাড্ডির মধ্যে লুক্কায়িত স্নায়ুকান্ড তার শাখা-প্রশাখা ও শিরা-উপশিরার মাধ্যমে মস্তিষ্কের হুকুম সারা দেহে সঞ্চালিত করে।

'যা নির্গত হয় মেরুদন্ড ও বুকের মধ্যস্থল হতে'- একথার মধ্যে একটি বৈজ্ঞানিক তথ্য নিহিত আছে। তা এই যে, জন্ম পূর্ববর্তী অবস্থায় অর্থাৎ শিশুর দেহ গঠনের স্তরে তার অন্ডকোষ বা ডিম্বাশয় মেরুদন্ড ও বুকের পাঁজরের হাড্ডির মাঝে বিকশিত হওয়া শুরু করে। পরবর্তীতে এগুলো নীচে নেমে গেলেও তাদের রক্ত সঞ্চালন পূর্বের স্থান থেকেই হয়।

اِنَّهٗ عَلٰی رَجۡعِهٖ لَقَادِرٌ

৮. নিশ্চয় তিনি তাকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম।

উদ্দেশ্য এই যে, যিনি প্রথমবার মানুষকে বীর্য থেকে প্রথম সৃষ্টিতে একজন জীবিত, শ্রোতা ও দ্রষ্টা মানব সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাকে পুনরায় ফিরিয়ে দিতে অর্থাৎ মৃত্যুর পর জীবিত করতে আরও ভালরূপে সক্ষম। [ইবন কাসীর] যদি তিনি প্রথমটির ক্ষমতা রেখে থাকেন এবং তারই বদৌলতে মানুষ দুনিয়ায় জীবন ধারণ করছে, তাহলে তিনি দ্বিতীয়টির ক্ষমতা রাখেন না, এ ধারণা পোষণ করার পেছনে এমন কি শক্তিশালী যুক্তি পেশ করা যেতে পারে?

یَوۡمَ تُبۡلَی السَّرَآئِرُ

৯. যেদিন গোপন বিষয় পরীক্ষিত হবে

গোপন রহস্য বলতে এখানে প্রত্যেক ব্যক্তির এমনসব কাজ বুঝানো হয়েছে যেগুলো রহস্যাবৃত্ত রয়ে গেছে আবার এমন সব কাজও বুঝানো হয়েছে, যেগুলো বাহ্যিক আকৃতিতে জন সমক্ষে এসে গেছে কিন্তু সেগুলোর পেছনে সক্রিয় নিয়ত, উদ্দেশ্য স্বার্থ ও আশা-আকাঙ্খা এবং সেগুলোর গোপন কার্যকারণ লোক চক্ষুর অন্তরালে থেকে গেছে। কিয়ামতের দিন এসব কিছু উন্মুক্ত হয়ে সামনে এসে যাবে। সেদিন কেবলমাত্র কে কি করেছে এর তদন্ত ও হিসেব-নিকেশ হবে না বরং কি কারণে, কি উদ্দেশ্য, কি নিয়তে ও কোন মানসিকতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এ কাজ করেছিল তারও হিসেব হবে। অনুরূপভাবে এক ব্যক্তি যে কাজটি করেছে দুনিয়ায় তার কি প্রভাব পড়েছে, কোথায় তার প্রভাব পৌঁছেছে এবং কতদিন পর্যন্ত এ প্রভাব অব্যাহত থেকেছে--- তাও সারা দুনিয়ার চোখ থেকে গোপন থেকেছে, এমনকি যে ব্যক্তি এ কাজটি করেছে তার চোখ থেকেও। আর একটি রহস্যও শুধুমাত্র কিয়ামতের দিনেই উন্মুক্ত হবে এবং সেদিন এর পুরোপুরি তদন্ত ও হিসেব-নিকেশ হবে। সেটি হচ্ছে, এক ব্যক্তি দুনিয়ায় যে বীজ বপন করে গিয়েছিল তার ফসল কতখানি পর্যন্ত কোন্ কোন্ পদ্ধতিতে সে এবং তার সাথে আর কে কে কাটতে থেকেছে? [তাফহীমুল কুরআন]

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "কেয়ামতের দিন প্রত্যেক গাদ্দারের পিছনে একটি পতাকা লাগানো হবে যাতে থাকবে, এটা অমুকের পুত্র অমুকের গাদ্দারী।" [বুখারী: ৬১৭৮, মুসলিম: ১৭৩৫] সুতরাং সেদিন মানুষের সব গোপন ভেদ খুলে যাবে। প্রত্যেক ভাল-মন্দ বিশ্বাস ও কর্মের আলামত মানুষের মুখমণ্ডলে শোভা পাবে।

فَمَا لَهٗ مِنۡ قُوَّۃٍ وَّ لَا نَاصِرٍ

১০. সেদিন তার কোন সামর্থ্য থাকবে না, এবং সাহায্যকারীও নয়।

মানুষের নিকট এমন শক্তি থাকবে না যে, সে আল্লাহর আযাব থেকে পরিত্রাণ লাভ করতে পারবে। আর না কোন দিক থেকে তার এমন কোন সাহায্যকারী পাওয়া যাবে, যে তাকে আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচাতে পারে।

وَ السَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجۡعِ

১১. শপথ আসমানের যা ধারণ করে বৃষ্টি

رجع এর আভিধানিক অর্থ হল ফিরে আসা। বৃষ্টিও বারবার এবং ফিরে ফিরে আসে বলে তার জন্য رجع শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। কোন কোন উলামাগণ বলেন যে, মেঘ (সূর্যের তাপে) সমুদ্রের পানি থেকে সৃষ্টি হয় অতঃপর পুনরায় সেই পানি (সমুদ্র ও) পৃথিবীতে ফিরে আসে। এই জন্য বৃষ্টিকে رجع বলা হয়েছে। আরবরা পুনর্বার বৃষ্টির আশায় আশাবাদী হয়ে বৃষ্টিকে رجع বলত; যাতে বারবার বর্ষণ হতে থাকে। [ফাতহুল কাদীর]

وَ الۡاَرۡضِ ذَاتِ الصَّدۡعِ

১২. এবং শপথ যমীনের, যা বিদীর্ণ হয়

অর্থাৎ, মাটি ফেটে তা হতে শস্যদানা অঙ্কুরিত হয়। মাটি ফেটে ঝরনাধারা প্রবাহিত হয়। আর এইভাবে একদিন এমন আসবে যেদিন মাটি ফেটে সমস্ত মৃত জীব-জন্তু জীবিত হয়ে ভূগর্ভ থেকে বের হয়ে আসবে। এই জন্যই যমীন, মাটি ও পৃথিবীকে 'বিদীর্ণশীল' বলা হয়েছে। (এ ছাড়া সমুদ্রগর্ভেও বড় বড় ফাটল রয়েছে বলে বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে।)

اِنَّهٗ لَقَوۡلٌ فَصۡلٌ

১৩. নিশ্চয় আল-কুরআন মীমাংসাকারী বাণী।

وَّ مَا هُوَ بِالۡهَزۡلِ

১৪. এবং এটা নিরর্থক নয়।

الفَصۡلُ অর্থ 'সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী'। الۡهَزۡلِ যা ضِدُّ الۡجِدِّ 'সত্যের বিপরীত' অর্থাৎ বৃথা বাক্য।

আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবীর কসম করে বলছেন, নিশ্চয়ই কুরআন সত্য ও মিথ্যার ফায়ছালাকারী। আর এটা কোন বৃথাবাক্য নয়। যারা কুরআনকে এড়িয়ে চলতে চায় এবং নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে চায়, মূলতঃ তারাই কুরআনী সত্যকে প্রকাশ্যে অথবা গোপনে অগ্রাহ্য করে থাকে। কুরআনের বিরুদ্ধে যত কথাই তারা বলুক, সবই বাজে কথা মাত্র। কুরআনে কোন বাহুল্য কথা নেই। কুরআনের প্রতিটি শব্দ, বাক্য ও বর্ণ বিপুল জ্ঞান ও অর্থ সম্ভারে পূর্ণ। আল্লাহ বলেন, 'তোমার প্রভুর কালাম সত্য ও ন্যায় দ্বারা পূর্ণ' (আন'আম ১১৫)।

কুরআন পাঠের সময় চিন্তাশীল পাঠককে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, এর প্রতিটি বাক্য সত্য ও চূড়ান্ত। এর প্রতিটি বর্ণ ও বর্ণনার স্টাইল অনন্য ও অচিন্তনীয় এবং তা চিরন্তন কল্যাণের ইঙ্গিতবাহী। বান্দাকে তার গভীরে ডুব দিয়ে তা বের করে আনতে হবে হাদীছের দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী। কেননা কুরআনের ব্যাখ্যা হল হাদীছ এবং কুরআনের কোন বর্ণই অনর্থক বা অহেতুক নয়।

উল্লেখ্য যে, সূরার শুরুতে আকাশের ও উজ্জ্বল নক্ষত্ররাজির শপথ করা হয়েছে। অতঃপর এখানে পুনরায় আকাশ ও পৃথিবীর শপথ করে বলা হচ্ছে যে, 'কুরআন হল সিদ্ধান্তকারী বাণী'। দুই শপথের মধ্যে সামঞ্জস্য সম্ভবতঃ এই যে, (আল্লাহ সর্বাধিক অবগত) প্রথম শপথে উজ্জ্বল নক্ষত্রের কথা বলা হয়েছে, যা প্রয়োজনে শয়তানের প্রতি নিক্ষেপ করা হয়, যারা 'অহি' চুরি করতে চায়। যার মাধ্যমে কুরআনকে হেফাযত করা হয়। দ্বিতীয় শপথে বর্ষণশীল আকাশের কথা বলা হয়েছে, যার দ্বারা মৃত যমীনকে জীবন্ত করা হয়। এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, কুরআন হল জীবন সদৃশ। যা মানুষের মৃত হৃদয়কে জীবিত করে। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 'আর এভাবেই আমরা তোমার নিকট 'অহি' করেছি রূহ (কুরআন) আমাদের নির্দেশক্রমে' (শূরা ৫২)। এখানে কুরআনকে 'রূহ' বলা হয়েছে [ইবনে কাসীর]। নিঃসন্দেহে কুরআন মানবজাতির জন্য রূহ সদৃশ।

اِنَّهُمۡ یَكِیۡدُوۡنَ كَیۡدًا

১৫. তারা ভীষণ ষড়যন্ত্র করে,

অর্থাৎ কাফেররা কুরআনের দাওয়াতকে ব্যর্থ করার জন্য নানা ধরণের অপকৌশলের আশ্রয় নিচ্ছে। কুরআনের পথ থেকে মানুষদেরকে দূরে রাখতে চাচ্ছে। কুরআনের আহবানের বিপরীতে চলার জন্য ষড়যন্ত্র করছে। [ইবন কাসীর] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে হক দ্বীন নিয়ে এসেছেন তারা তা ব্যর্থ করে দিতে ষড়যন্ত্র করছে। [ফাতহুল কাদীর]

وَّ اَكِیۡدُ كَیۡدًا

১৬. এবং আমিও ভীষণ কৌশল করি।

الكَیۡدُ অর্থ ধোঁকা, প্রতারণা, চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র। এই অর্থ বান্দার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, আল্লাহর ক্ষেত্রে নয়। আল্লাহর ক্ষেত্রে অর্থ হবে جزاء كيدهم 'তাদের চক্রান্তের বদলা' [কুরতুবী]। অর্থাৎ আল্লাহর কৌশল হল শত্রুদের যথাযথ বদলা দেওয়া।

মক্কায় কাফির-মুশরিকরা রাসূল (সাঃ) ও তাঁর সাথীদের বিরুদ্ধে যে চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র ও অকথ্য নির্যাতন করেছিল, অত্র আয়াতে সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন 'স্মরণ কর সেই সময়ের কথা যখন কাফিররা (মক্কায় দারুন নাদওয়াতে বসে) তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল তোমাকে বন্দী করার বা হত্যা করার বা বহিষ্কার করার জন্য। বস্তুতঃ তারা ষড়যন্ত্র করে এবং আল্লাহ কৌশল করেন। আর আল্লাহ হ'লেন সেরা কৌশলী' (আনফাল ৩০)।

বস্তুতঃ অবিশ্বাসীরা সর্বযুগে রাসূল (সাঃ) ও কুরআনের বিরুদ্ধে মানুষকে নানাবিধ ধোঁকার জালে আবদ্ধ করে থাকে। তারা কুরআনের আলো নিভিয়ে দেবার জন্য এবং কুরআনের প্রচার ও প্রসার বন্ধ করার জন্য নানাবিধ কৌশল করে থাকে। আর আল্লাহ তার যথাযথ কৌশল প্রয়োগ করেন। আর তা হল তাদেরকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কুরআনের বিরোধিতা করার সুযোগ দেওয়া এবং যথাসময়ে পাকড়াও করা। যে পাকড়াওয়ের সময়সীমা সম্পর্কে অবিশ্বাসীদের কোন পূর্ব ধারণা থাকবে না।

فَمَهِّلِ الْكٰفِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا

১৭. অতএব কাফিরদেরকে অবকাশ দিন; তাদেরকে অবকাশ দিন কিছু কালের জন্য।

অর্থাৎ, তাদের জন্য তড়িঘড়ি শাস্তি প্রার্থনা করো না; বরং তাদেরকে কিছুকাল ঢিল, সুযোগ অথবা অবকাশ দাও। এখানে رويدًاশব্দটি قليلًا(কিছু পরিমাণ) অথবা قريبًا(কিছু কাল) এর অর্থে ব্যবহার হয়েছে। এই ঢিল বা অবকাশ দেওয়া কাফেরের পক্ষে এক প্রকার আল্লাহর কৌশল। যেমন তিনি বলেছেন, "আমি তাদেরকে ক্রমে ক্রমে এমনভাবে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাব যে, তারা জানতেও পারবে না! আর আমি তাদেরকে ঢিল দিব, নিশ্চয় আমার কৌশল অত্যন্ত বলিষ্ঠ।" (সূরা আ'রাফ ১৮২-১৮৩ আয়াত)

অন্য আয়াতেও আল্লাহ বলেছেন, "তাদেরকে আমরা অল্পকিছু উপভোগ করতে দেব, তারপর আমরা তাদেরকে কঠিন শাস্তির দিকে যেতে বাধ্য করব।" (সূরা লুকমান: ২৪)

ফুটনোট

▣اَلطَّارِقُ -অর্থ 'ধাক্কানো, খটখটানো'।

▣ যিনি প্রথমবার মানুষকে বীর্য থেকে প্রথম সৃষ্টিতে একজন জীবিত, শ্রোতা ও দ্রষ্টা মানব সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাকে পুনরায় ফিরিয়ে দিতে অর্থাৎ মৃত্যুর পর জীবিত করতে আরও ভালরূপে সক্ষম।

▣ মানুষ যদি নিজের সৃষ্টি উপাদান নিয়ে চিন্তা করে তাহলে আল্লাহ তা'আলাকে চিনতে পারবে এবং তাদের জন্য আখিরাতের প্রতি ঈমান আনা সহজ হবে।

▣ কিয়ামতের দিন কিছুই গোপন থাকবে না, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সব কিছু উন্মোচন করে দেয়া হবে।

▣ সূরার প্রথমদিকে শপথ করা হয়েছে, শপথ আসমানের এবং রাতে যা আবির্ভূত হয় তার- উজ্জ্বল নক্ষত্র।

▣ মানুষের তুলনায় এসব বিশালতা বুঝানোর জন্যই আল্লাহ এখানে আকাশ ও তারকারাজির শপথ করেছেন।

▣ সূরার শেষ দিকে আবার শপথ করা হয়েছে, শপথ আসমানের যা ধারণ করে বৃষ্টি এবং শপথ যমীনের, যা বিদীর্ণ হয়।

▣ অবিশ্বাসীরা কুরআনের আলো নিভিয়ে দেবার জন্য এবং কুরআনের প্রচার ও প্রসার বন্ধ করার জন্য নানাবিধ কৌশল করে থাকে। আর আল্লাহ তার যথাযথ কৌশল প্রয়োগ করেন। আর তা হল তাদেরকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কুরআনের বিরোধিতা করার সুযোগ দেওয়া এবং যথাসময়ে পাকড়াও করা। যে পাকড়াওয়ের সময়সীমা সম্পর্কে অবিশ্বাসীদের কোন পূর্ব ধারণা থাকবে না।

কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২৪
প্রস্তুতি সহায়ক তাফসীর নোট পর্বঃ ৫

সূরা বুরুজ

নামকরণ:

প্রথম আয়াতে ٱلْبُرُوْجِ শব্দটিকে এর নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল :

এর বিষয়বস্তু থেকেই একথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, এ সূরাটি মক্কা মুয়ায্যমায় এমন এক সময় নাযিল হয় যখন মুশরিকদের জুলুম-নিপীড়ন তুংগে উঠেছিল এবং তারা কঠিনতম শাস্তি দিয়ে মুসলমানদের ইসলাম থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টা করছিল।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য :

এর মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে, ঈমানদারদের ওপর কাফেররা যে জুলুম করছিল সে সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করা এবং ঈমানদারদেরকে এই মর্মে সান্ত্বনা দেয়া যে, যদি তারা এসব জুলুম-নিপীড়নের মোকাবিলায় অবিচল থাকে তাহলে তারা এর জন্য সর্বোত্তম পুরস্কার পাবে এবং আল্লাহ নিজেই জালেমদের থেকে বদলা নেবেন।

এ প্রসংগে সর্বপ্রথম আসহাবুল উখদূদের (গর্ত ওয়ালাদের) কাহিনী শুনানো হয়েছে। তারা ঈমানদারদেরকে আগুনে ভরা গর্তে ফেলে দিয়ে পুড়িয়ে মেরেছিল। এ কাহিনীর মাধ্যমে মু'মিন ও কাফেরদেরকে কয়েকটি কথা বুঝানো হয়েছে।

এক, গর্তওয়ালারা যেমন আল্লাহর অভিশাপ ও তাঁর শাস্তির অধিকারী হয়েছে তেমনি মক্কার মুশরিক সরদাররাও তার অধিকারী হচ্ছিল।

দুই, ঈমানদাররা যেমন তখন ঈমান ত্যাগ করার পরিবর্তে আগুনে ভরা গর্তে নিক্ষিপ্ত হয়ে জীবন দেয়াকে বেছে নিয়েছিল, ঠিক তেমনিভাবে এখনও ঈমানদারদের ঈমানের পথ থেকে সামান্যতমও বিচ্যুত না হয়ে সব রকমের কঠিনতম শাস্তি ভোগ করা উচিত।

তিন, যে আল্লাহকে মেনে নেবার কারণে কাফেররা বিরোধী হয়ে গেছে এবং ঈমানদাররা তাদের মেনে নেবার ওপর অবিচল রয়েছে, তিনি সবার ওপর ক্ষমতাশালী ও বিজয়ী, তিনি পৃথিবী ও আকাশের কর্তৃত্বের অধিকারী, নিজের সত্তায় তিনি নিজেই প্রশংসার অধিকারী এবং তিনি উভয় দলের অবস্থা দেখছেন। কাজেই নিশ্চিতভাবেই কাফেররা তাদের কুফরীর কারণে কেবল জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে না বরং এই সংগে নিজেদের জুলুম-নিপীড়নের শাস্তিও তারা ভোগ করবে আগুনে দগ্ধীভূত হয়ে। অনুরূপভাবে যারা ঈমান এনে সৎকাজ করেছে তারা নিশ্চিতভাবে জান্নাতে যাবে এবং এটিই বৃহত্তম সাফল্য।

তারপর কাফেরদেরকে এ মর্মে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ অত্যন্ত শক্ত ও কঠোরভাবে পাকড়াও করে থাকেন। যদি তোমরা নিজেদের বিরাট দলীয় শক্তির ওপর ভরসা করে থাকো তাহলে তোমাদের চাইতে বড় দলীয় শক্তির অধিকারী ছিল ফেরাউন ও সামূদরা। তাদের সেনাবাহিনীর পরিণাম থেকে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো। আল্লাহর অসীম শক্তি তোমাদেরকে চারদিক থেকে ঘিরে আছে। এই ঘেরাও কেটে বের হবার ক্ষমতা তোমাদের নেই। আর যে কুরআনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য তোমরা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছো, তার প্রত্যেকটি শব্দ অপরিবর্তনীয়। এই কুরআনের প্রতিটি শব্দ লওহে মাহফুযের গায়ে এমনভাবে খোদিত আছে যে হাজার চেষ্টা করেও কেউ তা বদলাতে পারবে না।

আগের ও পরের সূরার সাথে সম্পর্ক

আগের (৮৪ তম) সূরা আল ইনশিকক এ আকাশের কথা এসেছে। তারই ধারাবাহিকতায় এই সূরাও আকাশের কথা দিয়ে শুরু হয়েছে।

এই সূরার শেষে (আয়াত ২২) লাওহে মাহফুয এর কথা বর্নিত আছে যা আকাশে অবস্থিত। পরের ৮৬ তম সূরা আত তরিক শুরু হয়েছে আকাশের কথা দিয়ে। ৮৫ তম সূরা আল বুরুজের শেষের দিকে (আয়াত ২০) বলা হয়েছে যে, আল্লাহ সবসময়েই তাদের ঘেরাও করে রাখেন, যার আরো বিস্তারিত ব্যাখ্যা পাওয়া যায় পরের সূরা আত তরিক এর ৪র্থ আয়াতে (এমন একটি সত্ত্বাও নেই যার উপর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত নেই)

ফযীলত

জাবির ইবনু সামুরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহর ও আসরের সালাতে ওয়াস-সামায়ি যাতি’ল বুরূজ, ওয়াস-সামায়ি ওয়াত-তারিক এবং এই ধরনের সূরা তিলাওয়াত করতেন।- **[সিফাতুস সালাত ৯৪, সহিহ আবু দাউদ ৭৬৭, তিরমিজী হাদিস নম্বরঃ ৩০৭]**

তাফসীর

وَ السَّمَآءِ ذَاتِ الۡبُرُوۡجِ

১. শপথ বুরূজবিশিষ্ট আসমানের,

بُرُوجٌশব্দটি بُرْجٌএর বহুবচন। অর্থ বড় প্রাসাদ ও দুর্গ। অন্য আয়াতে আছে, (وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ) এখানে এই অর্থই বোঝানো হয়েছে। [কুরতুবী] অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে আলোচ্য আয়াতে بُرُوجٌএর অর্থ বড় বড় গ্রহ-নক্ষত্র। কয়েকজন তাফসীরবিদ এ স্থলে অর্থ নিয়েছেন প্রাসাদ। অর্থাৎ সেসব গৃহ, যা আকাশে প্রহরী ও তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতাদের জন্যে নির্ধারিত। আবার কারও কারও মতে, এ অর্থ সুন্দর সৃষ্টি। অর্থাৎ সুন্দর সৃষ্টি আসমানের শপথ। তবে ইমাম ইবন জারীর আত-তাবারীর মত হচ্ছে, এখানে সূর্য ও চন্দ্রের অবস্থানস্থলসমূহ। আর তার সংখ্যা বারটি। সূর্য তার প্রতিটিতে একমাস চলে। আর চন্দ্র এর প্রতিটিতে দুইদিন ও একদিনের তিনভাগের এক অংশ সময় চলে। এতে করে চাঁদের আটাশটি অবস্থান হয়। তারপর সে দুদিন গোপন থাকে।

এই বারটির প্রত্যেকটি একেকটি بُرْجٌ। চন্দ্র ও সূর্য আকাশের গতিতে গতিশীল হয়ে এসব بُرْجٌএর মধ্যে অবতরণ করে। [ইবন কাসীর] তাই আয়াতের অর্থ হবে, সেই আসমানের শপথ, যাতে রয়েছে চাঁদ ও সূর্যের অবতরণস্থানসমূহ, অনুরূপ তাতে রয়েছে সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্রের অবতরণস্থলসমূহ, যেগুলো নিয়ম মেনে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে চলছে। এ সুন্দর চলন ও সুন্দর নিয়মই আল্লাহর অপার শক্তি, রহমত, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার প্রমাণ বহন করছে। [সা'দী]

وَ الۡیَوۡمِ الۡمَوۡعُوۡدِ

২. আর প্রতিশ্রুত দিনের,

وَ شَاهِدٍ وَّ مَشۡهُوۡدٍ

৩. শপথ সাক্ষ্যদাতার ও উপস্থিতগণের

হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ) বা প্রতিশ্রুত দিনের অর্থ কেয়ামতের দিন। আর مَشْهُودএর অর্থ আরাফার দিন এবং شاهدএর অর্থ শুক্রবার দিন। জুম'আর দিনের চেয়ে উত্তম কোন দিনে কোন সূর্য উদিত হয়নি এবং ডুবেওনি। সেদিন এমন একটি সময় আছে, কোন মুমিন বান্দা যখনই কোন কল্যাণের দো'আ করে তখনই তার দো'আ কবুল করা হয়। অথবা যদি কোন অকল্যাণ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয় তখনই তাকে আল্লাহ তা থেকে আশ্রয় দেয়।" [তিরমিযী: ৩৩৩৯]

قُتِلَ اَصۡحٰبُ الۡاُخۡدُوۡدِ

৪. অভিশপ্ত হয়েছিল কুণ্ডের অধিপতিরা—

এখানে আল্লাহ্ তা'আলা চারটি বস্তুর শপথ করার পর মূল কথা বর্ণনা করেছেন। (এক) বুরুজবিশিষ্ট আকাশের; (দুই) কেয়ামত দিবসের; (তিন) আরাফার দিনের এবং (চার) শুক্রবারের। এসব শপথের সম্পর্ক এই যে, এগুলো আল্লাহ্ তা'আলার পরিপূর্ণ শক্তি, কেয়ামতের হিসাব-নিকাশ এবং শাস্তি ও প্রতিদানের দলীল। শুক্রবার ও আরাফার দিন মুসলিমদের জন্যে আখেরাতের পুঁজি সংগ্রহের পবিত্র দিন।

এখানে قُتِلَ অর্থ - অভিশপ্ত হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন, 'কুরআনে যেখানেই قُتِلَ এসেছে, সেখানেই তার অর্থ হবে لُعِنَ অর্থাৎ অভিশপ্ত হয়েছে। قُتِلَ -এর পূর্বে একটি 'লাম তাকীদ' (لَ) উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ لَقُتِلَ 'অবশ্যই ধ্বংস হয়েছে গর্তওয়ালারা'।

الأُخْدُوْدُ অর্থ 'ভূগর্ভের দীর্ঘ বড় গর্ত'। এর উৎপত্তি خَدٌّ থেকে। যার অর্থ 'মুখগহবর'। এখানে অগ্নিগহবর বুঝানো হয়েছে।

যারা বড় বড় গর্তের মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে ঈমানদারদেরকে তার মধ্যে ফেলে দিয়েছিল এবং তাদের জ্বলে পুড়ে মরার বীভৎস দৃশ্য নিজেদের চোখে দেখেছিল তাদেরকে এখানে **'আসহাবুল উখদুদ'** বা গর্তওয়ালা বলা হয়েছে।

النَّارِ ذَاتِ الۡوَقُوۡدِ

৫. যে কুণ্ডে ছিল ইন্ধনপূর্ণ আগুন

النَّارশব্দটি الأخدودথেকে বদলে ইশতিমাল। ذات الوقود শব্দটি النارশব্দের সিফাত (বিশেষণ)। অর্থাৎ, গর্ত কি ধরনের ছিল? ইন্ধনপূর্ণ অগ্নি। যা ঈমানদারদেরকে নিক্ষেপ করার জন্য প্রজ্বলিত করা হয়েছিল।

اِذۡ هُمۡ عَلَيۡهَا قُعُوۡدٌ

৬. যখন তারা এর পাশে উপবিষ্ট ছিল;

وَّ هُمۡ عَلٰی مَا یَفۡعَلُوۡنَ بِالۡمُؤۡمِنِیۡنَ شُهُوۡدٌ

৭. এবং তারা মুমিনদের সাথে যা করছিল তা প্রত্যক্ষ করছিল।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হতে এ বিষয়ে যে দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেছেন সংক্ষেপে তা নিম্নরূপ :
প্রাক-ইসলামী যুগের জনৈক বাদশাহর একজন জাদুকর ছিল। জাদুকর বৃদ্ধ হয়ে গেলে তার স্থলাভিষিক্ত হওয়ার জন্য একজন বালককে তার নিকটে জাদুবিদ্যা শেখার জন্য নিযুক্ত করা হয়। যাতায়াতের পথে একটি গীর্জায় একজন ঈসায়ী ধর্মযাজক ছিলেন। বালকটি দৈনিক তার কাছে বসত। ঈসায়ী ধর্মযাজকের বক্তব্য শুনে সে ঈসায়ী হয়ে যায়। কিন্তু তা গোপন রাখে। একদিন দেখা গেল যে, বড় একটি হিংস্র জন্তু (সিংহ) রাস্তা আটকে দিয়েছে। লোকেরা ভয়ে আগাতে পারছে না। বালকটি মনে মনে বলল, আজ আমি দেখব, পাদ্রীর দাওয়াত সত্য, না জাদুকরের দাওয়াত সত্য। সে একটি পাথরের টুকরা হাতে নিয়ে বলল,- 'হে আল্লাহ! যদি পাদ্রীর দাওয়াত তোমার নিকটে জাদুকরের দাওয়াতের চাইতে অধিক পসন্দনীয় হয়, তাহলে এই জন্তুটাকে তুমি মেরে ফেল, যাতে লোকেরা যাতায়াত করতে পারে' বলেই সে পাথরটি নিক্ষেপ করল এবং জন্তুটি সাথে সাথে মারা পড়ল। এখবর পাদ্রীর কানে পৌঁছে গেল। তিনি বালকটিকে ডেকে বললেন, 'হে বৎস! তুমি আমার চাইতে উত্তম। তুমি অবশ্যই সত্বর পরীক্ষায় পতিত হবে। যদি হও, তবে আমার কথা বলো না'। বালকটির কারামত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তার মাধ্যমে অন্ধ ব্যক্তি চোখ ফিরে পেত। কুষ্ঠরোগী সুস্থ হত এবং অন্যান্য বহু রোগ ভাল হয়ে যেত। ঘটনাক্রমে বাদশাহর এক মন্ত্রী ঐ সময় অন্ধ হয়ে যান। তিনি বহুমূল্য উপঢৌকনাদি নিয়ে বালকটির নিকটে আগমন করেন। বালকটি তাকে বলে- 'আমি কাউকে রোগমুক্ত করি না। এটা কেবল আল্লাহ করেন। এক্ষণে যদি আপনি আল্লাহর উপরে বিশ্বাস স্থাপন করেন, তাহলে আমি আল্লাহর নিকটে দো'আ করব। অতঃপর তিনিই আপনাকে সুস্থ করবেন'। মন্ত্রী ঈমান আনলেন। বালক দো'আ করল। অতঃপর তিনি চোখের দৃষ্টি ফিরে পেলেন। পরে রাজদরবারে গেলে বাদশাহর প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে, আমার পালনকর্তা আমাকে সুস্থ করেছেন। বাদশাহ বলেন, তাহলে আমি কে? মন্ত্রী বললেন, لا، بل ربى وربك الله- 'না। বরং আমার ও আপনার পালনকর্তা হলেন আল্লাহ। তখন বাদশাহর হুকুমে নির্যাতন শুরু হয়। এক পর্যায়ে তিনি উক্ত বালকের নাম বলে দেন। তখন বালককে ধরে এনে একই প্রশ্নের একই জবাব পেয়ে তার উপরেও চালানো হয় কঠোর নির্যাতন। ফলে এক পর্যায়ে সে পাদ্রীর কথা বলে দেয়। তখন বৃদ্ধ পাদ্রীকে ধরে আনলে তিনিও একই জওয়াব দেন। বাদশাহ তাদেরকে ধর্ম ত্যাগ করতে বললে তারা অস্বীকার করেন। তখন পাদ্রী ও মন্ত্রীকে জীবন্ত করাতে চিরে তাদের মাথাসহ দেহকে দু'ভাগ করে ফেলা হয়। এরপর বালকটিকে পাহাড়ের চূড়া থেকে ফেলে দিয়ে মেরে ফেলার হুকুম দেয়া হয়। কিন্তু তাতে বাদশাহর লোকেরাই মারা পড়ে। অতঃপর তাকে নদীর মধ্যে নিয়ে নৌকা থেকে ফেলে দিয়ে পানিতে ডুবিয়ে মারার হুকুম দেওয়া হয়। কিন্তু সেখানেও বালক বেঁচে যায় ও বাদশাহর লোকেরা ডুবে মরে। দু'বারেই বালকটি আল্লাহর নিকটে দো'আ করেছিল, اَللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ 'হে আল্লাহ! এদের হাত থেকে আমাকে রক্ষা কর যেভাবে তুমি চাও'। পরে বালকটি বাদশাহকে বলে, আপনি আমাকে কখনোই মারতে পারবেন

না, যতক্ষণ না আপনি আমার কথা শুনবেন। বাদশাহ বললেন, কি সে কথা? বালকটি বলল, আপনি সমস্ত লোককে একটি ময়দানে জমা করুন। অতঃপর একটা তীর নিয়ে আমার দিকে নিক্ষেপ করার সময় বলুন, بِاسْمِ اللهِ رَبِّ الْغُلاَمِ ‘বালকটির পালনকর্তা আল্লাহর নামে’। বাদশাহ তাই করলেন এবং বালকটি মারা পড়ল। তখন উপস্থিত হাযার হাযার মানুষ সমস্বরে বলে উঠল, آمَنَّا بِرَبِّ هَذَا الْغُلاَمِ ‘আমরা বালকটির প্রভুর উপরে ঈমান আনলাম’। তখন বাদশাহ বড় বড় ও দীর্ঘ গর্ত খুঁড়ে বিশাল অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করে সবাইকে হত্যা করেন। নিক্ষেপের আগে প্রত্যেককে তাওহীদ বর্জনের বিনিময়ে মুক্তির কথা বলা হয়। কিন্তু কেউ তা মানেনি। শেষ দিকে একজন মহিলা তার শিশু সন্তান কোলে নিয়ে ইতস্ততঃ করছিলেন। হঠাৎ কোলের অবোধ শিশুটি বলে ওঠে, ‘ধৈর্য ধরো মা! কেননা তুমি সত্যের উপরে আছো’। তখন বাদশাহর লোকেরা মা ও শিশুপুত্রকে একসাথে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করে’। তিরমিযীর বর্ণনা অনুযায়ী ঐদিন ৭০ হাযার মানুষকে পুড়িয়ে মারা হয় (সনদ জাইয়িদ)। তবে একথাটি রাবী ছোহায়েব রূমীর হতে পারে। কেননা তাঁর নিকট নাছারাদের ইলম ছিল [ইবনে কাসীর]।

[ইমাম আহমাদ ২৩৯৭৬, মুসলিম ৩০০৫, তিরমিযী *৩৩৪০*]

শিক্ষণীয় বিষয় :উপরে বর্ণিত কাহিনীর প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহপাক অত্র আয়াতগুলি নাযিল করেন ও মক্কার নির্যাতিত মুসলমানদের সান্ত্বনা দেন। এই হৃদয়বিদারক ঘটনা বর্ণনা করে রাসূল (সাঃ) স্বীয় সাহাবা ও উম্মতকে সাবধান করেছেন যেন তারা দুনিয়াবী লাভের চিন্তায় শাসন-নির্যাতনের মুখে ঈমান থেকে বিচ্যুত না হয় এবং আখেরাতকে হাতছাড়া না করে।

উক্ত ঘটনায় দেখা গেছে যে, ঐ বৃদ্ধ পাদ্রী ও মন্ত্রীকে মাথায় করাত দিয়ে জীবন্ত চিরে দু’ভাগ করে ফেলা হয়েছে। তথাপি তারা ঈমান ত্যাগ করেননি। ছোট্ট বালকটির ঈমান ও ধৈর্য আরও বেশী বিস্ময়কর। সে বাদশাহকে নিজের মৃত্যুর পদ্ধতি বলে দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে যে, মৃত্যুবরণের চেয়ে সত্যকে রক্ষা করা তার নিকটে অনেক বেশী মূল্যবান। বস্ত্তত: বালকটির এই সত্যনিষ্ঠা ও হাসিমুখে মৃত্যুবরণের দৃশ্য হাযার হাযার মানুষের হৃদয়কে উদ্বেলিত করে এবং তারা সবাই সাথে সাথে মুসলমান হয়ে যায়। পরবর্তীতে তারাও হাসিমুখে ঈমানের বিনিময়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে। একেই বলে ‘জীবনের চেয়ে দীপ্ত মৃত্যু তখনি জানি, শহীদী রক্তে হেসে ওঠে যবে যিন্দেগানি’।

বালকটিকে হত্যার পরপরই তার অনুসারী হাজার হাজার নারী-পুরুষকে শিরক বর্জন করে তাওহীদ বরণ করার অপরাধে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছিল। রাসূল (সাঃ)-এর যুগে খুবায়েব, আসেম, ইয়াসির পরিবার কি এর অন্যতম উদাহরণ নয়? যুগে যুগে ক্বিয়ামত পর্যন্ত এরূপ অত্যাচার-নির্যাতন মুমিন নর-নারীর উপর হতে থাকবে। এরপরেও ইসলাম যিন্দা থাকবে।

وَ مَا نَقَمُوۡا مِنۡهُمۡ اِلَّاۤ اَنۡ یُّؤۡمِنُوۡا بِاللّٰهِ الۡعَزِیۡزِ الۡحَمِیۡدِ

৮. আর তারা তাদেরকে নির্যাতন করেছিল শুধু এ কারণে যে, তারা ঈমান এনেছিল পরাক্রমশালী ও প্রশংসার যোগ্য আল্লাহর উপর—

الَّذِیۡ لَهٗ مُلۡکُ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ ؕ وَ اللّٰهُ عَلٰی کُلِّ شَیۡءٍ شَهِیۡدٌ

৯. আসমানসমূহ ও যমীনের সর্বময় কর্তৃত্ব যাঁর; আর আল্লাহ্ সবকিছুর প্রত্যক্ষদর্শী।

অর্থাৎ উক্ত মজলুম মানুষগুলির একমাত্র অপরাধ ছিল আল্লাহর উপর ঈমান আনা। আর একারণেই তাদের উপরে প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছিল। যদি তারা যুগ যুগ ধরে চলে আসা বাপ-দাদার ধর্মের উপরে টিকে থাকত এবং আল্লাহর উপরে ঈমান না আনতো, তাহলে তাদের উপরে এই জুলুম নেমে আসত না।

এখানে আল্লাহ স্বীয় ছিফাত হিসাবে 'আযীয' (মহাপরাক্রান্ত) ও 'হামীদ' (মহাপ্রশংসিত) এনেছেন। অতঃপর বলেছেন, যার হাতে রয়েছে আসমান ও যমীনের মালিকানা এবং তিনি সবকিছু দেখছেন। একথাগুলির মধ্যে জালেমদের প্রতি প্রচ্ছন্ন হুমকি রয়েছে। বরং প্রকাশ্যেই বলে দেয়া হয়েছে যে, অত্যাচারী যত বড় শক্তিশালী হৌক না কেন, তার অত্যাচার প্রতিরোধে তিনি 'আযীয' বা মহাপরাক্রান্ত। আর মজলুমের পক্ষে যালেমদের বদলা নেয়ার জন্য তিনি 'হামীদ' বা চির প্রশংসিত। আসমান ও যমীনের বাইরে পালাবার কোন ক্ষমতা যালেমদের নেই। আর এসবের উপরেই রয়েছে আল্লাহর একচ্ছত্র আধিপত্য ও নিরংকুশ মালিকানা। তাই যে কোনভাবেই হউক আল্লাহ যালেমদের প্রতিশোধ নেবেনই।

وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ 'বস্তুতঃ আল্লাহ সবকিছু প্রত্যক্ষ করছেন'। তিনি তার সৃষ্টজীবের কর্মসমূহ জানেন। তাঁর নিকট কোন কিছুই গোপন থাকেনা'। এর দ্বারা জালেম ও মজলুম উভয়কে হুঁশিয়ার করা হয়েছে। জালেম যেন জুলুম না করে এবং মজলুম যেন ধৈর্য হারিয়ে কুফরী না করে। বরং জালেমদের জানা উচিত যে, তাদের এই জুলুম হল উম্মতের জাগৃতির সোপান। মজলুমকে তাই আল্লাহর উপর ঈমান রেখে সকল প্রকার বৈধ পথে জালেমকে রুখে দাঁড়াবার সার্বিক প্রস্তুতি নিতে হবে (আনফাল ৬০)।

إِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَ لَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ

১০. নিশ্চয় যারা মুমিন নরনারীকে বিপদাপন্ন করেছে তারপর তাওবা করেনি তাদের জন্য আছে জাহান্নামের যন্ত্রণা।

فَتَنُوا শব্দের এক অর্থ হচ্ছে, أحرقوا বা জ্বালিয়েছিল। অপর অর্থ পরীক্ষা করা। বিপদে ফেলা। [ফাতহুল কাদীর]

কাফেরদের জাহান্নামের আযাব ও দহন যন্ত্রণার খবর দেয়ার সাথে সাথে কুরআন বলছে যে, এই আযাব তাদের ওপর পতিত হবে, যারা এই দুষ্কর্মের কারণে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করেনি। এতে তাদেরকে তাওবার দাওয়াত দেয়া হয়েছে। হাসান বসরী বলেনঃ বাস্তবিকই আল্লাহর অনুগ্রহ ও কৃপার কোন তুলনা নেই। তারা তো আল্লাহর নেক বান্দাদেরকে জীবিত দগ্ধ করে তামাশা দেখছে, আল্লাহ তা'আলা এরপরও তাদেরকে তওবা ও মাগফিরাতের দাওয়াত দিচ্ছেন। [ইবনুল কাইয়্যেম, বাদায়ে'উস তাফসীর; ইবন কাসীর]

এখানে অত্যাচারী কাফেরদের শাস্তি বর্ণিত হয়েছে, যারা মুমিনদেরকে কেবল ঈমানের কারণে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেছিল। শাস্তি প্রসঙ্গে দুটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে— (এক) তাদের জন্যে আখেরাতে জাহান্নামের আযাব রয়েছে, (দুই) তাদের জন্যে দহন যন্ত্রণা রয়েছে। এখানে দ্বিতীয়টি প্রথমটিরই বর্ণনা ও তাকীদ হতে পারে। অর্থাৎ জাহান্নামে গিয়ে তারা চিরকাল দহন যন্ত্রণা ভোগ করবে। এটাও সম্ভবপর যে, দ্বিতীয় বাক্যে দুনিয়ার শাস্তি বর্ণিত হয়েছে। প্রখ্যাত আলেম রবী ইবনে আনাস বলেন, মুমিনদেরকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করার পর অগ্নি স্পর্শ করার পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা তাদের রূহ কবজ করে নেন। এভাবে তিনি তাদেরকে দহন যন্ত্রণা থেকে রক্ষা করেন। ফলে তাদের মৃতদেহই কেবল অগ্নিতে দগ্ধ হয়। অতঃপর এই অগ্নি আরও বেশি প্রজুলিত হয়ে তার লেলিহান

শিখা শহরে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে যারা মুসলিমদের অগ্নি দগ্ধ হওয়ার তামাশা দেখছিল, তারাও এই আগুনে পুড়ে ভস্ম হয়ে যায়। [ফাতহুল কাদীর]

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۬ؕ ذٰلِکَ الْفَوْزُ الْکَبِیْرُ

১১. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; এটাই মহাসাফল্য।

যারা বাপ-দাদার আমল থেকে চলে আসা কুসংস্কার ছেড়ে খালেস তাওহীদে বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, সেইসব ঈমানদার নর-নারীকে যেসব যালেমরা অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করে হত্যা করেছে, একইভাবে মক্কার মুশরিক নেতারা এবং পরবর্তীকালে যেসব যালেমরা শক্তির জোরে ঈমানদারগণের উপরে জুলুম করে চলেছে, ঐসব ঈমানদার ও সৎকর্মশীল মানুষের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত করে রেখেছেন শান্তিময় জান্নাত, যার নীচ দিয়ে প্রবাহিত হয় নদী ও ঝর্ণাসমূহ এবং এটাই হল সবচেয়ে বড় সফলতা। যালেমদের দৃষ্টিতে ঈমানদাররা পরাজিত ও ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু আল্লাহর দৃষ্টিতে ঈমানদারগণ জয়ী ও সফল হয়েছে।

আল্লাহপাক অত্র আয়াতে ঈমানদার ও সৎকর্মশীল নর-নারীদের জন্য আগাম সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। জান্নাত যেন অপেক্ষায় আছে ঈমানদার নর-নারীদের পাবার জন্য। ক্বিয়ামতের দিন যখন তারা সেখানে প্রবেশ করবে, তখন দাররক্ষীসহ চারিদিক থেকে ফেরেশতাগণের অভিবাদনের আওয়ায আসবে সালাম আর সালাম। 'আপনাদের উপর সালাম। আসুন! শান্তির সাথে চিরকালের জন্য এখানে প্রবেশ করুন'।[যুমার ৭৩; ফুরক্বান ৭৫; ইউনুস ৯-১০] নিঃসন্দেহে এটিই হল বড় সফলতা। দুনিয়ায় যার কোন তুলনা নেই।

اِنَّ بَطْشَ رَبِّکَ لَشَدِیْدٌ

১২. নিশ্চয় আপনার রবের পাকড়াও বড়ই কঠিন।

এটি পূর্ববর্তী শপথের জওয়াব হিসাবে এসেছে অর্থাৎ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ 'নক্ষত্রশোভিত আকাশের শপথ' বলার পরে মধ্যবর্তী বাক্যগুলি শপথের তাকীদ হিসাবে এসেছে। হাকীম তিরমিযীও একথা বলেছেন। অর্থাৎ যারা রাসূল (সাঃ)-কে অবিশ্বাস করে বা তাঁর আনীত শরী'আতের অবাধ্যতা করে এবং ঈমানদার নর-নারীদের উপর যুলুম করে, তাদের বিরুদ্ধে শপথ করে আল্লাহ বলছেন যে, অবশ্যই তোমার প্রভুর পাকড়াও অত্যন্ত কঠিন। যখন তিনি ধরবেন, তখন সেখান থেকে নিষ্কৃতির কোন পথ আর থাকবে না। অতএব সাবধান হও হে মানুষ! তওবা করে যুলুম ও অবাধ্যতা 'তে নিবৃত্ত হও! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত হও!!

আল্লাহ বলেন, 'যারা আমাদের আয়াতসমূহে মিথ্যারোপ করে, আমরা তাদের অজান্তে ধীরে ধীরে তাদের পাকড়াও করি'। 'আমি তাদেরকে অবকাশ দেই। নিশ্চয়ই আমার কৌশল অত্যন্ত মযবুত' (আ'রাফ ১৮২-৮৩; ক্বলম ৪৪-৪৫)। তিনি বলেন,'আর এভাবেই তোমার প্রতিপালক অত্যাচারী জনপদকে পাকড়াও করেন। নিঃসন্দেহে তাঁর পাকড়াও অত্যন্ত মর্মন্তুদ ও কঠোর' (হূদ ১০২)। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ যালেমকে অবকাশ

দেন। অবশেষে যখন তিনি তাকে ধরেন, তখন আর সুযোগ দেন না। অতঃপর তিনি হূদ ১০২ আয়াতটি পাঠ করেন'। [বুখারী ৪৬৮৬; মুসলিম ২৫৮৩]

اِنَّهٗ هُوَ يُبۡدِئُ وَ يُعِيۡدُ

১৩. তিনিই অস্তিত্ব দান করেন ও পুনরাবর্তন ঘটান,

অর্থাৎ যাবতীয় সৃষ্টির সূচনা তিনিই করেছেন এবং সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবার পরে তিনিই আবার পুনরুত্থান ঘটাবেন। মানুষ মরে মাটি হয়ে যাবে। কিন্তু তাঁর হুকুমে ক্বিয়ামতের দিন সবাই পুনর্জীবিত হবে। আর যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেন, তাঁর পক্ষে পুনরায় সৃষ্টি করা খুবই সহজ। আল্লাহ বলেন, 'তিনিই সৃষ্টির সূচনা করেন। অতঃপর তার পুনরাবৃত্তি করবেন। আর এটি তাঁর জন্য অতীব সহজ। নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে সর্বোচ্চ স্থান তাঁরই। তিনি মহাপরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়' (রূম ২৭)।

وَ هُوَ الۡغَفُوۡرُ الۡوَدُوۡدُ

১৪. এবং তিনি ক্ষমাশীল, অতিস্নেহময়,

الْوَدُود শব্দটির কয়েকটি অর্থ বর্ণিত আছে। কারও কারও মতে, 'ওয়াদূদ' বলা হয় তাকে যার কোন সন্তান নেই। অর্থাৎ যার এমন কেউ নেই। যার প্রতি মন টানতে থাকবে। তবে অধিকাংশ মুফাস্‌সিরের মতে এর অর্থ, প্রিয় বা প্রিয়পাত্র। যার ভালবাসায় কোন খাদ নেই। যারা তাঁকে ভালবাসেন তিনিও তাদেরকে ভালবাসেন। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, "তিনি তাদেরকে ভালবাসেন আর তারাও তাঁকে ভালবাসে"। [সূরা আল-মায়েদাহ: ৫৪] তিনি এমন সত্তা যাঁকে তার ভালবাসার পাত্ররা এমন ভালবাসে যে ভালবাসার কোন উদাহরণ দেয়া সম্ভব হয় না। যার কোন তুলনা নেই। তাঁর খালেস বান্দাদের অন্তরে তাঁর যে ভালবাসা রয়েছে সেটার তুলনা কোন ভালবাসা দিয়ে দেয়া যাবে না। আর এজন্যই ভালবাসা হচ্ছে আল্লাহর দাসত্বের মূল কথা। যে ভালবাসার কারণে যাবতীয় ভালবাসার পাত্রের উপর সেটা স্থান করে নেয়। অন্য ভালবাসা যদি আল্লাহর ভালবাসার অনুগামী না হয় তবে সেটা বান্দার জন্য বিপদ ও শাস্তির কারণ হয়। [তাফসীরে জাকারিয়া]

ذُو الۡعَرۡشِ الۡمَجِيۡدُ

১৫. আরশের অধিকারী ও সম্মানিত।

অর্থাৎ, তিনি সমস্ত সৃষ্টি হতে সুমহান এবং সুউচ্চ। 'আরশ' যা সব থেকে উচ্চে অবস্থিত, যার উপরে আল্লাহ আছেন। যেমন সাহাবাগণ, তাবেয়ীনগণ এবং মুহাদ্দিসগণদের এ বিশ্বাস। الْمَجِيدُ শব্দের অর্থ হল মর্যাদাবান ও গৌরবময়। [তাফসীরে আহসানুল বায়ান]

"আরশের মালিক" বলে মানুষের মধ্যে এ অনুভূতি জাগানো হয়েছে যে তিনি যেহেতু আরশের মালিক। আর আরশ সবকিছুর উপরে। তাই তিনিও সবকিছুর উপরে। সবকিছু মহান আল্লাহর আরশের সামনে অতি নগন্য। বরং সমস্ত আসমান, যমীন ও কুরসী সবগুলোকেই আরশ শামিল করে। [সা'দী] কাজেই তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে কেউ তার হাত থেকে নিস্তার পেতে পারে না। "শ্রেষ্ঠ সম্মানিত" বলে এ ধরনের বিপুল মর্যাদাসম্পন্ন সত্তার প্রতি অশোভন আচরণ করার হীন মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে মানুষকে সতর্ক করা হয়েছে। তাছাড়া এটি আরশের গুণও হতে পারে। [ইবনে কাসীর]

فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ

১৬. তিনি যা ইচ্ছে তা-ই করেন।

অর্থাৎ, তিনি যা চান তা বাস্তবে করে থাকেন। তাঁর আদেশ ও চাহিদাকে রুখার সাধ্য কারো নেই। আর না কেউ তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করার ক্ষমতা রাখে। আবু বাকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর মৃত্যু রোগের সময় তাঁকে কেউ জিজ্ঞাসা করল যে, আপনাকে কি কোন ডাক্তার দেখেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। সে বলল, তিনি কি বলেছেন? আবূ বাকর (রাঃ) বললেন, তিনি বলেছেন, إني فعّال لما أريد অর্থাৎ, আমি যা চাই, তাই করি। আমার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার মত কেউ নেই।

هَلۡ اَتٰىکَ حَدِیۡثُ الۡجُنُوۡدِ

১৭. আপনার কাছে কি পৌছেছে সৈন্যবাহিনীর বৃত্তান্ত—

فِرۡعَوۡنَ وَ ثَمُوۡدَ

১৮. ফিরআউন ও সামুদের?

অত্র আয়াতে স্বীয় রাসূলকে সান্ত্বনা দিয়ে আল্লাহ বলেন, ফেরাঊন ও তার বিশাল সেনাদলকে এবং দুর্ধর্ষ সামুদ জাতিকে আমি চোখের পলকে ধ্বংস করেছি এবং তাদের নাম-নিশানা মুছে দিয়েছি তাদের সীমাতিরিক্ত বাড়াবাড়ির কারণে। অতএব হে রাসূল! তুমি ভয় পাবে না। তোমার প্রতিপক্ষ মক্কার কাফেররা তাদের তুলনায় কিছুই নয়। তাদের বাড়াবাড়ির পরিণামও বিগত জাতিগুলোর মতই হবে। ওরা তোমার কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। যেমন পারেনি সামুদ জাতির নবী সালেহ এবং ফেরাঊনের কাছে প্রেরিত নবী মূসা ও হারুনের। এখানে সামুদ ও ফেরাঊনকে নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করার কারণ হল সামুদ ছিল আরবদের একটি জাতি। যাদের ধ্বংসলীলার ঘটনা আরবদের নিকটে প্রসিদ্ধ ছিল। অন্যদিকে ফেরাঊনের ঘটনা ছিল মিসরের এবং তা কিতাবধারী ইহুদী-নাছারাদের নিকটে খুবই পরিচিত ছিল।

بَلِ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا فِیۡ تَکۡذِیۡبٍ

১৯. তবু কাফিররা মিথ্যারোপ করায় রত;

وَّ اللّٰہُ مِنۡ وَّرَآئِہِمۡ مُّحِیۡطٌ

২০. আর আল্লাহ্ সবদিক থেকে তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন।

মক্কার কাফেররা সামূদ, ফেরাঊন প্রমুখ বিগত কাফেরদের মন্দ পরিণতি জানা সত্ত্বেও শেষনবী মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর উপরে মিথ্যারোপে লিপ্ত রয়েছে। তাই এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। বরং এদের মিথ্যারোপ পূর্বেকার সকল মিথ্যারোপের চাইতে বেশী। অথচ তারা বিলক্ষণ জানে যে, তারা চারিদিক থেকে আল্লাহর ঘেরাওয়ের মধ্যে রয়েছে। তাঁর পাকড়াও থেকে বাঁচার ক্ষমতা যেমন ফেরাঊন ও সামূদ জাতির হয়নি, তেমনি মক্কার কাফেরদের এমনকি কোন যুগের কাফির-মুনাফিকদের হবে না। একথা বলার মাধ্যমে আল্লাহ সকল যুগের ঈমানদার নর-নারীর উপরে ও ইসলামের প্রচার ও প্রসারে নিবেদিতপ্রাণ নেতৃবৃন্দের উপরে নির্যাতনকারী কাফের ও ফাসেকদের হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন।

وَرَآئِهِمْ مِنْ অর্থ 'তাদের পিছন থেকে'। যেমন অন্য আয়াতে এসেছে, وَرَاءَ ظَهْرِهِ 'তার পিঠের পিছন থেকে' (ইনশিক্বাক্ব ১০)। অর্থাৎ 'আল্লাহ তাদের সকল কর্ম গণনা করে রাখছেন এবং তিনি সবগুলির যথাযথ বদলা দিবেন'।অথবা এর দ্বারা এটা বুঝানো হয়েছে যে, যালেমরা পিছন দিক দিয়েও পালাবার পথ পাবে না। সেদিকেও আল্লাহ তাদের ঘিরে রেখেছেন।

بَلۡ هُوَ قُرۡاٰنٌ مَّجِيۡدٌ

২১. বস্তুত এটা সম্মানিত কুরআন,

فِىۡ لَوۡحٍ مَّحۡفُوۡظٍ

২২. সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ।

একথার মধ্যে অবিশ্বাসীদের প্রতি ধমক ও তাচ্ছিল্য রয়েছে। কারণ তারা আল্লাহর কালামকে দূরে নিক্ষেপ করে নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসারী হয়েছে। অথচ তারা যে কুরআনকে মিথ্যা সাব্যস্ত করছে, তা অতীব পবিত্র ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। এটি কোন সৃষ্ট বস্তু নয়; বরং সরাসরি আল্লাহর কালাম। এটি সর্বোচ্চ স্থানে সুরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ। যাতে কোন বাতিলের প্রবেশাধিকার নেই (হামীম সাজদাহ ৪২) বা কোনরূপ পরিবর্তন ও কমবেশী করার সুযোগ নেই (আন'আম ১১৫; ইউনুস ১৫; কাহফ ২৭)। অতএব কুরআনের উপর কাফেরদের অবিশ্বাস ও মিথ্যারোপে কিছুই যায় আসে না। তারা এর কোনই ক্ষতি করতে পারবে না।

এর মধ্যে মুমিনদের প্রতি উপদেশ রয়েছে, তারা যেন অভ্রান্ত সত্যের উৎস পবিত্র কুরআনকে আঁকড়ে থাকে এবং সার্বিক জীবনে তার অনুসারী হয়ে দুনিয়া ও আখেরাতে সফলকাম হয়।

ফুটনোট

◘ (وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ) বা প্রতিশ্রুত দিনের অর্থ কেয়ামতের দিন।

◘ এই সূরায় শাহেদ ও মাশহুদের শপথ করা হয়েছে। আর مَشْهُود এর অর্থ আরাফার দিন এবং شاهد এর অর্থ শুক্রবার দিন।

◘ যারা বড় বড় গর্তের মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে ঈমানদারদেরকে তার মধ্যে ফেলে দিয়েছিল এবং তাদের জ্বলে পুড়ে মরার বীভৎস দৃশ্য নিজেদের চোখে দেখেছিল তাদেরকে এই সূরায় **'আসহাবুল উখদূদ'** বা গর্তওয়ালা বলা হয়েছে।

◘ গর্তওয়ালারা মুমিনদের সাথে শত্রুতা কোন অধিকার বঞ্চিত হয়ে বা অত্যাচারিত হয়ে করে নাই; বরং মুমিনরা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছিলো এ কারনেই ছিলো তাদের সব শত্রুতা।

◘ যারা মু'মিন পুরুষ ও নারীদের ওপর জুলুম-নিপীড়ন চালায় ও তওবা করেনা, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আযাব এবং এক্ষেত্রে যেহেতু তারা দুনিয়াতে মু'মিন পুরুষ ও নারীদের আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করেছিলো তাই আখিরাতে তাদের শাস্তিও হবে অনুরুপ তবে অধিকতর তীব্র জ্বালা-পোড়ার শাস্তি।

◘ সর্বোত্তম জিহাদ হল জালিম শাসকের কাছে হক কথা বলা।

◘ এই সূরায় দুই ধরনের মানুষের দুই ধরনের পরিনতির কথা রয়েছে- এক, জাহান্নামের আযাব এবং জ্বলে পুড়ে যাওয়ার শাস্তি অর্থাৎ বিফলতা। দুই, জান্নাতের অসীম নিয়ামত এবং সবচাইতে বড় সফলতা।

◘ নির্দোষ মানুষদের কষ্ট দেয়ার শাস্তি কত ভয়াবহ হতে পারে তা বোঝানোর জন্য আল্লাহ তার 'রব' নামটি ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ তাদের পালনকর্তা, মালিক, পরিপূর্ন কর্তৃত্বশীল, বৃদ্ধি নিশ্চিতকারী, অস্তিত্ব রক্ষাকারী, পুরষ্কার প্রদানকারী হওয়ায় তাদের কষ্ট দেওয়ার প্রতিশোধ আল্লাহ কঠিনভাবে গ্রহন করবেন।

◘ আকাশ সমান বড় অপরাধ করেও যদি আল্লাহ তা'আলার কাছে তাওবা করা হয় তবুও আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দেবেন। হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন : দেখ, আল্লাহ তা'আলার দয়া ও উদারতার প্রতি, তারা আল্লাহ তা'আলার কত ওলী ও আনুগত্যশীল বান্দাদেরকে হত্যা করেছে তারপরেও আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাওবার দিকে আহ্বান করছেন। (তাফসীর সা'দী)

◘ কাফিরদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার পাকড়াও বড় কঠিন।

◘ ইতিহাসের সবচাইতে শক্তিশালী, ইসলাম ও খোদাবিরোধী সৈন্যদলের (ফেরাউন ও সামুদের) পরিনতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আল্লাহ এটা বোঝাতে যান যে, আল্লাহর শক্তি ও তার বাহিনীর বিপরীতে ঐসব সেনাদলের কি করুন পরিনতিই না হয়েছিলো! সেই তুলনায় তোমরা (যারা ইসলামের বিরোধিতা করছো) তো অতি নগন্য, তাই তোমাদের পরিনতির কথা ভেবে নাও এবং বিরত হও।

কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২৪
প্রস্তুতি সহায়ক তাফসীর নোট পর্বঃ ৬

সূরা আন নিসা (১-১০)

সূরা আন নিসা কুরআনের চতুর্থ সূরা, এর আয়াত সংখ্যা ১৭৬টি এবং এর রূকুর সংখ্যা ২৪টি। আন নিসা সূরাটি মদিনায় অবতীর্ণ হয়েছে।

নামকরণ

(النِّسَاءِ) নিসা শব্দের অর্থ নারীগণ, মহিলাগণ। এ সূরায় মহিলাদের সাথে বিবাহ বন্ধন, ওয়ারিশসহ তাদের সার্বিক অধিকার ও ইসলাম ধর্মে তাদের মর্যাদার কথা আলোচনা করা হয়েছে বিধায় অত্র সূরার নাম সূরা আন্ নিসা (বা নারীগণ) করা হয়েছে। এ সূরা সম্পূর্ণই মদীনায় অবতীর্ণ হয়।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরাটি কয়েকটি ভাষণের সমষ্টি। সম্ভবত তৃতীয় হিজরীর শেষের দিক থেকে নিয়ে চতুর্থ হিজরীর শেষের দিকে অথবা পঞ্চম হিজরীর প্রথম দিকের সময়-কালের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে এর বিভিন্ন অংশ নাযিল হয়। যদিও নির্দিষ্ট করে বলা যাবে না, কোন আয়াত থেকে কোন আয়াত পর্যন্ত একটি ভাষণের অন্তর্ভুক্ত হয়ে নাযিল হয়েছিল এবং তার নাযিলের সময়টা কি ছিল, তবুও কোন কোন বিধান ও ঘটনার দিকে কোথাও কোথাও এমন সব ইঙ্গিত করা হয়েছে যার সহায়তায় রেওয়ায়াত থেকে আমরা তাদের নাযিলের তারিখ জানতে পারি। তাই এগুলোর সাহায্যে আমরা এসব বিধান ও ইঙ্গিত সম্বলিত এ ভাষণগুলোর মোটামুটি একটা সীমা নির্দেশ করতে পারি। যেমন আমরা জানি উত্তরাধিকার বন্টন ও এতিমদের অধিকার সম্বলিত বিধানসমূহ ওহোদ যুদ্ধের পর নাযিল হয়। তখন সত্তর জন মুসলমান শহীদ হয়েছিলেন। এ ঘটনাটির ফলে মদীনার ছোট জনবসতির বিভিন্ন গৃহে শহীদদের মীরাস কিভাবে বন্টন করা হবে এবং তারা যেসব এতিম ছেলেমেয়ে রেখে গেছেন তাদের স্বার্থ কিভাবে সংরক্ষণ করা হবে, এ প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। এরই ভিত্তিতে আমরা অনুমান করতে পারি, প্রথম চারটি রুকু, ও পঞ্চম রুকূর প্রথম তিনটি আয়াত এ সময় নাযিল হয়ে থাকবে।যাতুর রিকা'র যুদ্ধে ভয়ের নামায (যুদ্ধ চলা অবস্থায় নামায পড়া) পড়ার রেওয়ায়াত আমরা হাদীসে পাই। এ যুদ্ধটি চতুর্থ হিজরীতে সংঘটিত হয়। তাই এখানে অনুমান করা যেতে পারে, যে ভাষণে (১৫ রুকূ') এ নামাযের নিয়ম বর্ণনা করা হয়েছে সেটি এরই কাছাকাছি সময়ে নাযিল হয়ে থাকবে। চতুর্থ হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসে মদীনা থেকে বনী নযীরকে বহিষ্কার করা হয়। তাই যে ভাষণটিতে ইহুদীদেরকে এ মর্মে সর্বশেষ সর্তকবাণী শুনিয়ে দেয়া হয়েছিল যে, আমি তোমাদের চেহারা বিকৃত করে পেছন দিকে ফিরিয়ে দেবার আগে ঈমান আনো, সেটি এর পূর্বে কোন নিকটতম সময়ে নাযিল হয়েছিল বলে শক্তিশালী অনুমান করা যেতে পারে।বনীল মুসতালিকের যুদ্ধের সময় পানি না পাওয়ার কারণে তায়াম্মুমের অনুমতি দেয়া হয়েছিল। আর এ যুদ্ধটি পঞ্চম হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল। তাই যে ভাষণটিতে (৭ম রুকূ') তায়াম্মুমের কথা উল্লেখিত হয়েছিল সেটি এ সময়ই নাযিল হয়েছিল মনে করতে হবে।

নাযিলের উপলক্ষ / প্রেক্ষাপট

এভাবে সামগ্রিক পর্যায়ে সূরাটি নাযিল হওয়ার সময়-কাল জানার পর আমাদের সেই যুগের ইতিহাসের ওপর একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নেয়া উচিত। এর সাহায্যে সূরাটি আলোচ্য বিষয় অনুধাবন করা সহজসাধ্য হবে।নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে সে সময় যেসব কাজ ছিল সেগুলোকে তিনটি বড় বড় বিভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। এক, একটি নতুন ইসলামী সমাজ সংগঠনের বিকাশ সাধন। হিজরতের পরপরই মদীনা তাইয়েবা ও তার আশেপাশের এলাকায় এ সমাজের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে জাহেলিয়াতের পুরাতন পদ্ধতি নির্মূল করে নৈতিকতা, তামাদ্দুন, সমাজরীতি, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা ও রাষ্ট্র পরিচালনা ব্যবস্থা নতুন নীতি-নিয়ম প্রচলনের কর্মতৎপরতা এগিয়ে চলছিল। দুই, আরবের মুশরিক সম্প্রদায়, ইহুদী গোত্রসমূহ ও মুনাফিকদের সংস্কার বিরোধী শক্তিগুলোর সাথে ইসলামের যে ঘোরতর সংঘাত চলে আসছিল তা জারী রাখা। তিন, এ বিরোধী শক্তিগুলোর সকল বাধা উপেক্ষা করে ইসলামের দাওয়াতকে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকা এবং এ জন্য আরও নতুন নতুন ক্ষেত্রে প্রবেশ করে সেখানে ইসলামকে বিজয়ীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করা। এ সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে যতগুলো ভাষণ অবতীর্ণ হয়, তা সবই এই তিনটি বিভাগের সাথে সম্পর্কিত।

আলোচ্য বিষয়

ইসলামের সামাজিক কাঠামো নির্মাণ এবং বাস্তবে এ সমাজ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রথম অবস্থায় যে সমস্ত নির্দেশ ও বিধানের প্রয়োজন ছিল সূরা বাকারায় সেগুলো প্রদান করা হয়েছিল। বর্তমানে এ সমাজ আগের চাইতে বেশী সম্প্রসারিত হয়েছে। কাজেই এখানে আরো নতুন নতুন বিধান ও নির্দেশের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এ প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য সূরা নিসার এ ভাষণগুলোতে মুসলমানরা কিভাবে ইসলামী পদ্ধতিতে তাদের সামাজিক জীবনধারার সংশোধন ও সংস্কার সাধন করতে পারে তা আরো বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে পরিবার গঠনের নীতি বর্ণনা করা হয়েছে। বিয়েকে বিধি-নিষেধের আওতাধীন করা হয়েছে। সমাজে নারী ও পুরুষের সম্পর্কের সীমা নির্দেশ করা হয়েছে। এতিমদের অধিকার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। মীরাস বন্টনের নিয়ম-কানুন নির্ধারিত হয়েছে। অর্থনৈতিক লেনদেন পরিশুদ্ধ করার ব্যাপারে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ঘরোয়া বিবাদ মিটাবার পদ্ধতি শিখানো হয়েছে। অপরাধ দণ্ডবিধির ভিত গড়ে তোলা হয়েছে। মদপানের ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। তাহারাত ও পাক-পবিত্রতা অর্জনের বিধান দেয়া হয়েছে। আল্লাহ ও বান্দার সাথে সৎ ও সত্যনিষ্ঠ মানুষের কর্মধারা কেমন হতে পারে, তা মুসলমানদের জানানো হয়েছে। মুসলমানদের মধ্যে দলীল সংগঠন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত বিধান দেয়া হয়েছে। আহলি কিতাবদের নৈতিক, ধর্মীয় মনোভাব ও কর্মনীতি বিশ্লেষণ করে মুসলমানদের সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন পূর্ববর্তী উম্মতদের পদাংক অনুসরণ করে চলা থেকে বিরত থাকে। মুনাফিকদের কর্মনীতির সমালোচনা করে যথার্থ ও খাঁটি ঈমানদারীর এবং ঈমান ও নিফাকের পার্থক্য সূচক চেহারা পুরোপুরি উন্মুক্ত করে রেখে দেয়া হয়েছে। ইসলাম বিরোধী শক্তিদের সাথে যে সংঘাত চলছিল ওহোদ যুদ্ধের পর তা আরো নাজুক পরিস্থিতির সৃষ্টি করছিল। ওহোদের পরাজয় আশপাশের মুশরিক গোত্রসমূহ, ইহুদী প্রতিবেশীবৃন্দ ও ঘরের শত্রু বিভীষণ তথা মুনাফিকদের সাহস অনেক বাড়িয়ে দিয়েছিল। মুসলমানরা সবদিক থেকে বিপদের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছিল। এ অবস্থায় মহান আল্লাহ একদিকে আবেগময় ভাষণের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে মোকাবিলায় উদ্বুদ্ধ করলেন এবং অন্যদিকে যুদ্ধাবস্থায় কাজ করার জন্য তাদেরকে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলেন। মদীনায় মুনাফিক ও দুর্বল ঈমানদার

লোকেরা সব ধরনের ভীতি ও আশংকার খবর ছড়িয়ে হতাশা ও নৈরাজ্য সৃষ্টির চেষ্টা করছিল। এ ধরনের প্রত্যেকটি খবর দায়িত্বশীলদের কাছে পৌঁছিয়ে দেবার এবং কোন খবর সম্পর্কে পুরোপুরি অনুসন্ধান না করার আগে তা প্রচার করার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করার নির্দেশ দেয়া হয়।মুসলমানদের বারবার যুদ্ধে ও নৈশ অভিযানে যেতে হতো। অধিকাংশ সময় তাদের এমন সব পথ অতিক্রম করতে হতো যেখানে পানির চিহ্নমাত্রও পাওয়া যেতো না। সে ক্ষেত্রে পানি না পাওয়া গেলে অযু ও গোসল দুয়ের জন্য তাদের তায়াম্মুম করার অনুমতি দেয়া হয়। এছাড়াও এ অবস্থায় সেখানে নামায সংক্ষেপে করারও অনুমতি দেয়া হয়। আর যেখানে বিপদ মাথার ওপর চেপে থাকে সেখানে সালাতুল খওফ (ভয়কালীন নামায) পড়ার পদ্ধতি শিখিয়ে দেয়া হয়। আরবের বিভিন্ন এলাকায় যেসব মুসলমান কাফের গোত্রগুলোর মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল এবং অনেক সময় যুদ্ধের কবলেও পড়ে যেতো, তাদের ব্যাপারটি ছিল মুসলমানদের জন্য অনেক বেশী পেরেশানির কারণ। এ ব্যাপারে একদিকে ইসলামী দলকে বিস্তারিত নির্দেশ দেয়া হয় এবং অন্যদিকে ঐ মুসলমানদেরকেও সবদিক থেকে হিজরত করে দারুল ইসলামে সমবেত হতে উদ্বুদ্ধ করা হয়।ইহুদীদের মধ্যে বিশেষ করে বনী নাযীরের মনোভাব ও কার্যধারা অত্যন্ত বিরোধমূলক ও ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। তারা সব রকমের চুক্তির খোলাখুলি বিরুদ্ধাচরণ করে ইসলামের শত্রুদের সাথে সহযোগিতা করতে থাকে এবং মদীনায় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর দলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল বিছাতে থাকে। তাদের এসব কার্যকলাপের কঠোর সমালোচনা করা হয় এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তাদেরকে সর্বশেষ সতর্কবাণী শুনিয়ে দেয়া হয় এবং এরপরই মদীনা থেকে তাদের বহিষ্কারের কাজটি সমাধা করা হয়।মুনাফিকদের বিভিন্ন দল বিভিন্ন কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করে। কোন্ ধরনের মুনাফিকদের সাথে কোন্ ধরনের ব্যবহার করা হবে, এ সম্পর্কে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা মুসলমানদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। তাই এদের সবাইকে আলাদা আলাদা শ্রেণীতে বিভক্ত করে প্রত্যেক শ্রেণীর মুনাফিকদের সাথে কোন্ ধরনের ব্যবহার করতে হবে, তা বলে দেয়া হয়েছে। চুক্তিবদ্ধ নিরপেক্ষ গোত্রসমূহের সাথে মুসলমানদের কোন ধরনের ব্যবহার করতে হবে, তাও সুস্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে। মুসলমানদের নিজেদের চরিত্রকে ত্রুটিমুক্ত করাই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ এ সংঘাত সংঘর্ষে এ ক্ষুদ্র দলটি একমাত্র নিজের উন্নত নৈতিক চরিত্র বলেই জয়লাভ করতে সক্ষম ছিল। এছাড়া তার জন্য জয়লাভের আর কোন উপায় ছিল না। তাই মুসলমানদেরকে উন্নত নৈতিক চরিত্রের শিক্ষা দেয়া হয়েছে। তাদের দলের মধ্যে যে কোন দুর্বলতা দেখা দিয়েছে কঠোর ভাষায় তার সমালোচনা করা হয়েছে। ইসলামের দাওয়াত ও প্রচারের দিকটিও এ সূরায় বাদ যায়নি। জাহেলিয়াতের মোকাবিলায় ইসলাম দুনিয়াকে যে নৈতিক ও তামাদ্দুনিক সংশোধনের দিকে আহবান জানিয়ে আসছিল, তাকে বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করার সাথে সাথে এ সূরায় ইহুদী, খৃস্টান ও মুশরিক এ তিনটি সম্প্রদায়ের ভ্রান্ত ধর্মীয় ধারণা-বিশ্বাস, নৈতিক চরিত্র নীতি ও কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করে তাদের সামনে একমাত্র সত্য দ্বীন ইসলামের দাওয়াত পেশ করা হয়েছে।

পূর্বের ও পরের সূরার সাথে সম্পর্ক

সূরা আলে ইমরানের সর্বশেষ আয়াতটি ছিল তাকওয়া সম্পর্কিত। আর আলোচ্য সূরা 'নিসা'ও শুরু হয়েছে তাকওয়ারই বৈশিষ্ট্য বর্ণনার মাধ্যমে। প্রথমোক্ত সূরায় বিভিন্ন যুদ্ধ-জিহাদ, শত্রুপক্ষের সাথে আচার-আচরণ, যুদ্ধলব্ধ বস্তুসামগ্রীর (গনীমতের মাল) অপচয় ও আত্মসাতের ভয়াবহ পরিণাম প্রভৃতি বর্ণনা করা হয়েছে। আর

আলোচ্য সূরার শুরুতে পারস্পরিক সম্পর্ক এবং অন্যের অধিকার সংক্রান্ত বিধান জারি করা হয়েছে। যেমন– অনাথ-ইয়াতীমের অধিকার, আত্মীয়-স্বজনের অধিকার ও স্ত্রীদের অধিকার প্রভৃতির কথা বলা হয়েছে।

সূরা মায়েদাতেও সূরা নিসার মত মাসআলা-মাসায়েল, লেনদেন, পারস্পরিক চুক্তি অঙ্গীকার ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে। এ কারণেই রূহুল মাআনীর গ্রন্থকার বলেনঃ বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে সূরা বাকারা ও সূরা আলে ইমরান অভিন্ন। কেননা, এ দুটি সূরায় প্রধানত মৌলিক বিবি-বিধান ও আকায়েদ যথা- তওহীদ, রিসালত, কিয়ামত ইত্যাদির বর্ণনা উল্লিখিত হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে অনেক খুঁটিনাটি বিষয়ও বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে সূরা নিসা ও সূরা মায়েদা বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে অভিন্ন। কেননা, এ দুটি সূরায় প্রধানত বিভিন্ন বিধি-বিধানের বিস্তারিত আলোচনা স্থান লাভ করেছে এবং মৌলিক বিধি-বিধান প্রসঙ্গক্রমে বর্ণিত হয়েছে। সূরা নিসায় পারস্পরিক লেনদেন ও বান্দার হকের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর হক, ইয়াতীমের হক, পিতা-মাতা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের প্রাপ্য অধিকারের বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা হয়েছে। সূরা মায়েদার প্রথম আয়াতেও এসব লেন-দেন ও চুক্তি-অঙ্গীকার মেনে চলা ও পূর্ণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ফযীলত

আবূ বকর ইবনু আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (রহঃ) ... আবদুল্লাহ (ইবনু মাসউদ) (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, আমাকে কুরআন তিলাওয়াত করে শোনাও। আমি বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনাকে আমি পড়ে শোনাব, অথচ আপনার উপরেই তো তা নাযিল হয়েছে। তিনি বললেন, অন্য কারো নিকট থেকে শুনতে আমার ভাল লাগে। তখন আমি সূরা নিসা পাঠ করলাম যখন فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا "যখন প্রত্যেক উম্মাত হতে একজন সাক্ষী উপস্থিত করবে এবং তোমাকে ওদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য উপস্থিত করব তখন অবস্থাটা কেমন দাঁড়াবে? (নিসাঃ ৪১) এ আয়াত পৌঁছলাম, আমি মাথা তুললাম কিংবা আমার পাশের এক ব্যাক্তি আমাকে হাত দিয়ে চাপ দিলে আমি আমার মাথা তুললাম। দেখলাম, তাঁর অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে। (মুসলিম ১৭৪০)

আবদুল্লাহ ইবনু রাজা (রহঃ) ... বারা (ইবনু আযির) (রাঃ) থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, সর্বশেষে যে সূরাটি পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় অবতীর্ন হয়েছিলো, তা ছিল সূরা বারাআত। আর সর্বশেষ যে সূরার আয়াতটি সমাপ্তি রুপে অবতীর্ন হয়েছিল সেটি ছিল সূরা নিসার এ আয়াতঃ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ অর্থাৎ 'লোকেরা আপনার কাছে সমাধান জানতে চায়, বলুন, পিতা-মাতাহীন নিঃসন্তান ব্যাক্তি সম্বন্ধে তোমাদিগকে আল্লাহ্ তায়া'লা সমাধান জানোাচ্ছেন, (কোন পুরুষ মারা গেলে সে যদি সন্তানহীন হয় এবং তার এক বোন থাকে তাহলে বোনের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ হবে) (সূরা নিসা ১৭৬)। (বুখারী ৪০২৫)

আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "যে ব্যক্তি সূরা আলে ইমরান পড়বে সে অমুখাপেক্ষী হবে, আর সূরা আন-নিসা হচ্ছে সৌন্দর্যপূর্ণ।" (সুনান দারেমী ৩৩৯৫)

আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: সূরা নিসায় পাঁচটি আয়াত রয়েছে, যদি আমি সারা দুনিয়া পেতাম তাহলে তত খুশি হতাম না যত খুশি হয়েছি এ আয়াতগুলো পেয়ে।আয়াত পাঁচটি হল: ১. "আল্লাহ অণু পরিমাণও জুলুম করেন না।" (সূরা নিসা ৪:৪০) ২. "তোমাদেরকে যে সকল কবীরা গুনাহ থেকে নিষেধ করা

হয়েছে তা হতে বিরত থাকলে ... ” (সূরা নিসা ৪:৩১) ৩. “নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সঙ্গে শরীক করা ক্ষমা করেন না। এটা ব্যতীত অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন।” (সূরা নিসা ৪:৪৮) ৪. “যখন তারা নিজেদের ওপর জুলুম করেছিল তখন যদি তারা তোমার নিকট আসত।” (সূরা নিসা ৪:৬৪) ৫. “যে ব্যক্তি কোন মন্দ কাজ করে অথবা নিজের প্রতি জুলুম পরে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে।” (সূরা নিসা ৪:১১০)। (হাকিম ২/৩০৫, মুরসাল সহীহ)

তাফসীর

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوۡا رَبَّكُمُ الَّذِىۡ خَلَقَكُمۡ مِّنۡ نَّفۡسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ خَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَ بَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالًا كَثِيۡرًا وَّ نِسَآءً ۚ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىۡ تَسَآءَلُوۡنَ بِهٖ وَ الۡاَرۡحَامَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيۡبًا

১. হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবের তাকওয়া অবলম্বন কর যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও তার থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের দুজন থেকে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দেন; আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর যার নামে তোমরা একে অপরের কাছে নিজ নিজ হক দাবী কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়ের ব্যাপারেও। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর পর্যবেক্ষক।

হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবের তাকওয়া অবলম্বন কর - সূরার শুরুতে পারস্পরিক সম্পর্ক এবং অন্যের অধিকার সংক্রান্ত বিধান জারি করা হয়েছে। যেমন- অনাথ ইয়াতীমের অধিকার, আত্মীয়-স্বজনের অধিকার ও স্ত্রীদের অধিকার প্রভৃতির কথা বলা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, হক্কুল-ইবাদ বা অন্যের অধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট এমন কতকগুলো অধিকার রয়েছে, যেগুলো সাধারণতঃ দেশের প্রচলিত আইনের আওতায় পড়ে এবং আইন প্রয়োগের মাধ্যমে তা কার্যকর করা যেতে পারে। সাধারণ ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্রয়-বিক্রয়, ভাড়া ও শ্রমের মজুরী প্রভৃতি এ জাতীয় অধিকার যা মূলতঃ দ্বিপাক্ষিক চুক্তির ভিত্তিতে কার্যকর হয়ে থাকে। এসব অধিকার যদি কোন এক পক্ষ আদায় করতে ব্যর্থ হয় অথবা সেক্ষেত্রে কোন প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়, তাহলে আইন প্রয়োগের মাধ্যমে তার সুরাহা করা যেতে পারে। কিন্তু সন্তান-সন্ততি, পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী, কারো নিজ বংশের ইয়াতীম ছেলে-মেয়ে এবং আত্মীয়-স্বজনের পারস্পরিক অধিকার আদায় হওয়া নির্ভর করে সহানুভূতি, সহমর্মিতা ও আন্তরিকতার উপর। এসব অধিকার তুলাদণ্ডে পরিমাপ করা যায় না। কোন চুক্তির মাধ্যমেও তা নির্ধারণ করা দুষ্কর। সুতরাং এসব অধিকার আদায়ের জন্য আল্লাহ-ভীতি এবং আখেরাতের ভয় ছাড়া দ্বিতীয় আর কোন উত্তম উপায় নেই। আর একেই বলা হয়েছে তাকওয়া।

বস্তুতঃ এই তাকওয়া দেশের প্রচলিত আইন ও প্রশাসনিক শক্তির চেয়ে অনেক বড়। তাই আলোচ্য সূরাটিও তাকওয়ার বিধান দিয়ে শুরু হয়েছে। সম্ভবতঃ এ কারণেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিয়ের খোতবায় এ আয়াতটি পাঠ করতেন। বিয়ের খোতবায় এ আয়াতটি পাঠ করা সুন্নাত। তাকওয়ার হুকুমের সাথে সাথে আল্লাহর অসংখ্য নামের মধ্যে এখানে ‘রব’ শব্দটি ব্যবহার করার মধ্যেও একটি বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। অর্থাৎ

এমন এক সত্তার বিরুদ্ধাচারণ করা কি করে সম্ভব হতে পারে, যিনি সমগ্র সৃষ্টিলোকের লালন-পালনের যিম্মাদার এবং যার রুবুবিয়্যাত বা পালন-নীতির দৃষ্টান্ত সৃষ্টির প্রতিটি স্তরে স্তরে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত।

এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন - ‘একটি ব্যক্তি/প্রাণ’ বলতে মানবকুলের পিতা আদম (আঃ)-কে বুঝানো হয়েছে। আর خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا এতে مِنْهَاথেকে উক্ত প্রাণ অর্থাৎ, আদম (আঃ)-কেই বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, আদম (আঃ) থেকেই তাঁর স্ত্রী হাওয়াকে সৃষ্টি করেন। আদম (আঃ) থেকে হাওয়াকে কিভাবে সৃষ্টি করা হয়, এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, হাওয়া পুরুষ অর্থাৎ, আদম (আঃ) থেকে সৃষ্টি হয়েছেন। অর্থাৎ, তাঁর পাঁজরের হাড় থেকে। অপর একটি হাদীসে বলা হয়েছে যে, ‘‘নারীদেরকে পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর পাঁজরের হাড়ের মধ্যে উপরের হাড়টি অধিক বাঁকা। যদি তা সোজা করতে যাও, তাহলে ভেঙ্গে ফেলবে। আর যদি তুমি তার দ্বারা উপকৃত হতে চাও, তবে তার মধ্যে বক্রতা অবশিষ্ট থাকা অবস্থাতেই উপকৃত হতে পারবে।’’ (বুখারী ৩৩৩১, মুসলিম ১৪৬৮নং)

তাকওয়া অবলম্বন কর রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়ের ব্যাপারেও- আলোচ্য আয়াতের দুটি অর্থ হতে পারে। একটি যা ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে, অর্থাৎ তোমরা আত্মীয়তার সম্পর্কের ব্যাপারে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর। সুতরাং তোমরা আতীয়তার সম্পর্ক ঠিক রাখ। এ অর্থটি ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে। [তাবারী] আয়াতের দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, তোমরা যে আল্লাহ ও আত্মীয়তার সম্পর্কের খাতিরে পরস্পর কোন কিছু চেয়ে থাক। অর্থাৎ তোমরা সাধারণত বলে থাক যে, আমি আল্লাহর ওয়াস্তে এবং আত্মীয়তার সম্পর্কের খাতিরে কোন কিছু তোমার কাছে চাই। সুতরাং দু কারণেই তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর। এ অর্থটি মুজাহিদ থেকে বর্ণিত হয়েছে। [আত-তাফসীরুস সহীহ] পবিত্র কুরআনের আত্মীয়তার সম্পর্ক বুঝানোর জন্য ‘আরহাম’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, যা মূলতঃ একটি বহুবচনবোধক শব্দ। এর একবচন হচ্ছে রাহেম। যার অর্থ জরায়ু বা গর্ভাশয়। অর্থাৎ জন্মের প্রাক্কালে মায়ের উদরে যে স্থানে সন্তান অবস্থান করে। জন্মসূত্রেই মূলতঃ মানুষ পারস্পরিক সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের বুনিয়াদকে ইসলামী পরিভাষায় ‘সেলায়ে-রাহমী’ বলা হয়। আর এতে কোন রকম বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হলে তাকে বলা হয় ‘কেত্বয়ে-রাহমী’। হাদীসে আত্মীয়তার সম্পর্কের উপর বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি তার রিযিকের প্রাচুর্য এবং দীর্ঘ জীবনের প্রত্যাশা করে, তার উচিত আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা। [বুখারীঃ ২০৬৭; মুসলিমঃ ২৫৫৭]

অন্য হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের প্রায় সাথে সাথেই আমিও তার দরবারে গিয়ে হাজির হলাম। সর্বপ্রথম আমার কানে তার যে কথাটি প্রবেশ করল, তা হল এইঃ হে লোক সকল! তোমরা পরস্পর পরস্পরকে বেশী বেশী সালাম দাও। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য মানুষকে খাদ্য দান কর। আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোল এবং রাতের বেলায় সালাতে মনোনিবেশ কর, যখন সাধারণ লোকেরা নিদ্রামগ্ন থাকে। স্মরণ রেখো, এ কথাগুলো পালন করলে তোমরা পরম সুখ ও শান্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। [মুসনাদে আহমাদ: ৫৪৫১ ইবন মাজাহ ৩২৫১] অন্য হাদীসে এসেছে, উম্মুল-মুমিনীন মায়মুনা রাদিয়াল্লাহু আনহা তার এক বাদিকে মুক্ত করে দিলেন। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যখন এ খবর পৌছালেন, তখন তিনি বললেন, তুমি যদি বাদিটি তোমার মামাকে দিয়ে দিতে, তাহলে অধিক পূণ্য লাভ করতে পারতে। [বুখারীঃ ২৫৯৪] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেনঃ কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে সাহায্য করলে সদকার সওয়াব পাওয়া যায়। কিন্তু কোন নিকট

আত্মীয়কে সাহায্য করলে একই সঙ্গে সদকা এবং আত্মীয়তার হক আদায়ের দ্বৈত পূণ্য লাভ করা যায় । [বুখারীঃ ১৪৬৬, মুসলিমঃ ১০০০]

আয়াতের শেষে মানুষের অন্তরকে আত্মীয়-স্বজনের অধিকার আদায়ের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে আল্লাহ বলেন, আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে খুবই সচেতন ও পর্যবেক্ষণকারী। আল্লাহ তোমাদের অন্তরের ইচ্ছার কথাও ভালভাবে অবগত রয়েছেন। কিন্তু যদি লোক লজ্জার ভয়ে অথবা সমাজ ও পরিবেশের চাপে পড়ে আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সুব্যবহার করা হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহর কাছে এর কোন মূল্য নেই।

وَ اٰتُوا الۡیَتٰمٰۤی اَمۡوَالَهُمۡ وَ لَا تَتَبَدَّلُوا الۡخَبِیۡثَ بِالطَّیِّبِ ۪ وَ لَا تَاۡكُلُوۡۤا اَمۡوَالَهُمۡ اِلٰۤی اَمۡوَالِكُمۡ ؕ اِنَّهٗ كَانَ حُوۡبًا كَبِیۡرًا

২. আর ইয়াতীমদেরকে তোমরা তাদের ধন-সম্পদ সমর্পণ করো এবং ভালোর সাথে মন্দ বদল করো না আর তোমাদের সম্পদের সাথে তাদের সম্পদ মিশিয়ে গ্রাস করো না; নিশ্চয় এটা মহাপাপ।

ইয়াতীমদেরকে তোমরা তাদের ধন-সম্পদ সমর্পণ করো- আয়াতে বলা হয়েছে, ইয়াতীমের সম্পদ তাদেরকে যথার্থভাবে বুঝিয়ে দাও। আরবী ‘ইয়াতীম’ শব্দটির অর্থ হচ্ছে- নিঃসঙ্গ। একটি ঝিনুকের মধ্যে যদি একটিমাত্র মুক্তা জন্ম নেয়, তখন একে ‘দুররাতুন-ইয়াতীমাতুন’ বা ‘নিঃসঙ্গ মুক্তা’ বলা হয়ে থাকে। ইসলামী পরিভাষায় যে শিশু-সন্তানের পিতা ইন্তেকাল করে, তাকে ইয়াতীম বলা হয়। ছেলে-মেয়ে বালেগ হয়ে গেলে তাদেরকে ইসলামী পরিভাষায় ইয়াতীম বলা হয় না। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বালেগ হওয়ার পর আর কেউ ইয়াতীম থাকে না। [আবু দাউদঃ ২৮৭৩]

ইয়াতীম যদি পারিতোষিক অথবা উপঢৌকন হিসেবে কিছু সম্পদপ্রাপ্ত হয়, তাহলে ইয়াতীমের অভিভাবকের দায়িত্ব হচ্ছে সেসব মালেরও হেফাজত করা। ইয়াতীমের মৃত পিতা অথবা দেশের সরকার যে-ই উক্ত অভিভাবককে মনোনীত করুক না কেন; তার উপরই ইয়াতীমের সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব বর্তায়। উক্ত অভিভাবকের উচিত, ইয়াতীমের যাবতীয় প্রয়োজন তার গচ্ছিত ধন-সম্পদ থেকে নির্বাহ করা। এ আয়াতে ইয়াতিমের সম্পদ তার হাতে বুঝিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কোন শর্তারোপ করা হয়নি। পক্ষান্তরে পরবর্তী ৬ নং আয়াতে এ সম্পদ তাদের কাছে প্রত্যার্পণ করার জন্য দুটি শর্ত দিয়েছে। এক, ইয়াতীম বালেগ হতে হবে, দুই ভাল-মন্দ বিবেচনা করার ক্ষমতা থাকতে হবে। কারণ, বালেগ হওয়ার পূর্বে তার জ্ঞান ও বুদ্ধি-বিবেচনা সম্পত্তি সংরক্ষণের মত না হওয়াই স্বাভাবিক। দুটো বিষয় তাদের মধ্যে পাওয়া গেলে তাদের সম্পদ তাদের কাছে ফেরৎ দেয়া উচিত। [আদওয়াউল বায়ান]

وَ لَا تَتَبَدَّلُوا الۡخَبِیۡثَ بِالطَّیِّبِ - ‘খাবীস’ বলতে নিকৃষ্ট জিনিস এবং ‘ত্বাইয়্যিব’ বলতে উৎকৃষ্ট জিনিসকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, এমন করো না যে, তাদের মাল থেকে উৎকৃষ্ট জিনিসগুলো নিয়ে তার পরিবর্তে নিকৃষ্ট জিনিস দিয়ে গুনতি পূরণ করে দেবে। এই নিকৃষ্ট জিনিসগুলোকে খাবীস (নাপাক) এবং উৎকৃষ্ট জিনিসগুলোকে ত্বাইয়্যিব (পবিত্র) আখ্যা দিয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এইভাবে পরিবর্তন করা মাল যদিও প্রকৃতপক্ষে ত্বাইয়্যিব (পবিত্র ও হালাল), তবুও তোমাদের বিশ্বাসঘাতকতা তাকে অপবিত্র করে দিয়েছে। কাজেই এখন তা আর পবিত্র

নেই, বরং তোমাদের জন্য তা অপবিত্র ও হারাম হয়ে গেছে। অনুরূপ বেঈমানী করে তাদের মালকে নিজের মালের সাথে মিশ্রিত করে খাওয়াও নিষেধ। [তাফসীরে আহসানুল বায়ান]

এ আয়াতে ইয়াতিমের সম্পদ গ্রাস করাকে বড় গুনাহ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু গোনাহের পরিণাম সম্পর্কে এখানে কিছু বলা হয়নি। এ সূরারই ১০ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সেটা ঘোষণা করে বলেছেন, "যারা ইয়াতীমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে তারা তো তাদের পেটে আগুনই খাচ্ছে, তারা অচিরেই জ্বলন্ত আগুনে জ্বলবে।"

وَ اِنۡ خِفۡتُمۡ اَلَّا تُقۡسِطُوۡا فِی الۡیَتٰمٰی فَانۡکِحُوۡا مَا طَابَ لَکُمۡ مِّنَ النِّسَآءِ مَثۡنٰی وَ ثُلٰثَ وَ رُبٰعَ ۚ فَاِنۡ خِفۡتُمۡ اَلَّا تَعۡدِلُوۡا فَوَاحِدَۃً اَوۡ مَا مَلَکَتۡ اَیۡمَانُکُمۡ ؕ ذٰلِکَ اَدۡنٰۤی اَلَّا تَعُوۡلُوۡا

৩. আর যদি তোমরা আশংকা কর যে, ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তবে বিয়ে করবে নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভাল লাগে, দুই, তিন বা চার আর যদি আশংকা কর যে সুবিচার করতে পারবে না তবে একজনকেই বা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীকেই গ্রহণ কর। এতে পক্ষপাতিত্ব না করার সম্ভাবনা বেশী।

এ আয়াতে ইয়াতীম মেয়েদের বৈবাহিক জীবনের যাবতীয় অধিকার সংরক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সাধারণ আইন-কানুনের মত তা শুধু প্রশাসনের উপর ন্যস্ত করার পরিবর্তে জনসাধারণের মধ্যে আল্লাহ-ভীতির অনুভূতি জাগ্রত করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, যদি ইনসাফ করতে পারবে না বলে মনে কর, তাহলে ইয়াতীম মেয়েদেরকে বিয়ে করবে না; বরং সে ক্ষেত্রে অন্য মেয়েদেরকেই বিয়ে করে নেবে। এ কথা বলার সাথে সাথে সরকারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের দায়িত্বের কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। যাতে ইয়াতীম ছেলে-মেয়েদের কোন প্রকার অধিকার ক্ষুন্ন না হয় সে ব্যাপারে পুরোপুরি সচেতন থাকার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

জাহেলিয়াত যুগে ইয়াতীম মেয়েদের অধিকার চরমভাবে ক্ষুন্ন করা হত। যদি কোন অভিভাবকের অধিনে কোন ইয়াতীম মেয়ে থাকত আর তারা যদি সুন্দর হত এবং তাদের কিছু সম্পদ-সম্পত্তিও থাকত, তাহলে তাদের অভিভাবকরা নামমাত্র মাহর দিয়ে তাদেরকে বিয়ে করে নিত অথবা তাদের সন্তানদের সাথে বিয়ে দিয়ে সম্পত্তি আত্মসাৎ করার চক্রান্ত করত। এসব অসহায় মেয়েদের পূর্ণ অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থার কথা তারা চিন্তাও করত না। আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত আছে যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ঠিক এ ধরণের একটি ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। জনৈক ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে একটি ইয়াতীম মেয়ে ছিল। সে ব্যক্তির একটি বাগান ছিল, যার মধ্যে উক্ত ইয়াতীম বালিকাটিরও অংশ ছিল। সে ব্যক্তি উক্ত মেয়েটিকে বিয়ে করে নিল এবং নিজের পক্ষ থেকে দেন-মাহর আদায় তো করলই না, বরং বাগানে মেয়েটির যে অংশ ছিল তাও সে আত্মসাৎ করে নিল। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়। [বুখারীঃ ৪৫৭৩]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, তখনকার দিনে কারও কাছে কোন ইয়াতীম থাকলে এবং তার সম্পদ ও সৌন্দর্য তাকে মুগ্ধ করলে সে তাকে বিয়ে করতে চাইত। তবে তাকে অন্যদের সমান মাহর দিতে চাইত না। তাই তাদের মাহর পূর্ণ ও সর্বোচ্চ পর্যায়ের না দিয়ে বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে। তাদের ব্যাপারে কোন প্রকার ত্রুটি করার ইচ্ছা থাকলে তাদের বাদ দিয়ে অন্যান্য মহিলাদের বিয়ে করতে নির্দেশ দেয়া

হয়েছে। [বুখারী ৪৫৭৪] তবে এর অর্থ এই নয় যে, অন্যান্য নারীদের বেলায় ইনসাফ বিধান করা লাগবে না। বরং অন্যান্য নারীদের বেলায়ও তা করতে হবে। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

বহু-বিবাহ প্রথাটি ইসলামপূর্ব যুগেও দুনিয়ার প্রায় সকল ধর্মমতেই বৈধ বলে বিবেচিত হত। আরব, ভারতীয় উপমহাদেশ, ইরান, মিশর, ব্যাবিলন প্রভৃতি দেশেই এই প্রথার প্রচলন ছিল। বহু-বিবাহের প্রয়োজনীয়তার কথা বর্তমান যুগেও স্বীকৃত। বর্তমান যুগে ইউরোপের এক শ্রেণীর চিন্তাবিদ বহু-বিবাহ রহিত করার জন্য তাদের অনুসারীদেরকে উদ্বুদ্ধ করে আসছেন বটে, কিন্তু তাতে কোন সুফল হয়নি। বরং তাতে সমস্যা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এর ফল রক্ষিতার রূপে প্রকাশ পেয়েছে। অবশেষে প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক ব্যবস্থারই বিজয় হয়েছে। তাই আজকে ইউরোপের দূরদর্শী চিন্তাশীল ব্যক্তিরা বহু-বিবাহ পুনঃপ্রচলন করার জন্য চিন্তা-ভাবনা করছেন। ইসলাম একই সময়ে চারের অধিক স্ত্রী রাখাকে হারাম ঘোষণা করেছে। ইসলাম এ ক্ষেত্রে ইনসাফ কায়েমের জন্য বিশেষ তাকিদ দিয়েছে এবং ইনসাফের পরিবর্তে যুলুম করা হলে তার জন্য শাস্তির কথা ঘোষণা করেছে।

আলোচ্য আয়াতে একাধিক অর্থাৎ চারজন স্ত্রী গ্রহণ করার সুযোগ অবশ্য দেয়া হয়েছে, অন্যদিকে এই চার পর্যন্ত কথাটি আরোপ করে তার উর্ধ্ব সংখ্যক কোন স্ত্রী গ্রহণ করতে পারবে না বরং তা হবে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ- তাও ব্যক্ত করে দিয়েছে। ইসলাম পূর্ব যুগে কারও কারও দশটি পর্যন্ত স্ত্রী থাকত। ইসলাম এটাকে চারের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে। কায়েস ইবন হারেস বলেন, 'আমি যখন ইসলাম গ্রহণ করি তখন আমার স্ত্রী সংখ্যা ছিল আট। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে আসলে তিনি আমাকে বললেন, 'এর মধ্য থেকে চারটি গ্রহণ করে নাও। [ইবন মাজাহ: ১৯৫২, ১৯৫৩]

পবিত্র কুরআনে চারজন স্ত্রীর কথা বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে এবং সাথে সাথে এও বলে দেয়া হয়েছে যে, যদি তোমরা তাদের মধ্যে সমতা বিধান তথা ন্যায় বিচার করতে না পার, তাহলে এক স্ত্রীর উপরই নির্ভর কর। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, একাধিক বিয়ে ঠিক তখনই বৈধ হতে পারে, যখন শরীআত মোতাবেক সবার সাথে সমান আচরণ করা হবে; তাদের সবার অধিকার সমভাবে সংরক্ষণ করা হবে। এ ব্যাপারে অপারগ হলে এক স্ত্রীর উপরই নির্ভর করতে হবে এবং এটাই ইসলামের নির্দেশ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাধিক স্ত্রীর বেলায় সবার সাথে পরিপূর্ণ সমতার ব্যবহার করার ব্যাপারে বিশেষ তাকিদ দিয়েছেন এবং যারা এর খেলাফ করবে, তাদের জন্য কঠিন শাস্তির খবর দিয়েছেন। নিজের ব্যবহারিক জীবনেও তিনি এ ব্যাপারে সর্বোত্তম আদর্শ স্থাপন করে দেখিয়েছেন। এমনকি তিনি এমন বিষয়েও সমতাপূর্ণ আদর্শ স্থাপন করেছেন যে ক্ষেত্রে এর প্রয়োজন ছিল না। এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তির দুই স্ত্রী রয়েছে, সে যদি এদের মধ্যে ব্যবহারের ক্ষেত্রে পূর্ণ সমতা ও ইনসাফ করতে না পারে, তবে কিয়ামতের ময়দানে সে এমনভাবে উঠবে যে, তার শরীরের এক পার্শ্ব অবশ হয়ে থাকবে। [আবু দাউদঃ ২১৩৩, তিরমিযীঃ ১১৪১, ইবন মাজাহঃ ১৯৬৯, আহমাদঃ ২/৪৭১]

এ সূরার ১২৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে, কোন এক স্ত্রীর প্রতি যদি তোমার আন্তরিক আকর্ষণ বেশী হয়ে যায়, তবে সেটা তোমার সাধ্যায়ত্ব ব্যাপার নয় বটে, কিন্তু এ ক্ষেত্রেও অন্যজনের প্রতি পরিপূর্ণ উপেক্ষা প্রদর্শন করা জায়েয হবে না। সূরা আন-নিসার এ আয়াতে ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার করতে না পারার আশংকার ক্ষেত্রে এক বিয়েতেই তৃপ্ত থাকার নির্দেশ এবং পরবর্তী আয়াতে "তোমরা কোন অবস্থাতেই একাধিক স্ত্রীর মধ্যে সমতা রক্ষা

করতে পারবে না" এ দু'আয়াতের মধ্যে সমন্বয় হচ্ছে, এখানে মানুষের সাধ্যায়ত্ব ব্যাপারে স্ত্রীদের মধ্যে সমতা বজায় রাখার কথা বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় আয়াতে যা মানুষের সাধ্যের বাইরে অর্থাৎ আন্তরিক আকর্ষণের ব্যাপারে সমতা রক্ষা করা সম্ভব নয় বলে মন্তব্য করা হয়েছে। সুতরাং দুটি আয়াতের মর্মে যেমন কোন বৈপরীত্ব নেই, তেমনি এ আয়াতের দ্বারা একাধিক বিবাহের অবৈধতাও প্রমাণিত হয় না। যদি আমরা এ আয়াতের শানে-নুযুলের দিকে দৃষ্টিপাত করি তাহলে ব্যাপারটা আরো স্পষ্ট হয়ে যায়। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলছেন, একটি ইয়াতীম মেয়ে এক ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে ছিল। লোকটি সে ইয়াতীম মেয়েটির সাথে সম্পদে অংশীদারও ছিল। সে তাকে তার সৌন্দর্য ও সম্পদের জন্য ভালবাসত। কিন্তু সে তাকে ইনসাফপূর্ণ মাহর দিতে রাযী হচ্ছিল না। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করে মাহর দানের ক্ষেত্রে ইনসাফপূর্ণ ব্যবস্থা কায়েম করার নির্দেশ দেন। ইয়াতীম হলেই তার মাহর কম হয়ে যাবে, এমনটি যেন না হয় সেদিকে গুরুত্বের সাথে লক্ষ্য রাখার নির্দেশ দান করা হয়। [বুখারীঃ ২৪৯৪, ৪৫৭৪, ৫০৯২, মুসলিমঃ ৩০১৮]

ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا - এতে দুটি শব্দ রয়েছে। একটি أَدْنَىএটি دُنُوّধাতু থেকে উৎপন্ন, যার অর্থ হয় নিকটতর। দ্বিতীয় শব্দটি হচ্ছেঃ ألاَّ تَعُولُوا যা عال শব্দ হতে উৎপন্ন, অর্থ ঝুঁকে পড়া। এখানে শব্দটি অসংগতভাবে ঝুঁকে পড়া এবং দাম্পত্য জীবনে নির্যাতনের পথ অবলম্বন করা অর্থে ব্যবহৃত করা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, এ আয়াতে তোমাদের যা বলা হল যে, সমতা বজায় রাখতে না পারার আশংকা থাকলে এক স্ত্রী নিয়েই সংসারযাত্রা নির্বাহ কর কিংবা শরীআতসম্মত ক্রীতদাসী নিয়ে সংসার কর; এটা এমন এক পথ যা অবলম্বন করলে তোমরা যুলুম থেকে বেঁচে থাকতে পারবে। বাড়াবাড়ি বা সীমালংঘনের সম্ভাবনাও দূর হবে। تَعُولُوا শব্দের দ্বিতীয় আরেকটি অর্থ হতে পারে মিসকীন হয়ে যাওয়া। এর সপক্ষে সূরা আত-তাওবার ২৮ নং আয়াতে عَيْلَةً শব্দটি এসেছে। সেখানে শব্দটির অর্থ করা হয়েছে দারিদ্রতা। ইমাম শাফেয়ী বলেন, এর অর্থ, যাতে তোমাদের পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি না পায়। [ফাতহুল কাদীর]

وَ اٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ؕ فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَیْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِیْٓــًٔا مَّرِیْٓــًٔا

৪. আর তোমরা নারীদেরকে তাদের মাহর মনের সন্তোষের সাথে প্রদান কর; অতঃপর সন্তুষ্ট চিত্তে তারা মাহরের কিছু অংশ ছেড়ে দিলে তোমরা তা স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ কর।

ইসলামপূর্ব যুগে স্ত্রীর প্রাপ্য মাহর তার হাতে পৌছতো না; মেয়ের অভিভাবকগণই তা আদায় করে আত্মসাৎ করত। যা ছিল নিতান্তই একটা নির্যাতনমূলক রেওয়াজ। এ প্রথা উচ্ছেদ করার লক্ষ্যে কুরআন নির্দেশ দিয়েছেঃ (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ) এতে স্বামীর প্রতি নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, স্ত্রীর মাহর তাকেই পরিশোধ কর; অন্যকে নয়। অন্যদিকে অভিভাবকগণকেও নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, মাহর আদায় হলে যার প্রাপ্য তার হাতেই যেন অর্পণ করে। তাদের অনুমতি ছাড়া অন্য কেউ যেন তা খরচ না করে।

স্ত্রীর মাহর পরিশোধ করার ক্ষেত্রে নানা রকম তিক্ততার সৃষ্টি হত। প্রথমতঃ মাহর পরিশোধ করতে হলে মনে করা হত যেন জরিমানার অর্থ পরিশোধ করা হচ্ছে। এ অনাচার রোধ করার লক্ষ্যেই نِحْلَةً শব্দটি ব্যবহার করে অত্যন্ত হৃষ্টমনে তা পরিশোধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কেননা, অভিধানে نِحْلَةً বলা হয় সে দানকে, যা অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে প্রদান করা হয়। মোটকথা, আয়াতে বলে দেয়া হয়েছে যে, স্ত্রীদের মাহর অবশ্য পরিশোধ্য একটা ঋণ বিশেষ। এটা পরিশোধ করা অত্যন্ত জরুরী। পরন্তু অন্যান্য ওয়াজিব ঋণ যেমন সন্তুষ্ট চিত্তে পরিশোধ

করা হয়, স্ত্রীর মাহরের ঋণও তেমনি হৃষ্টচিত্তে, উদার মনে পরিশোধ করা কর্তব্য। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আব্দুর রহমান ইবন আউফ কোন এক মহিলাকে এক 'নাওয়া' (পাঁচ দিরহাম পরিমাণ) মাহর দিয়ে বিয়ে করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে খুশী দেখতে পেয়ে কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমি এক মহিলাকে এক নাওয়া পরিমাণ মাহর দিয়ে বিয়ে করেছি। [বুখারী ৫১৪৮]

অনেক স্বামীই তার বিবাহিত স্ত্রীকে অসহায় মনে করে নানাভাবে চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে মাহর মাফ করিয়ে নিত। এভাবে মাফ করিয়ে নিলে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা মাফ হয় না। অথচ স্বামী মনে করত যে, মৌখিকভাবে যখন স্বীকার করিয়ে নেয়া গেছে, সুতরাং মাহরের ঋণ মাফ হয়ে গেছে। এ ধরণের যুলুম প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, "যদি স্ত্রী নিজের পক্ষ থেকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মাহরের কোন অংশ ক্ষমা করে দেয়, তবেই তোমরা তা হৃষ্টমনে ভোগ করতে পার।" অর্থ হচ্ছে, চাপ প্রয়োগ কিংবা কোন প্রকার জোর-জবরদস্তি করে ক্ষমা করিয়ে নেয়ার অর্থ কোন অবস্থাতেই ক্ষমা নয়। তবে স্ত্রী যদি স্বেচ্ছায়, খুশী মনে মাহরের অংশবিশেষ মাফ করে দেয় কিংবা পুরোপুরিভাবে বুঝে নিয়ে কোন অংশ তোমাদের ফিরিয়ে দেয়, তবেই কেবল তোমাদের পক্ষে তা ভোগ করা জায়েয হবে। এ ধরণের বহু নির্যাতনমূলক পন্থা জাহেলিয়াত যুগে প্রচলিত ছিল। কুরআন এসব যুলুমের উচ্ছেদ করেছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আজো মুসলিম সমাজে মাহর সম্পর্কিত এ ধরণের নানা নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা প্রচলিত দেখা যায়। কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী এরূপ নির্যাতনমূলক পথ পরিহার করা অবশ্য কর্তব্য। আয়াতে 'হৃষ্টচিত্তে' প্রদানের শর্ত আরোপ করার পেছনে গভীর তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। কেননা, মাহর স্ত্রীর অধিকার এবং তার নিজস্ব সম্পদ হৃষ্টচিত্তে যদি সে তা কাউকে না দেয় বা দাবী ত্যাগ না করে, তবে স্বামী বা অভিভাবকের পক্ষে সে সম্পদ কোন অবস্থাতেই হালাল হবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদীসে শরীয়তের মূলনীতিরূপে এরশাদ করেছেনঃ "কারো পক্ষে অন্যের সম্পদ তার আন্তরিক তুষ্টি ব্যতীত গ্রহণ করা হালাল হবে না।" [মুসনাদে আহমাদঃ ৩/৪২৩] এ হাদীসটি এমন একটা মূলনীতির নির্দেশ দেয়, যা সর্বপ্রকার প্রাপ্য ও লেন-দেনের ব্যাপারে হালাল এবং হারামের সীমারেখা নির্দেশ করে। [তাফসীরে জাকারিয়া]

وَ لَا تُؤْتُوا السُّفَهَآءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِیْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِیٰمًا وَّ ارْزُقُوْهُمْ فِیْهَا وَ اكْسُوْهُمْ وَ قُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا

৫. আর তোমরা অল্প বুদ্ধিমানদেরকে তাদের ধন-সম্পদ অর্পণ করে না, যা দ্বারা আল্লাহ তোমাদের জীবন চালানোর ব্যবস্থা করেছেন এবং তা থেকে তাদের আহার-বিহার ও ভরণপোষনের ব্যবস্থা কর। আর তোমরা তাদের সাথে সদালাপ কর।

এ আয়াতে ধন-সম্পদের গুরুত্ব এবং মানুষের জীবন ধারণের ক্ষেত্রে এর প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং সম্পদের হেফাযতের ক্ষেত্রে একটা সাধারণ ক্রটির সংশোধন নির্দেশ করা হয়েছে। তা হচ্ছে, অনেকেই স্নেহান্ধ হয়ে অল্পবয়স্ক, অনভিজ্ঞ ছেলে-মেয়ে অথবা স্ত্রীলোকদের হাতে ধন-সম্পদের দায়-দায়িত্ব তুলে দেয়। যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি সম্পদের অপচয় এবং যা দারিদ্র ঘনিয়ে আসার আকারে দেখা দেয়। আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন যে, কুরআনুল কারীমের এ আয়াতে নির্দেশ করা হচ্ছে যে, তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদ অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান-সন্ততি কিংবা অনভিজ্ঞ স্ত্রীলোকদের হাতে তুলে দিয়ে তাদের মুখাপেক্ষী হয়ে থেকো না, বরং আল্লাহ্ তা'আলা যেহেতু তোমাকে অভিভাবক এবং দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়েছেন, সেজন্য তুমি সম্পদ তোমার নিজের হাতে রেখে তাদের খাওয়া-পরার দায়-দায়িত্ব পালন করতে থাক। যদি তারা অর্থ-

সম্পদের দায়িত্ব নিজ হাতে নিয়ে নেয়ার আব্দার করে, তবে তাদেরকে ভালভাবে বুঝিয়ে দাও যে, এসব তোমাদের জন্যই সংরক্ষণ করা হচ্ছে, যাতে তাদের মনোকষ্টের কারণ না হয়, আবার সম্পদ বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনাও দেখা না দেয়। [তাবারী]

উপরোক্ত ব্যাখ্যা মতে, এমন সবার হাতেই সম্পদ অর্পন করা যাবে না যাদের হাতে পড়ে ধন-সম্পদ বিনষ্ট হওয়ার আশংকা রয়েছে। এতে ইয়াতীম শিশু বা নিজের সন্তানের কোন পার্থক্য নেই। আবু মূসা আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু আনহুও এ আয়াতের এরূপ তাফসীরই বর্ণনা করেছেন। [তাবারী] মোটকথা, মালের হেফাজত অত্যন্ত জরুরী এবং অপচয় করা গোনাহের কাজ। নিজের সম্পদের হেফাজত করতে গিয়ে যদি কেউ নিহত হয়, তবে সে শহীদের মর্যাদা পাবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ নিজের মালের হেফাজত করতে গিয়ে যদি কেউ নিহত হয়, তবে সে শহীদ'। [বুখারীঃ ২৪৮০, মুসলিমঃ ১৪১] অর্থাৎ সওয়াবের দিক দিয়ে শহীদের মর্যাদা পাবে।

وَ ابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْۤا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ ۚ وَ لَا تَاْكُلُوْهَاۤ اِسْرَافًا وَّ بِدَارًا اَنْ يَّكْبَرُوْا ؕ وَ مَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَ مَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَاْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَاَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْ ؕ وَ كَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا

৬. আর ইয়াতিমদেরকে যাচাই করবে যে পর্যন্ত না তারা বিয়ের যোগ্য হয়; অতঃপর তাদের মধ্যে ভাল–মন্দ বিচারের জ্ঞান দেখতে পেলে তাদের সম্পদ তাদেরকে ফিরিয়ে দাও। তারা বড় হয়ে যাবে বলে অপচয় করে তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেল না। যে অভাবমুক্ত সে যেন নিবৃত্ত থাকে এবং যে বিত্তহীন সে যেন সংযত পরিমাণে ভোগ করে অতঃপর তোমরা যখন তাদেরকে সম্পদ ফিরিয়ে দিবে তখন সাক্ষী রেখো। আর হিসেব গ্রহণে আল্লাহই যথেষ্ট।

আয়াতে শিশুদের শিক্ষা-দীক্ষা ও যোগ্যতা যাচাই করার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। অর্থাৎ বালেগ হওয়ার আগেই ছোট ছোট দায়িত্ব দিয়ে তাদের যোগ্যতা যাচাই করতে থাক, যে পর্যন্ত না তারা বিবাহের পর্যায়ে পৌছে অর্থাৎ বালেগ হয়। মোটকথা, বিষয় সম্পত্তির ব্যাপারে তাদের যোগ্যতা যাচাই করতে থাক এবং যখন দেখ যে, তারা দায়িত্ব বহন করার যোগ্য হয়ে উঠেছে, তখন তাদের সম্পদ তাদের হাতে বুঝিয়ে দাও। সারকথা হচ্ছে, শিশুরা বিশেষ প্রকৃতি ও জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশের মাপকাঠিতে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। (এক) বলেগ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সময়, (দুই) বালেগ হওয়ার পরবর্তী সময়, (তিন) বালেগ হওয়ার আগেই জ্ঞান-বুদ্ধির যথেষ্ট বিকাশ। ইয়াতীম শিশুর অভিভাবকগণকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যেন তারা শিশুর লেখাপড়া ও জীবন গঠনের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। অতঃপর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিষয়বুদ্ধির বিকাশ ঘটানোর উদ্দেশ্যে ছোট ছোট কাজ কারবার ও লেন-দেনের দায়িত্ব অর্পণ করে তাদের পরীক্ষা করতে থাকেন।

কুরআনের এ নির্দেশ পাওয়া যাচ্ছে যে, ইয়াতীম শিশুর মধ্যে যে পর্যন্ত বুদ্ধি-বিবেচনার বিকাশ লক্ষ্য না কর, সে পর্যন্ত তাদের বিষয়-সম্পত্তি তাদের হাতে তুলে দিও না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এ বুদ্ধি-বিবেচনা'র সময়সীমা কি? কুরআনের অন্য কোন আয়াতেও এর কোন শেষ সীমা নির্ধারণ করা হয়নি। এ জন্য কোন কোন ফিকহবিদ মত প্রকাশ করেছেন যে, যদি কোন ইয়াতীমের মধ্যে যথেষ্ট বয়স হওয়ার পরও বুদ্ধি-বিবেচনার লক্ষণাদি দেখা না

যায়, তবে অভিভাবক তার হাতে বিষয়সম্পত্তি তুলে দিতে পারবে না। সমগ্র জীবন এ সম্পত্তি তার তত্ত্বাবধানে রাখতে হলেও না।

শিশু যখন বালেগ এবং বিয়ের যোগ্য হয়ে যায়, তখন তার অভিজ্ঞতা ও বিষয়বুদ্ধি পরিমাপ করতে হবে। যদি দেখা যায়, সে তার ভালমন্দ বুঝবার মত যথেষ্ট অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছে, তখন তার বিষয়-সম্পত্তি তার হাতে তুলে দাও।

আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবন আস বলেন, এক লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল, আমার কোন সম্পদ নেই। আমার তত্ত্বাবধানে ইয়াতীম আছে, তার সম্পদ রয়েছে। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেনঃ তোমার ইয়াতীমের মাল থেকে তুমি খেতে পার, অপব্যয় ও অপচয় না করে, তার সম্পদকে তোমার সাথে না মিশিয়ে এবং তার সম্পদের বিনিময়ে তোমার সম্পদের হেফাজত না করে। [মুসনাদে আহমাদঃ ২/১৮৬, ২১৫, ২১৬, আবু দাউদঃ ২৮৭২] আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এ আয়াতের তাফসীরে বলেন, এ আয়াত ইয়াতীমের সম্পদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে, যদি কেউ ফকীর হয়, সে ইয়াতীমের সঠিক তত্ত্বাবধানের কারণে তা থেকে খেতে পারবে। [বুখারী: ৪৫৭৫; মুসলিম: ৩০১৯]

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَ الْاَقْرَبُوْنَ ۪ وَ لِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَ الْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ ؕ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا

৭. পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে, সেটা অল্পই হোক বা বেশীই হোক, এক নির্ধারিত অংশ।

ইসলাম আসার পূর্বে একটি যুলুম এও ছিল যে, মহিলা ও ছোট শিশুদেরকে মীরাস থেকে বঞ্চিত করা হত। বড় ছেলে যে যুদ্ধের উপযুক্ত হত, কেবল সেই সমস্ত মালের অধিকারী হত। এই আয়াতে মহান আল্লাহ বলে দিলেন যে, পুরুষদের মত মহিলা ও ছোট ছেলে-মেয়েরাও তাদের পিতা-মাতার এবং আত্মীয়দের মালের অংশীদার হবে; তাদেরকে বঞ্চিত করা যাবে না। তবে এটা পৃথক ব্যাপার যে, মেয়ের অংশ ছেলের অর্ধেক। (যেমন, তিনটি আয়াতের পর উল্লেখ করা হয়েছে।) এতে না মহিলার উপর যুলুম করা হয়েছে, আর না তার মর্যাদা খাটো করা হয়েছে, বরং ইসলামের এই উত্তরাধিকার নিয়ম ন্যায় ও সুবিচারের দাবীসমূহের সাথে একেবারে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ, মহিলাদেরকে ইসলাম জীবিকা উপার্জনের দায়িত্ব থেকে মুক্ত রেখেছে এবং পুরুষদের উপরেই চাপিয়েছে এই দায়িত্ব। এ ছাড়াও মোহর বাবদ কিছু মাল মহিলার কাছে আসে। একজন পুরুষই এই মাল তাকে দেয়। এই দিক দিয়ে মহিলাদের তুলনায় পুরুষদের উপর অনেক বেশী আর্থিক দায়িত্ব আরোপিত হয়। সুতরাং মহিলার অংশ যদি অর্ধেকের পরিবর্তে পুরুষের সমান হত, তাহলে পুরুষের উপর যুলুম করা হত। বলাই বাহুল্য যে, আল্লাহ তাআলা কারো উপর যুলুম করেননি। কেননা, তিনি সুবিচারক এবং সুকৌশলী। [তাফসীরে আহসানুল বায়ান]

وَ اِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُوا الْقُرْبٰى وَ الْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنُ فَارْزُقُوْهُمْ مِّنْهُ وَ قُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا
৮. আর সম্পত্তি বন্টনকালে আত্মীয়, ইয়াতীম এবং অভাবগ্রস্ত লোক উপস্থিত থাকলে তাদেরকে তা থেকে কিছু দিবে এবং তাদের সাথে সদালাপ করবে।

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, এ আয়াত মুহকাম, এ আয়াত রহিত হয়নি। অর্থাৎ এর উপর আমল করতে হবে। [বুখারী ৪৫৭৬] অন্য বর্ণনায় ইবন আব্বাস বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা মুমিনগণকে তাদের মীরাস বন্টনের সময় আত্মীয়তার সম্পর্কে প্রতিষ্ঠা, ইয়াতীমদের তত্ত্বাবধান এবং মিসকীনদের জন্য যদি মৃত ব্যক্তির কোন অসীয়ত থেকে থাকে, তবে সে অসীয়ত থেকে প্রদান করতে হবে। আর যদি অসীয়ত না থাকে, তবে তাদেরকে মীরাস থেকে কিছু পৌছাতে হবে। [তাবারী]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, আবদুর রহমান ইবন আবী বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মীরাস বন্টনের সময় আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা তখনও জীবিত- আব্দুর রহমানের সন্তান আবদুল্লাহ ঘরে ইয়াতীম, মিসকীন, আত্মীয়স্বজন সবাইকে তার পিতার মীরাস থেকে কিছু কিছু প্রদান করেন, এ হিসেবে যে, এখানে (الْقِسْمَةَ) শব্দের অর্থ, বন্টন। তারপর সেটা ইবন আব্বাসকে জিজ্ঞেস করলে, তিনি বললেন, ঠিক করে নি। কারণ এটা অসীয়ত করার প্রতি নির্দেশ। এ আয়াতটিতে অসীয়তের কথাই বলা হয়েছে। যখন মাইয়্যেত তার সম্পদের ব্যাপারে অসীয়ত করতে চাইবে সে যেন নিঃস্ব, ইয়াতীম স্বজনদের না ভুলে সে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। [আত-তাফসীরুস সহীহ] সে হিসেবে এটি মৃত্যুর আগেই সম্পদের মালিকের করণীয় নির্দেশ করছে। [তাফসীরে জাকারিয়া]

وَ لْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْ ۪ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَ لْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا
৯. আর তারা যেন ভয় করে যে, অসহায় সন্তান পিছনে ছেড়ে গেলে তারাও তাদের সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হত। কাজেই তারা যেন আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করে এবং সঙ্গত কথা বলে।

কোন কোন মুফাসসিরের নিকট এই আয়াতে 'অসী'দেরকে (যাদেরকে অসিয়ত করা হয় তাদেরকে) সম্বোধন করা হয়েছে। তাদেরকে নসীহত করা হচ্ছে যে, তাদের তত্ত্বাবধানে যে ইয়াতীমরা রয়েছে, তাদের সাথে যেন তারা ঐরূপ সুন্দর ব্যবহার করে, যেরূপ সে পছন্দ করে তার মৃত্যুর পর তার সন্তানদের সাথে করা হোক। আবার কোন কোন মুফাসসের বলেছেন, এতে সাধারণ লোকদের সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, তারা যেন ইয়াতীম এবং অন্য ছোট ছোট শিশুদের সাথে উত্তম ব্যবহার করে; চাহে তারা তার তত্ত্বাবধানে হোক বা না হোক। কেউ বলেছেন, এখানে সেই ব্যক্তিকে সম্বোধন করা হয়েছে, যে মৃত্যুর নিকটবর্তী ব্যক্তির পাশে বসে আছে। তার দায়িত্ব হল মরণোম্মুখ ব্যক্তিকে উত্তম কথা শিক্ষা দেওয়া, যাতে সে আল্লাহ ও তাঁর বান্দাদের অধিকারের ব্যাপারে যেন কোন অবহেলা না করে এবং অসিয়ত করার সময় যেন এই উভয় অধিকারের খেয়াল রাখে। সে যদি বড় বিত্তশালী হয়, তাহলে তার অভাবী ও সাহায্যের প্রত্যাশী নিকটাত্মীয়ের জন্য নিজের মালের এক তৃতীয়াংশের অসিয়ত যেন অবশ্যই করে অথবা কোন দ্বীনী কাজে বা দ্বীনী প্রতিষ্ঠানে ব্যয় করার জন্য যেন অসিয়ত করে। কারণ, এই মালই হবে তার আখেরাতের সম্বল। আর সে যদি বিত্তশালী না হয়, তাহলে তার মালের এক তৃতীয়াংশেও অসিয়ত করতে তাকে বাধা দিতে হবে। যাতে তার পরিবারের লোকরা যেন নিঃস্ব ও অভাবগ্রস্ত না হয়ে পড়ে। অনুরূপ কেউ যদি তার কোন উত্তরাধিকারীকে বঞ্চিত করতে চায়, তাহলে তাকে এ কাজে বাধা দিতে হবে এবং তার উত্তরাধিকারীদের জন্য সেটাই করা পছন্দ করবে, যা করা সে পছন্দ করে নিজের সন্তানাদির উপর অভাব-অনটনের আশঙ্কা বোধ করলে। এই ব্যাখ্যায় উল্লিখিত সকলেই আয়াতের সম্বোধনের আওতায় এসে যায়। (তাফসীর কুরতুবী-ফাতহুল ক্বাদীর)

إِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا ؕ وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا

১০. নিশ্চয় যারা ইয়াতীমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে তারা তো তাদের পেটে আগুনই খাচ্ছে; তারা অচিরেই জ্বলন্ত আগুনে জ্বলবে।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক কাজ পরিহার কর। সাহাবায়ে কিরাম বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সেগুলো কি? রাসূল বললেন, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, জাদু, অন্যায়ভাবে কোন প্রাণ সংহার করা, সুদ খাওয়া, ইয়াতিমের সম্পদ গ্রাস করা, যুদ্ধের মাঠ থেকে পলায়ন করা এবং মুমিনা পবিত্রা নারীকে মিথ্যা অপবাদ দেয়া। [বুখারী: ২৭৬৬] সুতরাং ইয়াতিমের সম্পদ গ্রাস করার শাস্তি কুরআন ও হাদীস উভয়ের দ্বারাই প্রমাণিত।

ফুটনোট

◘ পৃথিবীর সকল মানুষ একজন নর ও নারী থেকে সৃষ্ট। 'একটি ব্যক্তি/প্রাণ' বলতে মানবকুলের পিতা আদম (আঃ)-কে বুঝানো হয়েছে। আদম (আঃ) থেকেই তাঁর স্ত্রী হাওয়াকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

◘ পবিত্র কুরআনের আত্মীয়তার সম্পর্ক বুঝানোর জন্য 'আরহাম' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের বুনিয়াদকে ইসলামী পরিভাষায় 'সেলায়ে-রাহমী' বলা হয়। আর এতে কোন রকম বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হলে তাকে বলা হয় 'কেত্বয়ে-রাহমী'। আত্মীয়তার সম্পর্ক বহাল রাখা ওয়াজিব।

◘ ইয়াতিমের সম্পদ গ্রাস করাকে বড় গুনাহ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। যারা ইয়াতীমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে তারা তো তাদের পেটে আগুনই খাচ্ছে, তারা অচিরেই জ্বলন্ত আগুনে জ্বলবে।

◘ একত্রে একজন পুরুষ চারজন মহিলাকে বিবাহ করতে পারে তবে শর্ত হলো সকলের মাঝে সমতা বহাল রাখার যোগ্য হতে হবে।

◘ মাহর স্ত্রীর হক, তাই তাকে প্রদান করা আবশ্যক।

◘ ইসলামের কোন বিধানকে অপছন্দ করা কুফরী কাজ, বরং আনুগত্যের সাথে সকল বিধানকে মেনে নিতে হবে।

◘ ইসলাম নারীর অর্থনৈতিক অধিকার দিয়েছে, তাদের অর্থে স্বামীরও হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই।

◘ অনেকেই স্নেহান্ধ হয়ে অল্পবয়স্ক, অনভিজ্ঞ ছেলে-মেয়ে অথবা স্ত্রীলোকদের হাতে ধন-সম্পদের দায়-দায়িত্ব তুলে দেয়। যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি সম্পদের অপচয় এবং যা দারিদ্র ঘনিয়ে আসার আকারে দেখা দেয়। এমন সবার হাতেই সম্পদ অর্পন করা যাবে না যাদের হাতে পড়ে ধন-সম্পদ বিনষ্ট হওয়ার আশংকা রয়েছে। এতে ইয়াতীম শিশু বা নিজের সন্তানের কোন পার্থক্য নেই।

◘ ইসলাম সর্বপ্রথম সুষ্ঠু উত্তরাধিকার ব্যবস্থা চালু করেছে।

◘ উত্তরাধিকার বণ্টনের সময় যে সকল আত্মীয় অংশ পায় না, তাদের কিছু দেয়া মুস্তাহাব।

◘ মুমূর্ষু ব্যক্তিকে সৎ দিক-নির্দেশনা দেয়া উচিত।

কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২৪
প্রস্তুতি সহায়ক তাফসীর নোট পর্বঃ ৭

সূরা আন নিসা (১১-১৪)

শানে নুযূল:

জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও আবূ বাকর (রাঃ) আমাকে (রোগাবস্থায়) দেখার জন্য পায়ে হেঁটে আসেন। আমাকে তারা অজ্ঞান অবস্থায় দেখতে পান। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওযূর পানি আনতে বলেন, অতঃপর ওযূ করে আমার ওপর অবশিষ্ট পানি ছিটিয়ে দেন। তখন আমার জ্ঞান ফিরে আসে। আমি বললাম, আমার সম্পদ কী করতে বলেন? তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়-(يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ أَوْلَادِكُمْ) (সহীহ বুখারী হা: ৪৫৭৭, সহীহ মুসলিম হা: ১৬১৬)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, জাবের (রাঃ) বলেন: সা'দ বিন রাবী (রাঃ)-এর স্ত্রী রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট আগমন করলেন। অতঃপর বলেছেন: হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! এ দু'জন সা'দের মেয়ে। তাদের পিতা উহুদের ময়দানে শাহাদাত বরণ করেছেন। তাদের চাচা সমস্ত সম্পদ নিয়ে নিয়েছে, তাদের জন্য কিছুই রাখেনি। আর সম্পদ ছাড়া তো তাদের বিবাহও দেয়া যাচ্ছে না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যাপারে ফায়সালা দেবেন। তখন মীরাসের আয়াত অবতীর্ণ হয়। (আবূ দাউদ হা: ২৮৯১, তিরমিযী হা: ২০৯২, ইবনু মাযাহ হা: ২৭২০, সহীহ)

ইলমে ফারায়েজের গুরুত্ব

ইবনু মাস্'ঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেনঃ তোমরা 'ইলম শিক্ষা কর, লোকদের তা শিক্ষা দিতে থাকো। তোমরা অবশ্য পালনীয় বিষয়গুলো (বা ফারায়িয) শিখবে, অন্যকেও শিখাবে। এভাবে কুরআন শিখ, লোকদেরও শিখাও। নিশ্চয়ই আমি একজন মানুষ, আমাকে উঠিয়ে নেয়া হবে, 'ইলমও উঠিয়ে নেয়া হবে এবং ফিতনাহ্-ফাসাদ ও হাঙ্গামা সৃষ্টি হবে। এমনকি দুই ব্যক্তি অবশ্য পালনীয় বিষয়ে মতভেদ করবে, অথচ ঐ দুই ব্যক্তি এমন কাউকে পাবে না, যে এ দু'জনের মধ্যে মীমাংসা করে দিতে পারে। (দারিমী ও দারাকুত্বনী)

আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ অত্যাবশ্যকীয় ইলম (জ্ঞান) তিন প্রকার, এ ছাড়া অবশিষ্টগুলো অতিরিক্তঃ ১. আল-কুরআনের বিধান সম্পর্কিত (মুহকাম) আয়াতসমূহ ২. প্রতিষ্ঠিত সুন্নাহ (হাদীস) ৩. ইনসাফভিত্তিক ফারায়েজের জ্ঞান (ওয়ারিসী স্বত্ব ন্যায়সঙ্গতভাবে বণ্টনের জ্ঞান)। [আবূ দাউদ ২৮৮৫]

يُوْصِيْكُمُ اللهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ * لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ۚ فَاِنْ كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَ اِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ؕ وَ لِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّ وَرِثَهٗۤ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهٗۤ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِهَاۤ اَوْ دَيْنٍ اٰبَآؤُكُمْ وَ اَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ؕ فَرِيْضَةً مِّنَ اللهِ ؕ اِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۚ

১১. আল্লাহ তোমাদের সন্তান সম্বন্ধে নির্দেশ দিচেছন: এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান; কিন্তু শুধু কন্যা দুইয়ের বেশী থাকলে তাদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির তিন ভাগের দু'ভাগ, আর মাত্র এক কন্যা থাকলে তার জন্য অর্ধেক। তার সন্তান থাকলে তার পিতা-মাতা প্রত্যেকের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ; সে নিঃসন্তান হলে এবং পিতা-মাতাই উত্তরাধিকারী হলে তার মাতার জন্য তিন ভাগের এক ভাগ; তার ভাই-বোন থাকলে মাতার জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ; এ সবই সে যা ওসিয়াত করে তা দেয়ার এবং ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের পিতা ও সন্তানদের মধ্যে উপকারে কে তোমাদের নিকটতর তা তোমরা জান না। এ বিধান আল্লাহর; নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

সম্পদ বণ্টনের পূর্বে করণীয়: মৃত ব্যক্তির সম্পদ থেকে প্রথমে শরীয়ত অনুযায়ী তার কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করবে, এতে কৃপণতা ও অপব্যয় কোনটিই করবে না। এরপর তার ঋণ পরিশোধ করবে। যদি ঋণ দিতে গিয়ে সমস্ত সম্পদ শেষ হয়ে যায় তাহলেও পরিশোধ করতে হবে। তারপর সম্পদ থাকলে সমস্ত সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ থেকে ওসীয়ত পূর্ণ করবে। তারপর উত্তরাধিকার বণ্টন হবে। [ফাতহুল মাজীদ]

মীরাসের ব্যাপারে এটি প্রথম ও প্রধান মৌলিক বিধান যে, পুরুষদের অংশ হবে মেয়েদের দ্বিগুণ। যেহেতু পারিবারিক জীবন ক্ষেত্রে শরীয়াত পুরুষদের ওপর অর্থনৈতিক দায়িত্বের বোঝা বেশী করে চাপিয়ে এবং অনেকগুলো অর্থনৈতিক দায়িত্ব থেকে মেয়েদেরকে মুক্তি দিয়েছে, তাই মীরাসের ব্যাপারে মেয়েদের অংশ পুরুষদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম রাখা হবে, এটিই ছিল ইনসাফের দাবী। [তাফহীমুল কুরআন]

(فَاِنْ كُنَّ نِسَآءً) 'তবে যদি শুধু কন্যা হয়' এখানে মৃত ব্যক্তির মেয়েদের উত্তরাধিকার অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে। তাদের অবস্থা তিনটি: ১. মৃত ব্যক্তির মেয়ে একাই থাকলে সমস্ত সম্পদের অর্ধেক পাবে, যদি কোন মৃত ব্যক্তির ছেলে না থাকে। ২. সমস্ত সম্পদের দুই তৃতীয়াংশ পাবে, যদি দুই বা ততধিক মেয়ে থাকে আর যদি মৃত ব্যক্তির কোন ছেলে না থাকে। ৩. মৃত ব্যক্তির ছেলে থাকলে ছেলে যা পাবে মেয়ে তার অর্ধেক পাবে। [ফাতহুল মাজীদ]

(وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ) 'পিতা-মাতা প্রত্যেকে তার রেখে যাওয়া সম্পদের ছয়ভাগের একভাগ পাবে' ওয়ারিশের ক্ষেত্রে পিতা-মাতার তিনটি অবস্থা বর্ণিত হয়েছে-

১. মৃত ব্যক্তির সন্তানাদি থাকলে পিতা-মাতা উভয়ে সমস্ত মালের ছয়ভাগের একভাগ পাবে।

২. মৃত ব্যক্তির সন্তানাদি না থাকলে মা এক তৃতীয়াংশ পাবে। অবশিষ্ট দু'ভাগ "আসাবাহ" হিসেবে বাবা পাবে।

৩. পিতা-মাতার সাথে মৃত ব্যক্তির ভাই-বোন জীবিত থাকাবস্থায় মা ছয়ভাগের একভাগ পাবে। বাকি সমস্ত মাল পিতার ভাগে চলে যাবে।

(مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ) শরীআতের নীতি হচ্ছে এই যে, মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি থেকে প্রথমে শরীআত অনুযায়ী তার কাফন-দাফনের ব্যয় নির্বাহ করা হবে। এতে অপব্যয় ও কৃপণতা উভয়টি নিষিদ্ধ। এরপর তার ঋণ পরিশোধ করা হবে। যদি ঋণ সম্পত্তির সমপরিমাণ কিংবা তারও বেশী হয়, তবে কেউ ওয়ারিশী স্বত্ব পাবে না এবং কোন ওসিয়ত কার্যকর হবে না। পক্ষান্তরে যদি ঋণ পরিশোধের পর সম্পত্তি অবশিষ্ট থাকে কিংবা ঋণ একেবারেই না থাকে, তবে সে কোন ওসিয়ত করে থাকলে এবং তা গোনাহর ওসিয়ত না হলে অবশিষ্ট সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ থেকে তা কার্যকর হবে। যদি সে তার সমস্ত সম্পত্তি ওসিয়ত করে যায় তবুও এক-তৃতীয়াংশের অধিক ওসিয়ত কার্যকর হবে না। মোটকথা ঋণ পরিশোধের পর এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তিতে ওসিয়ত কার্যকর করে অবশিষ্ট সম্পত্তি শরীআতসম্মত ওয়ারিশদের মধ্যে বন্টন করতে হবে। ওসিয়ত না থাকলে ঋণ পরিশোধের পর সমস্ত সম্পত্তি ওয়ারিশদের মধ্যে বন্টন করতে হবে। [তাবারী; আত-তাফসীরুস সহীহ] বন্টনের ব্যাপারে হাদীসে এসেছে, মিকদাম ইবন মাদীকারব বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তোমাদেরকে সবচেয়ে নিকটতমের ব্যাপারে নির্দেশ দিচ্ছেন, তারপর পরের নিকটতম ব্যক্তি। [মুসনাদে আহমাদ: ৪/১৩১]

তোমাদের পিতা ও সন্তানের মধ্যে কার দ্বারা তোমরা দুনিয়া ও আখেরাতে সবচেয়ে বেশী লাভবান হবে, তা বলতে পার না। [আত-তাফসীরুস সহীহ] ইবন আব্বাস বলেন, তোমাদের পিতা ও সন্তানদের মধ্যে যে আল্লাহর বেশী অনুগত, সে পরস্পরের জন্য পরস্পরের সুপারিশ গ্রহণ করবেন। [তাবারী]

وَ لَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ؕ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ؕ وَ اِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً اَوِ امْرَاَةٌ وَّ لَهٗۤ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَاِنْ كَانُوْۤا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى الثُّلُثِ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۙ غَيْرَ مُضَآرٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ

১২. তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক তোমাদের জন্য, যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে এবং তাদের সন্তান থাকলে তোমাদের জন্য তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির চার ভাগের এক ভাগ; ওসিয়ত পালন এবং ঋন পরিশোধের পর। তোমাদের সন্তান না থাকলে তাদের জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির চার ভাগের এক ভাগ, আর তোমাদের সন্তান থাকলে তাদের জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির আট ভাগের এক ভাগ; তোমরা যা ওসিয়াত করবে তা দেয়ার পর এবং ঋণ পরিশোধের পর। আর যদি কোন পুরুষ অথবা নারীর 'কালালাহ' বা পিতা-মাতা ও সন্তানহীন উত্তরাধিকারী হয়, আর থাকে তার এক বৈপিত্রেয় ভাই বা বোন, তবে প্রত্যেকের জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ। তারা এর বেশী হলে সবাই সমান অংশীদার হবে তিন ভাগের এক ভাগে; এটা যা ওসিয়াত করা হয় তা দেয়ার পর এবং ঋণ পরিশোধের পর, কারো ক্ষতি না করে। এ হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশ। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সহনশীল।

উপরোক্ত বর্ণনায় স্ত্রীর অংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রথমে স্বামীর অংশ ব্যক্ত করা হয়েছে। মৃতা স্ত্রীর যদি কোন সন্তান না থাকে, তবে ঋণ পরিশোধ ও ওসিয়ত কার্যকর করার পর স্বামী তার সম্পত্তির অর্ধেক পাবে। অবশিষ্ট অর্ধেক থেকে অন্যান্য ওয়ারিশ যেমন মৃতার পিতা-মাতা, ভাই-বোন যথারীতি অংশ পাবে। মৃতার যদি সন্তান

থাকে, এক বা একাধিক - পুত্র বা কন্যা, এ স্বামীর ঔরসজাত হোক বা পূর্ববর্তী কোন স্বামীর ঔরসজাত, তবে বর্তমান স্বামী ঋণ পরিশোধ ও ওসিয়ত কার্যকর করার পর মৃতার সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ পাবে। অবশিষ্ট তিন-চতুর্থাংশ অন্যান্য ওয়ারশরা পাবে। পক্ষান্তরে যদি স্বামী মারা যায় এবং তার কোন সন্তান না থাকে, তবে ঋণ পরিশোধ ও ওসিয়ত কার্যকর করার পর স্ত্রী মোট সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ পাবে। আর যদি মৃত স্বামীর সন্তান থাকে, এ স্ত্রীর গর্ভজাত হোক কিংবা অন্য স্ত্রীর, তবে ঋণ পরিশোধ ও ওসিয়ত কার্যকর করার পর স্ত্রী আট ভাগের এক ভাগ পাবে।

স্ত্রী একাধিক হলেও উপরোক্ত বিবরণ অনুযায়ী এক অংশ সকল স্ত্রীর মধ্যে সমহারে বন্টন করা হবে। অর্থাৎ প্রত্যেক স্ত্রীই এক-চতুর্থাংশ কিংবা এক-অষ্টমাংশ পাবে না, বরং সবাই মিলে এক-চতুর্থাংশ কিংবা এক-অষ্টমাংশে অংশীদার হবে। উভয় অবস্থাতে স্বামী অথবা স্ত্রীর অংশ দেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকবে, তা তাদের অন্যান্য ওয়ারিশদের মধ্যে বন্টন করা হবে। তবে প্রথমে দেখা উচিত যে, যদি স্ত্রীর মাহর পরিশোধ করা না হয়ে থাকে, তবে অন্যান্য ঋণের মতই প্রথমে মোট পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে মাহর পরিশোধ করার পর ওয়ারিশদের মধ্যে বন্টন করা হবে। মোহারানা দেয়ার পর স্ত্রী ওয়ারিশী স্বত্বে অংশীদার হবার দরুন এ অংশও নেবে। মাহর পরিশোধ করার পর যদি মৃত স্বামীর সম্পত্তি অবশিষ্ট না থাকে, তবে অন্যান্য ঋণের মত সম্পূর্ণ সম্পত্তি মাহর বাবদ স্ত্রীকে সমর্পণ করা হবে এবং কোন ওয়ারিশই অংশ পাবে না। [তাফসীরে জাকারিয়া]

আলোচ্য আয়াতে কালালাহ'র পরিত্যক্ত সম্পত্তির বিধান বর্ণিত হয়েছে। কালালাহ'র অনেক সংজ্ঞা রয়েছে। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, যে মৃত ব্যক্তির ঊর্ধ্বতন ও অধঃস্তন কেউ নেই, সে-ই কালালাহ। [তাবারী]

'কারো ক্ষতি না করে' এ কথার দুটি দিক আছে। প্রথমত, মৃত ব্যক্তি যেন ওসিয়ত বা ঋণের মাধ্যমে কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে। ওসিয়ত করা কিংবা নিজের যিম্মায় ভিত্তিহীন ঋণ স্বীকার করার মাধ্যমে ওয়ারিশদেরকে বঞ্চিত করার ইচ্ছা লুকায়িত না রাখে। এ রকমের ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ও কবিরা গোনাহ। দ্বিতীয়ত, যারা কালালাহ জনিত ওয়ারিশ তারাও যেন মৃত ব্যক্তির ন্যায়সঙ্গত অসিয়ত কার্যকরণে কোন প্রকার বাধা না দেয়। ইবন আব্বাস বলেন, ওসিয়্যতে ক্ষতিগ্রস্ত করা কবীরা গোনাহের অন্তর্ভুক্ত। [তাবারী]

মীরাসের বিধান বর্ণনা করার সাথে সাথে এখানে তৃতীয়বার বলা হচ্ছে যে, মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির ভাগাভাগি তার অসিয়ত পালন এবং ঋণ পরিশোধ করার পর হবে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এই দু'টি বিষয়ের উপর আমল করা অতীব জরুরী। অতঃপর এ ব্যাপারেও সকলে একমত যে, প্রথমে ঋণ পরিশোধ করতে হবে, তারপর অসিয়ত কার্যকরী হবে। কিন্তু মহান আল্লাহ তিন স্থানেই অসিয়তের উল্লেখ ঋণের পূর্বে করেছেন। অথচ ক্রমানুযায়ী ঋণের উল্লেখ প্রথমে হওয়া উচিত ছিল। এর কারণ হল, ঋণ পরিশোধের গুরুত্ব তো মানুষ দেয়, না দিলেও প্রাপক জোর করে তা আদায় করে নেয়। কিন্তু অসিয়তের উপর আমল করা জরুরী মনে করা হয় না। অধিকাংশ লোক এ ব্যাপারে ঢিলামি ও গড়িমসি করে। এই কারণেই অসিয়তের কথা আগে উল্লেখ করে তার গুরুত্বের কথা পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে। (রূহুল মাআ'নী)

আল্লাহর জ্ঞানের কথা উচ্চারণ করার পেছনে এখানে দু'টি কারণ রয়েছে। এক, যদি এ আইন ও বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করা হয় তাহলে মানুষ আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচতে পারবে না। দুই, আল্লাহ যে অংশ যেভাবে নির্ধারণ করেছেন তা একেবারেই নির্ভুল। কারণ যে বিষয়ে মানুষের কল্যাণ ও সুবিধা তা মানুষের চেয়ে আল্লাহ ভালো জানেন। এই সঙ্গে আল্লাহরধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা গুণের কথা বলার কারণ হচ্ছে এই যে, এ আইন প্রবর্তনের

ব্যাপারে আল্লাহ কোন কঠোরতা আরোপ করেননি। বরং তিনি এমন নীতি-নিয়ম প্রবর্তন করেছেন যা মেনে চলা মানুষের জন্য অত্যন্ত সহজ এবং এর ফলে মানুষ কোন কষ্ট, অভাব ও সংকীর্ণতার মুখোমুখি হবে না।

تِلْکَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ؕ وَ مَنْ یُّطِعِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ یُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِیْنَ فِیْهَا ؕ وَ ذٰلِکَ الْفَوْزُ الْعَظِیْمُ

১৩. এসব আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করলে আল্লাহ তাকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; তারা সেখানে স্থায়ী হবে আর এটাই হলো মহাসাফল্য।

وَ مَنْ یَّعْصِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَ یَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ یُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِیْهَا ۪ وَ لَهٗ عَذَابٌ مُّهِیْنٌ

১৪. আর কেউ আল্লাহ ও তার রাসূলের অবাধ্য হলে এবং তার নির্ধারিত সীমা লংঘন করলে তিনি তাকে আগুনে নিক্ষেপ করবেন; সেখানে সে স্থায়ী হবে এবং তার জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রাসূল (সাঃ)-এর অবাধ্য হয় ও তাঁর নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করে সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে, যার মধ্যে সে সদা অবস্থান করবে। এরূপ লোকদের জন্যে অপমানজনক শাস্তি রয়েছে। অর্থাৎ এসব অবশ্য করণীয় কাজ এবং এ পরিমাণ যা আল্লাহ তাআলা নির্ধারণ করেছেন ও মৃত ব্যক্তির ওয়ারিসগণকে তাদের আত্মীয়তার নৈকট্য এবং তাদের প্রয়োজন অনুপাতে যার জন্যে যে অংশ নির্দিষ্ট করেছেন এগুলো হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার সীমারেখা, তোমরা ঐগুলো ভেঙ্গে দিয়ো না বা অতিক্রম করো না। যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার এ নির্দেশাবলী মেনে নেয়, কোন ছল-চাতুরীর আশ্রয় নিয়ে কোন উত্তরাধিকারীকে কম বেশী দেয়ার চেষ্টা করে না, বরং আল্লাহ পাকের নির্দেশ পুরোপুরি পালন করে, আল্লাহ তাআলা অঙ্গীকার করেছেন যে, তিনি তাদেরকে চিরস্থায়ী জান্নাতে প্রবিষ্ট করবেন যার তলদেশ দিয়ে স্রোতস্বিনী সমূহ প্রবাহিত হতে থাকবে। তারাই সফলকাম হবে এবং তাদেরই উদ্দেশ্য সফল হবে।

পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ পাকের নির্দেশ পরিবর্তন করে দেয়, কোন ওয়ারিসের মীরাস কম বেশী করে, তার সন্তুষ্টি কামনা করে না, বরং তাঁর নির্দেশের বিপরীত কাজ করে বা তাঁর বন্টনকে ভাল চক্ষে দেখে না কিংবা তার আদেশকে ন্যায় মনে করে না, তারা চিরস্থায়ী অপমানজনক এবং বেদনাদায়ক শাস্তির মধ্যে অবস্থান করবে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ "একটি লোক সত্তর বছর পর্যন্ত পুণ্যের কাজ করতে থাকে, অতঃপর সে অসিয়তে সময় অন্যায় ও অবিচার করে, ফলে তার পরিণতি খারাপ কার্যের উপর হয়ে থাকে এবং জাহান্নামে প্রবেশ করে। [তাফসীরে ইবনে কাসীর]

ফুটনোট

▣ মৃত ব্যক্তির সম্পদ থেকে প্রথমে কাফন-দাফনের ব্যবস্থা, এরপর তার ঋণ পরিশোধ তারপর ওসীয়ত পূর্ণ করবে। তারপর উত্তরাধিকার বণ্টন হবে।

▣ সমগ্র সম্পদ ও সম্পত্তির মাত্র তিন ভাগে এক ভাগ অসিয়ত করা যেতে পারে।

▣ ১১ নং আয়াতের আলোকে সম্পদ বণ্টন নীতি-

- একজন পুরুষ পাবে দুইজন নারীর সমান।
- শুধু মেয়ে সন্তান দুই এর অধিক হলে তারা পাবে সম্পত্তির ২/৩ অংশ।
- মেয়ে একজন হলে সে পাবে সম্পত্তির অর্ধেক।
- মৃতের পুত্র থাকলে মা-বাবা প্রত্যেকে পাবে ১/৬ অংশ।
- পুত্র না থাকলে মাতা পাবে ১/৩ অংশ।
- মৃতের কয়েকজন ভাই থাকলে মা পাবে ১/৬ অংশ।

▣ ১২ নং আয়াতের আলোকে সম্পদ বণ্টন নীতি-

- সন্তান না থাকলে স্বামী তার স্ত্রীর সম্পত্তির ১/২ অংশ পাবে।
- সন্তান থাকলে পাবে ১/4 অংশ।
- সন্তান না স্ত্রী তার স্বামীর সম্পত্তির পাবে ১/4 অংশ।
- সন্তান থাকলে পাবে ১/৮ অংশ।
- পিতা,পুত্র, স্ত্রী না থাকলে যদি এক ভাই-এক বোন থাকে, তারা পাবে ১/৬ অংশ।
- তারা ততোধিক হলে পাবে ১/৩ অংশ।

▣ মৃত ব্যক্তির সম্পদ বণ্টন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলার সীমারেখা লঙ্ঘন করা হারাম।

▣ আল্লাহ তা'আলা মহিলাদের ন্যায্য অধিকার দিয়েছেন। এ সিদ্ধান্তের ওপর সন্তুষ্ট থাকতে প্রতিটি মুসলিম নর-নারী বাধ্য, অন্যথায় ঈমান থাকবে না।

পরিশিষ্ট - ফারায়েয

ইসলামী পরিভাষায় فَرَائِض বলা হয়, মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকার সম্পত্তিকে। আর যে বণ্টন পদ্ধতির আলোকে উত্তারাধিকার সম্পত্তি বণ্টন করা হয় তাকে শরীয়তের পরিভাষায় عِلْمُ الْفَرَائِض বলা হয়।

সম্পদের বণ্টন পদ্ধতির কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল:

- মৃত ব্যক্তির সকল সম্পদই উত্তরাধিকার সম্পত্তি
- উত্তরাধিকার সম্পদ শুধুমাত্র আত্মীয়দের মাঝে বণ্টিত হবে; অনাত্মীয়দের মাঝে নয়
- উত্তরাধিকার সম্পদে নারী-পুরুষ, বড়-ছোট সকলের অংশই নির্ধারিত
- উত্তরাধিকার সম্পদ পাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারের মাপকাঠি হল নিকটাত্মীয়তা; বয়সে বড় হওয়া নয়
- উত্তরাধিকার সম্পত্তি সম্পূর্ণরূপে বণ্টন করা; শরীকানাধীন কোন সম্পদ না রাখা

ইসলামী শরীয়তে মৃত ব্যক্তির সকল ওয়ারিশদেরকে তিনভাগে ভাগ করা হয়:
(ক) أَصْحَابُ الْفُرُوْض বা নির্ধারিত অংশের হকদার।
(খ) العَصَبَة বা অবশিষ্টভোগী।
(গ) أُوْلُو الأَرْحَام বা মৃতের অন্যান্য নিকটাত্মীয়।

এক. أصحاب الفروض বা নির্ধারিত অংশের হকদার: কুরআনে কারীমে যে সকল ওয়ারিশদের জন্য মিরাসের অংশ নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে তাদেরকে أَصْحَابُ الْفُرُوْض বলা হয়। মৃত ব্যক্তির দাফন-কাফন, ঋণ পরিশোধ এবং ওসিয়ত পূরণের পর যে সম্পত্তি অবশিষ্ট থাকবে তা সর্বপ্রথম أَصْحَابُ الْفُرُوْض এর মাঝে তাদের নির্দিষ্ট অংশ অনুযায়ী বণ্টন করা হবে। এরপর যদি কোন সম্পদ অবশিষ্ট থাকে তাহলে পরবর্তী দু শ্রেণী পর্যায়ক্রমে পাবে।

أَصْحَابُ الْفُرُوْض হল মোট ১২ জন। তন্মধ্যে ৪ জন পুরুষ এবং ৮ জন মহিলা। পুরুষ ৪ জন হল:
১. পিতা।
২. স্বামী।
৩. দাদা (দাদার পিতা, তার পিতা এভাবে উর্ধ্বতন পুরুষ দাদার অন্তর্ভুক্ত)।
৪. বৈপিত্রেয় ভাই ।

আর নারী ৮ জন হল:
১. মা।
২. স্ত্রী।
৩. আপন কন্যা।
৪. পুত্রের কন্যা (পুত্রের পুত্রের কন্যা- এভাবে পুরুষযোগে অধস্তন সকল মেয়েই পুত্রের কন্যার অন্তর্ভুক্ত)।
৫. আপন বোন।
৬. বৈমাত্রেয় বোন।
৭. সৎ বোন।

৮. দাদী ও নানী (পিতার মা, পিতামহের মা- এভাবে পুরুষযোগে ঊর্ধ্বতন সকল দাদী এবং মাতার মা, মাতার নানী- এভাবে নারীযোগে ঊর্ধ্বতন সকল নানী যথাক্রমে দাদী এবং নানীর অন্তর্ভুক্ত) ।

নিম্নে أَصْحَابُ الفُرُوْض এর প্রত্যেকের সম্পত্তির পরিমাণ এবং কোন অবস্থায় কতটুকু পাবে তা উল্লেখ্য করা হলো:

১। স্বামীঃ স্ত্রীর মৃত্যুর পর স্বামীর দুই অবস্থা হতে পারে:

(ক) যদি স্ত্রীর পক্ষ থেকে তার কোন ঔরষজাত সন্তান না থাকে তাহলে সম্পত্তির ১/২ অংশ (অর্ধেক) পাবেন।

(খ) আর যদি ঔরষজাত কোন সন্তান থাকে তাহলে ১/৪ অংশ (এক চতুর্থাংশ) পাবেন।

২। পিতাঃ সন্তান মারা গেলে পিতার তিন অবস্থা:

(ক) যদি মৃত সন্তানের কোন পুত্র (আপন পুত্র বা পুত্রের পুত্র- এভাবে অধস্তন কোন পুরুষ) থাকে তাহলে পিতা সম্পত্তির ১/৬ অংশ (এক ষষ্ঠাংশ) পাবেন।

(খ) যদি মৃত সন্তানের কোন পুত্র (আপন পুত্র বা পুত্রের পুত্র- এভাবে অধস্তন কোন পুরুষ) না থাকে কিন্তু তার কোন কন্যা (আপন কন্যা বা কন্যার কন্যা- এভাবে অধস্তন কোন নারী) থাকে তাহলে পিতা أَصْحَابُ الفُرُوْض হিসেবে ১/৬ অংশ (এক ষষ্ঠাংশ) পাবে এবং العَصَبَة হিসেবে অবশিষ্ট অংশ পাবেন।

(গ) যদি মৃত ব্যক্তির কোন সন্তানই না থাকে (চাই তা যত অধস্তনই হোক না কেন) তাহলে পিতা শুধুমাত্র العَصَبَة হিসেবে অবশিষ্ট সকল অংশ পাবেন।

৩। দাদাঃ যদি পিতা জীবিত না থাকে তাহলে পিতার অংশ পিতার পিতা বা তার পিতা পাবে। যদি মৃত ব্যক্তির পিতা জীবিত থাকে তাহলে দাদা বঞ্চিত হবে। তবে মৃত ব্যক্তির পিতা যদি জীবিত না থাকে তাহলেই শুধুমাত্র দাদা মিরাসের সম্পত্তি পাবে। আর দাদার মিরাসের সম্পত্তির ক্ষেত্রে পিতার ন্যায় অর্থাৎ পিতা যে পরিমান সম্পত্তি পেত দাদা সে অংশ পাবে।

৪। বৈপিত্রেয় ভাইঃ বেপিত্রেয় ভাই দ্বারা উদ্দেশ্য হল মৃত ব্যক্তির মায়ের গর্ভজাত ভাই কিন্তু পিতা ভিন্ন। বৈপিত্রেয় ভাইয়ের তিন অবস্থা হতে পারে:

(ক) যদি মৃত ব্যক্তির পুত্র, কন্যা, নাতি-নাতনী বা অধস্তন কেউ কিংবা পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ বা ঊর্ধ্বতন কোন পুরষ না থাকে এবং শুধুমাত্র একজন বৈপিত্রেয় ভাই থাকে তাহলে সে সম্পত্তির ১/৬ অংশ (এক ষষ্ঠাংশ) পাবে।

(খ) আর যদি উল্লেখিত অবস্থায় মৃত ব্যক্তির একাধিক বৈপিত্রেয় ভাই থাকে তাহলে সবাই মিলে সম্পত্তির ১/৩ অংশ (এক তৃতীয়াংশ) পাবে।

(গ) আর যদি মৃত ব্যক্তির পুত্র, কন্যা, নাতি-নাতনী বা অধস্তন কেউ কিংবা পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ বা ঊর্ধ্বতন কেউ জীবিত থাকে তাহলে বৈপিত্রেয় ভাইয়েরা বঞ্চিত হবে।

৫। মাতাঃ সন্তান মারা গেলে মায়ের তিন অবস্থা হতে পারে:

(ক) যদি মৃত ব্যক্তির কোন সন্তান থাকে কিংবা একাধিক ভাইবোন থাকে তাহলে মা সমুদয় সম্পত্তির ১/৬ অংশ (এক ষষ্ঠাংশ) পাবেন।

(খ) যদি মৃত ব্যক্তির স্বামী বা স্ত্রীর সাথে পিতা মাতা উভয়ে থাকে তাহলে সম্পত্তি থেকে স্বামী বা স্ত্রীর অংশ দেয়ার পর মা বাকি সম্পত্তির ১/৩ অংশ (এক তৃতীয়াংশ) পাবেন।
(গ) যদি মৃত ব্যক্তির কোন সন্তান না থাকে বা ভাইবোন ২ জনের কম থাকে এবং স্ত্রী কিংবা স্বামী জীবিত না থাকে তাহলে মা সমুদয় সম্পত্তির ১/৩ অংশ (এক তৃতীয়াংশ) পাবেন।

৬। স্ত্রীঃ স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীর দুই ধরনের অবস্থা হতে পারে:
(ক) যদি মৃত স্বামীর কোন সন্তান না থাকে তাহলে ১/৪ অংশ (এক চতুর্থাংশ) পাবেন।
(খ) আর যদি কোন সন্তান থাকে তাহলে ১/৮ অংশ (এক অষ্টমাংশ) পাবেন।
উল্লেখ্য যে, একাধিক স্ত্রী জীবিত থাকলেও সবাই মিলে এক স্ত্রীর প্র্যাপ্য অংশ পাবেন এবং এক স্ত্রীর প্র্যাপ্য অংশ সবাই নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিবেন।

৭। কন্যাঃ বাবার মৃত্যুর পর কন্যার তিন অবস্থা হতে পারে:
(ক) যদি শুধুমাত্র একজন কন্যা থাকে এবং কোন পুত্র না থাকে তাহলে সে সম্পত্তির ১/২ অংশ (অর্ধেক) পাবে।
(খ) আর কন্যা যদি একাধিক থাকে এবং কোন পুত্র না থাকে তাহলে সবাই ২/৩ অংশ (দুই তৃতীয়াংশ) পাবে।
(গ) আর যদি মৃত ব্যক্তির পুত্র এবং কন্যা একসাথে থাকে তাহলে পুত্র-কন্যা ২:১ অনুপাতে পাবে।

৮। পৌত্রীগণঃ পুত্রের কন্যা দ্বারা উদ্দেশ্য হল আপন পুত্রের কন্যা, পৌত্রের কন্যা, প্রপৌত্রের কন্যা এভাবে অধস্তন সকল পুত্রের কন্যা। তারা একে অপরের অবর্তমানে দাদার সম্পত্তি থেকে মিরাস লাভ করবে। এদের মিরাস পাওয়ার জন্য শর্ত হল মৃত ব্যক্তির কোন পুত্র কিংবা একাধিক কন্যা জীবিত না থাকা। পুত্রের কন্যাদের ছয়টি অবস্থা হতে পারে:
(ক) যদি মৃত ব্যক্তির কোন পুত্র-কন্যা না থাকে এবং শুধুমাত্র একজন পৌত্রী থাকে তাহলে সে সম্পত্তির ১/২ অংশ (অর্ধেক) পাবে।
(খ) আর যদি উল্লেখিত অবস্থায় মৃত ব্যক্তির একাধিক পৌত্রী থাকে তাহলে সবাই মিলে সম্পত্তির ২/৩ অংশ (দুই তৃতীয়াংশ) পাবে।
(গ) আর যদি উল্লেখিত অবস্থায় মৃত ব্যক্তির কোন পৌত্র থাকে এবং সাথে এক বা একাধিক পৌত্রী থাকে তাহলে পৌত্রীগণ আসাবা হয়ে যাবে এবং আসহাবুল ফুরুযকে তাদের অংশ দেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকবে তা পৌত্র এবং পৌত্রীগণ ১:২ অনুপাতে পাবে।
(ঘ) যদি মৃত্যু ব্যক্তির কোন পুত্র না থাকে কিন্তু একজন মাত্র কন্যা থাকে এবং সাথে এক বা একাধিক পৌত্রী থাকে তাহলে পৌত্রীগণ সবাই মিলে সম্পত্তির ১/৬ অংশ (এক ষষ্ঠাংশ) পাবে।
(ঙ) আর যদি উল্লেখিত অবস্থায় মৃত ব্যক্তির একাধিক কন্যা থাকে তাহলে পৌত্রীগণ বঞ্চিত হবে।
(চ) আর যদি মৃত্যু ব্যক্তির কোন পুত্র থাকে তাহলেও পৌত্রীণন বঞ্চিত হবে।

৯। আপন বোনঃ আপন বোনের পাঁচ অবস্থা হতে পারে:

(ক) যদি মৃত ব্যক্তির পুত্র-কন্যা, পিতা-ভাই কেউ জীবিত না থাকে এবং আপন বোন শুধুমাত্র একজন থাকে তাহলে বোন আসহাবুল ফুরুয হিসেবে সম্পত্তির ১/২ অংশ (অর্ধেক) পাবে।
(খ) যদি মৃত ব্যক্তির পুত্র-কন্যা, পিতা-ভাই কেউ জীবিত না থাকে এবং আপন বোন একের অধিক থাকে তাহলে তারা সবাই মিলে সম্পত্তির থাকলে ২/৩ অংশ (দুই তৃতীয়াংশ) পাবে।
(গ) যদি মৃত ব্যক্তির পুত্র-কন্যা এবং পিতা জীবিত না থাকে এবং আপন বোনের সাথে আপন ভাই জীবিত থাকে তাহলে বোনেরা ভাইয়ের কারণে আসাবা হয়ে যাবে। তখন আসহাবুল ফুরুযের অংশ বণ্টনের পর অবশিষ্ট অংশ আসবা হিসেবে ভাই-বোন ২:১ অনুপাতে পাবে।
(ঘ) যদি মৃত্যু ব্যক্তির আপন ভাই না থাকে কিন্তু একজন মাত্র কন্যা থাকে তাহলে আপন বোনেরা ১/৬ অংশ পাবেন। আর একাধিক কন্যা থাকলে এবং অন্য কোন ওয়ারিশ না থাকলে আপন কন্যাকে দেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকবে বোনেরা তা আসাবা হিসেবে পাবে।
(ঙ) যদি মৃত ব্যক্তির পুত্র কিংবা পিতা কেউ জীবিত থাকে তাহলে আপন বোনেরা বঞ্চিত হবে।

১০। বৈপিত্রেয় বোন। বৈপিত্রেয় বোন বলতে এমন বোনকে বোঝায় যা মৃত ব্যক্তির সহাদোরা অর্থাৎ একই মায়ের সন্তান কিন্তু বাবা ভিন্ন। বৈপিত্রেয় বোন মিরাসের সম্পত্তি লাভের জন্য শর্ত হল মৃত ব্যক্তির পুত্র, পুত্রের পুত্র কিংবা কন্যা, কন্যার কন্যা- এভাবে অধস্তন কেউ কিংবা পিতা, দাদা এভাবে ঊর্ধ্বতন কেউ জীবিত না থাকা। বৈপিত্রেয় বোনের তিন অবস্থা হতে পারে:
(ক) যদি মৃত ব্যক্তির পুত্র-কন্যা কিংবা অধস্তন কেউ অথবা পিতা-দাদা ঊর্ধ্বতন কেউ না থাকে আর বৈপিত্রেয় বোন শুধুমাত্র একজন থাকে তাহলে সম্পত্তির ১/৬ অংশ (এক ষষ্ঠাংশ) পাবে।
(খ) আর উল্লেখিত অবস্থায় যদি বৈপিত্রেয় বোন একাধিক থাকলে তাহলে সবাই মিলে সম্পত্তির ১/৩ অংশ (এক তৃতীয়াংশ) পাবে।
(গ) যদি মৃত ব্যক্তির পুত্র-কন্যা বা অধস্তন কেউ এবং পিতা-দাদা বা ঊর্ধ্বতন কেউ জীবিত থাকে তাহলে বৈপিত্রেয় বোনেরা বঞ্চিত হবে।

১১। বৈমাত্রেয় বোনঃ বৈমাত্রেয় বোন বলা হয় যাদের বাবা এক কিন্তু মা ভিন্ন। বৈমাত্রে বোনের সাত অবস্থা হতে পারে:
(ক) যদি মৃত ব্যক্তির পুত্র, পুত্রের পুত্র বা অধস্তন কেউ, পিতা, দাদা বা ঊর্ধ্বতন কেউ, আপন ভাই, একাধিক আপন বোন কিংবা একজন আপন বোন; সাথে কন্যা, কন্যার কন্যা বা অধস্তন কেউ যদি জীবিত না থাকে আর বৈমাত্রিয় বোন শুধুমাত্র একজন থাকে তাহলে সে আসহাবুল ফুরুয হিসেবে সম্পত্তির ১/২ অংশ (অর্ধেক) পাবে।
(খ) আর যদি উল্লেখিত অবস্থায় বৈমাত্রেয় বোন একাধিক থাকে তাহলে তারা সবাই মিলে সম্পত্তির ২/৩ অংশ (দুই তৃতীয়াংশ) পাবে।
(গ) আর যদি উল্লেখিত অবস্থায় মৃত ব্যক্তির একজন মাত্র আপন বোন থাকে তাহলে বৈমাত্রেয় বোন ১/৬ অংশ (এক ষষ্ঠাংশ) পাবে।
(ঘ) আর যদি উল্লেখিত অবস্থায় মৃত ব্যক্তির একাধিক আপন বোন থাকে তাহলে বৈমাত্রেয় বোনেরা বঞ্চিত হবে।

(ঙ) আর যদি উল্লেখিত অবস্থায় মৃত ব্যক্তির একাধিক আপন বোন থাকে এবং বৈমাত্রেয় বোনের সাথে বৈমাত্রেয় ভাইও থাকে তাহলে ভাইয়ের কারণে বোনেরা আসাবা হয়ে যাবে। তখন আসহাবুল ফুরুযের অংশ বণ্টনের পর অবশিষ্ট যা থাকবে তা বৈমাত্রেয় ভাই-বোন ২:১ অনুপাতে পাবে।
(চ) যদি উল্লেখিত অবস্থায় মৃত ব্যক্তির কোন কন্যা, কন্যার কন্যা বা অধস্তন কেউ থাকে এবং আপন বোন না থাকে তাহলে বৈমাত্রিয় বোন আসাবা হয়ে যাবে। তখন আসহাবুল ফুরুযকে দেয়ারপর যা অবশিষ্ট থাকবে তার পুরোটাই বৈমাত্রেয় বোন আসাবা হিসেবে পাবে।
(ছ) আর যদি উল্লেখিত অবস্থায় মৃত ব্যক্তির কোন পুরুষ ওয়ারিশ জীবিত থাকে তাহলে বৈমাত্রিয় বোনেরা বঞ্চিত হবে।

১২। দাদী বা নানীঃ দাদী দ্বারা উদ্দেশ্য হল পিতার মা, পিতামহের মা, পিতা মহীর মা, প্রপিতামহের মা, প্রপিতামহীর মা এভাবে ঊর্ধ্বতন সকলেই দাদীর হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপভাবে নানী দ্বারা উদ্দেশ্য মায়ের মা, নানীর মা, নানীর নানী এভাবে ঊর্ধ্বতন সকলেই নানীর হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। দাদী ও নানীর তিন অবস্থা হতে পারে:
(ক) যদি মৃত ব্যক্তির পিতা-মাতা, দাদা বা ঊর্ধ্বতন কেউ যদি জীবিত না থাকে তাহলে দাদী এবং নানী উভয়ে সম্পত্তির ১/৬ অংশ (এক ষষ্ঠাংশ) পাবে।
(খ) যদি মৃত ব্যক্তির মা জীবিত থাকে তাহলে দাদী এবং নানী উভয়ে বঞ্চিত হবে।
(গ) আর যদি মৃত ব্যক্তির পিতা জীবিত থাকে তাহলে দাদী বঞ্চিত হবে কিন্তু নানী যথারীতি ১/৬ অংশ (এক ষষ্ঠাংশ) পাবে।

দুই. العَصَبَة বা অবশিষ্টভোগী। মৃত ব্যক্তির এমন আত্মীয়-স্বজন যাদের কোন অংশ শরীয়ত কর্তৃক নির্দিষ্ট করা হয় নি। তবে أَصْحَابُ الفُرُوْض তাদের নির্দিষ্ট অংশ পাওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে কিংবা أصحاب الفروض এর অবর্তমানে তাদের সমুদয় সম্পত্তির যারা মালিক হয় তাদেরকে العَصَبَة বা অবশিষ্টভোগী বলা হয়। আসাবাদের মাঝে সম্পত্তি বণ্টনের পদ্ধতি হল الأقرب فالأقرب অর্থাৎ প্রথমে মৃতের নিকটাত্মীয়রা পাবে। এরপর অবশিষ্ট থাকলে দূরের আত্মীয়রা পাবে।

তিন. أولو الأرحام বা মৃতের অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন। অর্থাৎ মৃতব্যক্তির যে সমস্ত আত্মীয়-স্বজন أَصْحَابُ الفُرُوْض কিংবা العَصَبَة হিসেবে মিরাস পায় না; বরং এই দুই শ্রেণীর কেউ যদি জীবিত না থাকে তখন যারা মিরাসের সম্পত্তি পায় তাদেরকে أُوْلُوْ الأَرْحَام বলা হয়।

কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২৪
প্রস্তুতি সহায়ক তাফসীর নোট পর্বঃ ৮

সূরা আন নিসা (১৫-২২)

وَ الّٰتِیۡ یَاۡتِیۡنَ الۡفَاحِشَۃَ مِنۡ نِّسَآئِکُمۡ فَاسۡتَشۡہِدُوۡا عَلَیۡہِنَّ اَرۡبَعَۃً مِّنۡکُمۡ ۚ فَاِنۡ شَہِدُوۡا فَاَمۡسِکُوۡ ہُنَّ فِی الۡبُیُوۡتِ حَتّٰی یَتَوَفّٰہُنَّ الۡمَوۡتُ اَوۡ یَجۡعَلَ اللّٰہُ لَہُنَّ سَبِیۡلًا

১৫. আর তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যভিচার করে তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য থেকে চারজন সাক্ষী তলব করবে। যদি তারা সাক্ষ্য দেয় তবে তাদেরকে ঘরে অবরুদ্ধ করবে, যে পর্যন্ত না তাদের মৃত্যু হয় বা আল্লাহ তাদের জন্য অন্য কোন ব্যবস্থা করেন।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে এরূপ নির্দেশ ছিল যে, ন্যায়বান সাক্ষীদের সত্য সাক্ষ্য দ্বারা কোন স্ত্রীলোকের অশ্লীলতা প্রমাণিত হয়ে গেলে তাকে যেন বাড়ীর বাইরে যেতে দেয়া না হয় বরং জন্মের মত বাড়ীতেই যেন আটক রাখা হয়। অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্বে তাকে যেন ছেড়ে দেয়া না হয়। এটা বর্ণনা করার পর আল্লাহ পাক বলেন-হ্যা তবে এটা অন্য কথা যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্যে কোন পথ নির্দেশ করে দেন। অতঃপর যখন অন্য শাস্তি নির্ধারণ করা হয় তখন পূর্বের ঐ নির্দেশ রহিত হয়ে যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, সূরা-ই-নূরের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ব্যভিচারিণী স্ত্রীলোকের জন্যে এ নির্দেশই ছিল। অতঃপর সূরা-ই-নূরের আয়াত অবতীর্ণ হলে বিবাহিতা নারীকে রজম করা অর্থাৎ প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা এবং অবিবাহিতা নারীকে একশ চাবুক মারার নির্দেশ দেয়া হয়। [ইবনে কাসীর]

এখানে এমন পুরুষ ও নারীদের শাস্তি বর্ণিত হয়েছে, যারা নির্লজ্জ কাজ অর্থাৎ ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। বলা হয়েছে, যেসব নারী দ্বারা এমন কুকর্ম সংঘটিত হয়, তাদের এ কাজ প্রমাণ করার জন্য চার জন পুরুষ সাক্ষী তলব করতে হবে। অর্থাৎ যেসব বিচারকের কাছে এই মামলা পেশ করা হয়, তারা প্রমাণের জন্য চার জন যোগ্য সাক্ষী তলব করবেন এবং এই সাক্ষীদের পুরুষ শ্রেণী থেকে হওয়াও জরুরী। এ ব্যাপারে নারীদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। ব্যভিচারের সাক্ষীদের ব্যাপারে শরীআত দু'রকম কঠোরতা করেছে যেহেতু ব্যাপারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এতে ইজ্জত ও আবরু আহত হয় এবং পারিবারিক মানসম্ভ্রমের প্রশ্ন দেখা দেয়, তাই প্রথমে শর্ত আরোপ করা হয়েছে যে, এমন ক্ষেত্রে শুধু পুরুষই সাক্ষী হতে হবে- নারীদের সাক্ষ্য ধর্তব্য নয়।

দ্বিতীয়তঃ চার জন পুরুষ হওয়া জরুরী সাব্যস্ত করা হয়েছে। বলাবাহুল্য, এ শর্তটি খুবই কঠোর। দৈবাৎ ও কদাচিৎ তা পাওয়া যেতে পারে। এ শর্ত আরোপের কারণ, যাতে স্ত্রীর স্বামী, তার জননী অথবা অন্য স্ত্রী অথবা ভাই-বোন ব্যক্তিগত জিঘাংসার বশবর্তী হয়ে অহেতুক অপবাদ আরোপ করার সুযোগ না পায় অথবা অন্য অমঙ্গলকামী লোকেরা শত্রুতাবশতঃ অপবাদ আরোপ করতে সাহসী না হয়। কেননা, চার জনের কম পুরুষ ব্যভিচারের সাক্ষ্য দিলে তাদের সাক্ষী গ্রহণীয় নয়। এমতাবস্থায় বাদী ও সাক্ষীরা সবাই মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হবে এবং একজন মুসলিমের চরিত্রে কলংক আরোপ করার দায়ে তাদেরকে 'হদ্দে-কযফ' বা অপবাদের শাস্তি ভোগ করতে হবে। [তাফসীরে জাকারিয়া]

وَ الَّذٰنِ یَاۡتِیٰنِهَا مِنۡکُمۡ فَاٰذُوۡهُمَا ۚ فَاِنۡ تَابَا وَ اَصۡلَحَا فَاَعۡرِضُوۡا عَنۡهُمَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ کَانَ تَوَّابًا رَّحِیۡمًا

১৬. আর তোমাদের মধ্যে যে দুজন এতে লিপ্ত হবে তাদেরকে শাস্তি দেবে। যদি তারা তাওবাহ করে এবং নিজেদেরকে সংশোধন করে নেয় তবে তাদের থেকে বিরত থাকবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরম তাওবাহ কবুলকারী, পরম দয়ালু।

কেউ কেউ এর অর্থ নিয়েছেন সমলিঙ্গী ব্যভিচার; যাতে দু'জন পুরুষ আপোসে এ কুকাজ সম্পাদন করে থাকে। আবার কেউ এর অর্থ নিয়েছেন, অবিবাহিত পুরুষ ও মহিলা। আর পূর্বের আয়াতকে তাঁরা বিবাহিত পুরুষ ও মহিলার সাথে নির্দিষ্ট করেছেন। আবার কেউ কেউ এই দ্বিবচন শব্দের অর্থ করেছেন, পুরুষ ও মহিলা। তাতে তারা বিবাহিত হোক বা অবিবাহিত। ইবনে জারীর ত্বাবারী দ্বিতীয় অর্থ অর্থাৎ, অবিবাহিত পুরুষ ও মহিলা অর্থকেই প্রাধান্য দিয়েছেন এবং পূর্বের আয়াতে বর্ণিত শাস্তিকে নবী করীম (সাঃ) কর্তৃক বর্ণিত শাস্তি দ্বারা ও এই আয়াতে বর্ণিত শাস্তিকে সূরা নূরে বর্ণিত একশ' বেত্রাঘাত শাস্তি দ্বারা রহিত সাব্যস্ত করেছেন। [তাফসীর ত্বাবারী]

اِنَّمَا التَّوۡبَۃُ عَلَی اللّٰهِ لِلَّذِیۡنَ یَعۡمَلُوۡنَ السُّوۡٓءَ بِجَهَالَۃٍ ثُمَّ یَتُوۡبُوۡنَ مِنۡ قَرِیۡبٍ فَاُولٰٓئِکَ یَتُوۡبُ اللّٰهُ عَلَیۡهِمۡ ؕ وَ کَانَ اللّٰهُ عَلِیۡمًا حَکِیۡمًا

১৭. আল্লাহ অবশ্যই সেসব লোকের তাওবাহ কবুল করবেন যারা অজ্ঞতাবশতঃ মন্দ কাজ করে এবং তাড়াতাড়ি তাওবাহ করে, এরাই তারা, যাদের তাওবাহ আল্লাহ কবুল করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কুরআনুল কারীমে بِجَهَالَۃٍশব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এ থেকে বাহ্যতঃ বোঝা যায়, অজ্ঞাতসারে এবং না জেনে-শুনে গোনাহ করলে তাওবা কবুল হবে এবং জ্ঞাতসারে জেনে-শুনে গোনাহ করলে তাওবা কবুল হবে না। কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম এ আয়াতের যে তাফসীর করেছেন তা এই যে, এখানে আয়াতের بِجَهَالَۃٍঅর্থ এই নয় যে, সে গোনাহর কাজটি যে গোনাহ, তা জানে না কিংবা গোনাহর ইচ্ছা নেই; বরং অর্থ এই যে, গোনাহর অশুভ পরিণাম ও আখেরাতের আযাবের ব্যাপারে গাফেল বা অসতর্কতাই তার গোনাহর কাজ করার কারণ; যদিও গোনাহটি যে গোনাহ, তা সে জানে এবং তার ইচ্ছাও করে। তাই جهالةশব্দটি এখানে নির্বুদ্ধিতা ও বোকামির অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আবুল আলিয়া ও কাতাদাহর বর্ণনা মতে সাহাবায়ে কেরাম এ বিষয়ে একমত ছিলেন যে, বান্দা যে গোনাহ্ করে- অনিচ্ছাকৃত করুক কিংবা ইচ্ছাকৃত, সর্বাবস্থায়ই তা মূর্খতা।

তাফসীরবিদ মুজাহিদ বলেন, যে ব্যক্তি কোন কাজে আল্লাহর নাফরমানী করছে, সে দৃশ্যতঃ বড় আলেম ও বিশেষ জানা-শোনা বিচক্ষণ হলেও সে কাজ করার সময় মূর্খই হয়ে যায়। ইকরিমা বলেন, দুনিয়ার যেসব কাজ আল্লাহর আনুগত্যের বাইরে, সেগুলো সবই মূর্খতা। কারণ এই যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর নাফরমানী করে, সে ক্ষণস্থায়ী সুখকে চিরস্থায়ী সুখের উপর অগ্রাধিকার প্রদান করে। যে ব্যক্তি এই ক্ষণস্থায়ী সুখের বিনিময়ে চিরস্থায়ী কঠোর আযাব ক্রয় করে, তাকে বুদ্ধিমান বলা যায় না। তাকে সবাই মূর্খ বলবে, যদিও সে ভালভাবে জানা ও বোঝার পরও ইচ্ছাকৃতভাবে সে কুকর্ম সম্পাদন করে। মোটকথা, গোনাহর কাজ ইচ্ছাকৃতভাবে হোক কিংবা ভুলক্রমে, উভয় অবস্থাতেই তা মূর্খতাবশতঃ সম্পন্ন হয়। এ কারণেই সাহাবা, তাবেয়ীন ও সমগ্র উম্মতের এ ব্যাপারে ইজমা বা ঐকমত্য রয়েছে যে, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন গোনাহ করে, শর্তসাপেক্ষে তার তাওবাও কবুল হতে পারে। তাছাড়া আয়াতের আরেক অর্থ এও হতে পারে যে, তারা গোনাহ করার সময় এর পরিণাম সম্পর্কে

সঠিক জ্ঞান রাখে না। অথবা সে অপরাধ করার সময় আল্লাহ যে তাকে দেখছেন সে ব্যাপারে বেখবর হয়ে পড়ে। অথবা সে যখন অপরাধ করে তখন যে তার ঈমানের মধ্যে দূর্বলতা আসবে সে সম্পর্কে গাফেল হয়ে পড়ে। [তাফসীরে সা'দী]

এখানে তাড়াতাড়ি তাওবাহ করা শর্তের অর্থ হলো দুটি- (এক) মৃত্যুর বড় শ্বাস বের না হওয়ার আগ পর্যন্ত করা। [তিরমিযীঃ ৩৫৩৭, ইবন মাজাহঃ ৪২৫৩] (দুই) সূর্য পশ্চিম দিকে উদিত হওয়ার আগ পর্যন্ত করা।

وَ لَيۡسَتِ التَّوۡبَۃُ لِلَّذِيۡنَ يَعۡمَلُوۡنَ السَّيِّاٰتِ ۚ حَتّٰۤى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الۡمَوۡتُ قَالَ اِنِّىۡ تُبۡتُ الۡـٰٔنَ وَ لَا الَّذِيۡنَ يَمُوۡتُوۡنَ وَ هُمۡ كُفَّارٌ ؕ اُولٰٓـئِكَ اَعۡتَدۡنَا لَهُمۡ عَذَابًا اَلِيۡمًا

১৮. তাওবাহ্ তাদের জন্য নয় যারা আজীবন মন্দ কাজ করে, অবশেষে তাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হলে সে বলে, 'আমি এখন তাওবাহ করছি' এবং তাদের জন্যও নয়, যাদের মৃত্যু হয় কাফের অবস্থায়। এরাই তারা যাদের জন্য আমরা কষ্টদায়ক শাস্তির ব্যবস্থা করেছি।

তাওবার অর্থ হচ্ছে ফিরে আসা। গোনাহ করার পর বান্দার আল্লাহর কাছে তাওবা করার অর্থ হচ্ছে এই যে, যে দাসটি তার প্রভুর নাফরমান ও অবাধ্য হয়ে প্রভুর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল সে এখন নিজের কার্যকলাপে অনুতপ্ত। সে প্রভুর আনুগত্য করার ও তাঁর হুকুম মেনে চলার জন্য ফিরে এসেছে। আর আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার দিকে তাওবা করার মানে হচ্ছে এই যে, দাসের ওপর থেকে প্রভুর যে অনুগ্রহ দৃষ্টি সরে গিয়েছিল তা আবার নতুন করে তার প্রতি নিবদ্ধ হয়েছে। মহান আল্লাহ এ আয়াতে বলেন, আমার এখানে ক্ষমতার দরজা একমাত্র সেইসব বান্দার জন্য উন্মুক্ত রয়েছে, যারা ইচ্ছা করে নয় বরং অজ্ঞতার কারণে ভুল করে বসে এবং চোখের ওপর থেকে অজ্ঞতার পর্দা সরে গেলে লজ্জিত হয়ে নিজের ভুলের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী হয়। এহেন বান্দা তার ভুল বুঝতে পেরে যখনই প্রভু মহান রব্বুল আলামীনের দিকে ফিরে আসবে তখনই নিজের জন্য তাঁর দরজা উন্মুক্ত দেখতে পাবেঃ ------ "আমার এ দরবারে আশাভংগ হয় না কারো শতবার ভেঙেছো তাওবা, তবু তুমি ফিরে এসো।"

কিন্তু যারা আল্লাহকে ভয় না করে সারা জীবন বেপরোয়াভাবে গোনাহ করতে থাকে তারপর ঠিক যখন মৃত্যুর ফেরেশতা সামনে এসে দাঁড়ায় তখন আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে থাকে, তাদের জন্য কোন তাওবা নেই, তাদের গোনাহের কোন ক্ষমা নেই। এ বিষয়টিকে নবী ﷺ একটি হাদীসে এভাবে বর্ণনা করেছেনঃ "আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দার তাওবা কবুল করতে থাকেন যতক্ষণ মৃত্যুর আলামত দেখা না দেয়।" কারণ পরীক্ষার সময় উত্তীর্ণ হবার এবং জীবন গ্রন্থের সব পাতা শেষ হয়ে যাবার পর এখন আর ফিরে আসার সুযোগটাই বা কোথায়? এভাবে কোন ব্যক্তি যখন কুফরীর অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় নেয় এবং পরবর্তী সীমানায় প্রবেশ করে নিজের চোখেই সবকিছু প্রত্যক্ষ করে, দুনিয়ায় সে যা কিছু ভেবে এসেছিল এখন দেখছে আসল ব্যাপার তার সম্পূর্ণ বিপরীত, তখন তার ক্ষমা চাওয়ার কোন সুযোগই তো থাকে না। [তাফহীমুল কুরআন]

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرْهًا ؕ وَ لَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَاۤ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّاۤ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَ عَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰۤى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّ يَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا

১৯. হে ঈমানদারগণ! যবরদস্তি করে নারীদের উত্তরাধিকার হওয়া তোমাদের জন্য বৈধ নয়। তোমরা তাদেরকে যা দিয়েছ তা থেকে কিছু আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে অবরুদ্ধ করে রেখো না, যদি না তারা স্পষ্ট খারাপ আচরণ করে। আর তোমরা তাদের সাথে সৎভাবে জীবন যাপন করবে; তোমরা যদি তাদেরকে অপছন্দ কর তবে এমন হতে পারে যে, আল্লাহ যাতে প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন তোমরা তাকেই অপছন্দ করছ।

ইসলামপূর্ব যুগে পুরুষ নিজেকে স্ত্রীর জান ও মালের মালিক মনে করতো। স্ত্রী যার বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হতো, সে তার প্রাণকে নিজের মালিকানাধীন মনে করতো। স্বামীর মৃত্যুর পর তার ওয়ারিশরা যেমন তার ত্যাজ্য সম্পত্তির ওয়ারিশ ও মালিক হতো, তেমনি তার স্ত্রীরও ওয়ারিশ ও মালিক বলে গণ্য হতো। ইচ্ছা করলে নিজেই তাকে বিয়ে করতো কিংবা অন্যের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করে তাকে বিয়ে দিয়ে দিতো। স্বামীর অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র নিজেও পিতার মৃত্যুর পর তাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারতো। স্ত্রীর প্রাণেরই এই অবস্থা, তখন তার ধন-সম্পদের ব্যাপারটি তো বলাই বাহুল্য। যেসব অর্থ-সম্পদ স্ত্রী উত্তরাধিকারসূত্রে অথবা পিত্রালয় থেকে উপঢৌকন হিসেবে লাভ করতো, তারা সেগুলো হজম করে ফেলতো।

যদি কোন নারী তার নিজের অংশের ধন-সম্পদের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করেই নিত, তবে পুরুষরা তাকে অন্যত্র বিয়ে করতে বাধা দিত; যাতে সে এখানেই মারা যায় এবং ধন-সম্পদ তাদের অধিকারভুক্ত থেকে যায়। কোন কোন সময় স্ত্রীর কোন দোষ না থাকলেও তাকে তার প্রাপ্য প্রদান করতো না। আবার তালাক দিয়েও তাকে মুক্ত করত না। তালাক দিলেও অন্যত্র বিয়ে দিত না। যাতে তার মাহরের টাকা বাইরে না যায়। ইসলাম এসব কিছুর মুলোৎপাটন করে দিয়েছে। এ আয়াত সংক্রান্ত বেশ কিছু বর্ণনায় তা স্পষ্ট। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, ইসলামপূর্বযুগে কোন লোক মারা গেলে তার অভিভাবকরা তার স্ত্রীর অধিকারী হয়ে যেত। সে ইচ্ছে করলে তাকে বিয়ে করত অথবা অন্যের নিকট বিয়ে দিয়ে দিত। তখন এ আয়াতটি নাযিল হয় । [বুখারী ৪৫৭৯] অন্য বর্ণনায় এসেছে, কায়েস ইবন সালত এর পিতা মারা গেলে তার ছেলে তার পিতার স্ত্রীকে বিয়ে করতে চাইল। জাহেলিয়াতে যা তাদের অভ্যাস ছিল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন। [নাসায়ী: ১১৫]

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, এখানে স্পষ্ট খারাপ আচরণ বলতে, স্বামীর অবাধ্যতা ও স্বামীর সাথে শত্রুতা বোঝানো হয়েছে। যে মহিলা স্বামীর অবাধ্য সে মহিলা থেকে নিজেকে রক্ষার জন্য পুরুষটি তাকে দেয়া সম্পদ ফেরৎ নিতে পারবে। [তাবারী]

স্ত্রী যদি সুন্দরী না হয় অথবা তার মধ্যে এমন কোন ত্রুটি থাকে যে জন্য স্বামী তাকে অপছন্দ করে তাহলে এক্ষেত্রে স্বামীর তৎক্ষণাৎ হতাশ হয়ে তাকে পরিত্যাগ করতে উদ্যত হওয়া উচিত নয়। যতদূর সম্ভব তাকে অবশ্যি ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করতে হবে। অনেক সময় দেখা যায়, স্ত্রী সুন্দরী হয়না ঠিকই কিন্তু তার মধ্যে

অন্যান্য এমন কিছু গুণাবলী থাকে, যা দাম্পত্য জীবনে সুন্দর মুখের চাইতে অনেক বেশী গুরুত্ব লাভ করে। যদি সে তার এই গুণাবলী প্রকাশের সুযোগ পায়, তা হলে তার স্বামী রত্নটি যিনি প্রথম দিকে শুধুমাত্র স্ত্রীর অসুন্দর মুখশ্রী দেখে হতাশ হয়ে পড়ছিলেন, এখন দেখা যাবে তার চরিত্র মাধুর্যে তার প্রেমে আত্মহারা হয়ে পড়ছেন। এমনিভাবে অনেক সময় দাম্পত্য জীবেনর শুরুতে স্ত্রীর কোন কোন কথা ও আচরণ স্বামীর কাছে বিরক্তিকর ঠেকে এবং এ জন্য স্ত্রীর ব্যাপারে তার মন ভেঙে পড়ে। কিন্তু সে ধৈর্য্য ধারণ করলে এবং স্ত্রীকে তার সম্ভাব্য সকল যোগ্যতার বাস্তবায়নের সুযোগ দিলে সে নিজেই অনুধাবন করতে পারে যে, তার স্ত্রীর মধ্যে দোষের তুলনায় গুণ অনেক বেশী। কাজেই দাম্পত্য সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করা মোটেই পছন্দনীয় নয়। তালাক হচ্ছে সর্বশেষ উপায়। একান্ত অপরিহার্য ও অনিবার্য অবস্থায়ই এর ব্যবহার হওয়া উচিত। নবী ﷺ বলেনঃ তালাক জায়েয হলেও দুনিয়ার সমস্ত জায়েয কাজের মধ্যে এটি আল্লাহর কাছে সবচাইতে অপছন্দনীয়। [তাফহীমুল কুরআন]

আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা এই আয়াতের তাফসীরে বলেনঃ এর অর্থ হল স্বামী স্ত্রীকে ভালবাসবে, তারপর তাদের মধ্যে আল্লাহ সন্তান দান করবেন যে সন্তান তাদের মধ্যে প্রভূত কল্যাণ নিয়ে আসবেন বা স্বামীর মনে স্ত্রীর জন্য ভালবাসা তৈরী করে দিবেন। [তাবারী] এছাড়া হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মুমিন পুরুষ কোন মুমিন নারীকে ঘৃণা করবে না। যদি তার কোন চরিত্রের কোন একটি দিক তাকে অসন্তুষ্ট করে, তবে অন্য দিক তাকে সন্তুষ্ট করবে। [মুসলিমঃ ১৪৬৯]

তাদের সাথে উত্তম কথা বলবে। কথায়, কাজে, চলাফেরায় যতটুকু সম্ভব সৌন্দর্য রক্ষা করবে। যেমনটি তুমি তাদের কাছ থেকে আশা কর, তেমন ব্যবহারই করো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তোমাদের মধ্যে উত্তম হলো ঐ ব্যক্তি যে তার পরিবারের কাছে উত্তম। আমি আমার পরিবারের কাছে উত্তম। [তিরমিযীঃ ৩৮৯৫] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চারিত্রিক সৌন্দর্যের মধ্যে এটা ছিল যে, তিনি সদাহাস্য সুন্দর ব্যবহার করতেন। পরিবারের সাথে হাস্যরস, নরম ব্যবহার ইত্যাদি করতেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার সাথে কখনো কখনো দৌড় প্রতিযোগিতা করতেন। [দেখুন- আবু দাউদঃ ২৫৭৮, ইবন মাজাহঃ ১৯৭৯, মুসনাদে আহমাদঃ ৬/১২৯]

وَ اِنۡ اَرَدۡتُّمُ اسۡتِبۡدَالَ زَوۡجٍ مَّكَانَ زَوۡجٍ ۙ وَّ اٰتَیۡتُمۡ اِحۡدٰهُنَّ قِنۡطَارًا فَلَا تَاۡخُذُوۡا مِنۡهُ شَیۡـًٔا ؕ اَتَاۡخُذُوۡنَهٗ بُهۡتَانًا وَّ اِثۡمًا مُّبِیۡنًا

২০. আর তোমরা যদি এক স্ত্রীর জায়গায় অন্য স্ত্রী গ্রহণ করা স্থির কর এবং তাদের একজনকে অনেক অর্থও দিয়ে থাক, তবুও তা থেকে কিছুই ফেরত নিও না। তোমরা কি মিথ্যা অপবাদ এবং প্রকাশ্য পাপাচরণ দ্বারা তা গ্রহণ করবে?

স্বামী নিজ ইচ্ছায় তালাক দিলে স্ত্রীর কাছ থেকে মোহর ফেরৎ নিতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। قِنۡطَارٌবলা হয় ধন-ভান্ডার এবং প্রচুর সম্পদকে। অর্থাৎ, মোহর যতটা পরিমাণই হোক না কেন তা ফেরৎ নিতে পারবে না। যদি এ রকম কর, তাহলে তা যুলুম এবং প্রকাশ্য পাপ হবে।

وَ كَیۡفَ تَاۡخُذُوۡنَهٗ وَ قَدۡ اَفۡضٰی بَعۡضُكُمۡ اِلٰی بَعۡضٍ وَّ اَخَذۡنَ مِنۡكُمۡ مِّیۡثَاقًا غَلِیۡظًا

২১. আর কিভাবে তোমরা তা গ্রহণ করবে, যখন তোমরা একে অপরের সাথে সংগত হয়েছ এবং তারা তোমাদের কাছ থেকে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি নিয়েছে?

দৃঢ় প্রতিশ্রুতি বা পাকাপোক্ত অঙ্গীকার বলে বিয়ে বুঝানো হয়েছে। কারণ বিয়ের সময় মাহর দেয়া এবং স্ত্রীকে সঠিকভাবে পরিচালনা কিংবা সুন্দরভাবে বিদায় করার অঙ্গীকার করার মত চুক্তি সংঘটিত হয়ে থাকে। সুতরাং একে অপরের সাথে মেলামেশা ও চুক্তিবদ্ধ হওয়ার পর এ জাতীয় আচরণ অমানবিক ও অগ্রহণযোগ্য।

উপরোক্ত আয়াতগুলোতে অর্থ ফেরত গ্রহণ যে জুলুম ও গোনাহ্ এ বিষয়টি তিন পর্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমে বলা হয়েছেঃ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا অর্থাৎ তোমরা কি স্ত্রীর প্রতি ব্যভিচার ইত্যাদির অপবাদ আরোপ করে প্রদত্ত অর্থ ফেরত গ্রহণের পথ বের করতে চাও ? অর্থাৎ যখন একথা জানা যায় যে, প্রদত্ত অর্থ ফেরত গ্রহণ তখনই জায়েয, যখন স্ত্রী কোন অশোভন কাজ করে। তখন তার কাছ থেকে অর্থ ফেরত গ্রহণ করার মানে প্রকৃতপক্ষে এরূপ ঘোষণা করা যে, সে কোন অশোভন কাণ্ড ও নির্লজ্জতা ইত্যাদি করেছে। মুখে তার প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করুক বা না করুক, এমতাবস্থায় এটা অপবাদেরই একটা রূপ। এটা যে প্রকাশ্য গোনাহ তা বলাই বাহুল্য।

দ্বিতীয় পর্যায় বর্ণনা করে বলা হয়েছেঃ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ – অর্থাৎ এখন তোমরা কেমন করে স্বীয় অর্থ তাদের কাছ থেকে ফেরত গ্রহণ করতে পার, যখন শুধু বিয়েই নয়, অবাধ নির্জনবাস এবং পরস্পরের মাঝে মিলনও হয়ে গেছে ? কেননা, এমতাবস্থায় প্রদত্ত অর্থ মোহরানা হলে স্ত্রী তার পূর্ণ অধিকারিণী ও মালিক হয়ে গেছে। কারণ, যে আপন সত্তাকে স্বামীর হাতে সমর্পণ করে দিয়েছে। এখন তা ফেরত নেওয়ার কোন ন্যায়সঙ্গত অধিকার স্বামীর নেই। আর যদি প্রদত্ত অর্থ উপঢৌকন হয়, তবুও এমতাবস্থায় তা ফেরত দেওয়া সম্ভবপর নয়। কেননা, স্বামী-স্ত্রী পরস্পর একে অপরকে দান করলে তা ফেরত গ্রহণ শরয়ীতমতে সিদ্ধ নয় এবং আইনতও তা কার্যকর হয় না । মোট কথা, বৈবাহিক সম্পর্ক দান—ফেরত গ্রহণের পরিপন্থী।

এ বিষয়টিই তৃতীয় পর্যায়ে বর্ণনা করে বলা হয়েছেঃ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا অর্থাৎ নারীরা তোমাদের কাছ থেকে সুদৃঢ় অঙ্গীকার নিয়ে নিয়েছে। এতে বিবাহবন্ধনে অঙ্গীকার বোঝানো হয়েছে, যা আল্লাহর নামে খোতবা সহকারে জনসমক্ষে করা হয়।

মোট কথা এই যে, বৈবাহিক অঙ্গীকার ও পারস্পরিক মিলনের পর প্রদত্ত অর্থ ফেরতদানের জন্য স্ত্রীকে বাধ্য করা প্রকাশ্য জুলুম ও অবিচার। মুসলমানদের এ রূপ আচরণ থেকে বেঁচে থাকা অপরিহার্য। [মাআরিফুল কুরআন]

وَ لَا تَنۡكِحُوۡا مَا نَكَحَ اٰبَآؤُكُمۡ مِّنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَ ؕ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّ مَقۡتًا ؕ وَ سَآءَ سَبِيۡلًا

২২. নারীদের মধ্যে তোমাদের পিতৃ পুরুষ যাদেরকে বিয়ে করেছে, তোমরা তাদেরকে বিয়ে করো না, তবে পূর্বে যা সংঘটিত হয়েছে (সেটা ক্ষমা করা হলো) নিশ্চয় তা ছিল অশ্লীল, মারাত্মক ঘৃণ্য ও নিকৃষ্ট পন্থা।

জাহেলিয়াত যুগে পিতার মৃত্যুর পর তার স্ত্রীকে পুত্ররা বিনাদ্বিধায় বিয়ে করে নিত। [দেখুনঃ বুখারীঃ ৪৫৭৯] এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এই নির্লজ্জ কাজটি নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন এবং একে 'আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ বলে অভিহিত করেছেন। বলাবাহুল্য, যাকে দীর্ঘদিন পর্যন্ত মা বলা হয়, পিতার মৃত্যুর পর তাকে স্ত্রী করে রাখা মানব-চরিত্রের জন্য অপমৃত্যু ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। আলেমগণ বলেন, পিতা কোন নারীকে বিয়ে করার সাথে সাথেই সন্তানদের জন্য সে নারী হারাম হয়ে যাবে। চাই তার সাথে পিতার সহবাস হোক বা না হোক।

অনুরূপভাবে যে নারীকে পুত্র বিয়ে করেছে সেও পিতার জন্য হারাম হয়ে যাবে, তার সাথে পুত্রের সহবাস হোক বা না হোক [তাবারী]

আবু বুরদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু মতান্তরে হারেস ইবন আমের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে পাঠিয়েছেন এমন লোকের কাছে যে তার পিতার মৃত্যুর পরে পিতার স্ত্রীকে বিয়ে করেছে- যেন তাকে হত্যা করা হয় এবং তার যাবতীয় সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়। [আবু দাউদঃ ৪৪৫৭, মুসনাদে আহমাদঃ ৪/২৯৭, তিরমিযীঃ ১৩৬২, ইবন মাজাহঃ ২৬০৭]

ফুটনোট

◘ ব্যভিচার একটি জঘন্য অপরাধ, যা যুবকদের বিবাহের প্রতি নিরুৎসাহিত করে, নারীর জীবন ধ্বংস করে, সমাজে পাপ কাজের সয়লাব হয়, আল্লাহ তা'আলার গযব ডেকে নিয়ে আসে সর্বপোরি বংশনামা নষ্ট হয়।

◘ ব্যভিচারের সাক্ষীদের ব্যাপারে - চার জন পুরুষ হওয়া জরুরী সাব্যস্ত করা হয়েছে।

◘ যারা আল্লাহকে ভয় না করে সারা জীবন বেপরোয়াভাবে গোনাহ করতে থাকে তারপর ঠিক যখন মৃত্যুর ফেরেশতা সামনে এসে দাঁড়ায় তখন আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে থাকে, তাদের জন্য কোন তাওবা নেই, তাদের গোনাহের কোন ক্ষমা নেই।

◘ তাওবার অর্থ হচ্ছে ফিরে আসা। গোনাহ করার পর বান্দার আল্লাহর কাছে তাওবা করার অর্থ হচ্ছে এই যে, যে দাসটি তার প্রভুর নাফরমান ও অবাধ্য হয়ে প্রভুর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল সে এখন নিজের কার্যকলাপে অনুতপ্ত। সে প্রভুর আনুগত্য করার ও তাঁর হুকুম মেনে চলার জন্য ফিরে এসেছে।

◘ ফিরআউনের মত তাওবাহ করলে তা কবুল হবে না।

◘ জেনেশুনে অপরাধ করলে তার জন্য অবশ্যই পাকড়াও করা হবে।

◘ স্বামী নিজ ইচ্ছায় তালাক দিলে স্ত্রীর কাছ থেকে মোহর ফেরৎ নিতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। অন্যায়ভাবে স্ত্রীদের ওপর সংকীর্ণতা সৃষ্টি করা হারাম।

◘ জাহেলিয়াত যুগে পিতার মৃত্যুর পর তার স্ত্রীকে পুত্ররা বিনাদ্বিধায় বিয়ে করে নিত। আল্লাহ তা'আলা এই নির্লজ্জ কাজটি নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন এবং একে 'আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ, অশ্লীল ও নিকৃষ্ট বলে অভিহিত করেছেন।

কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২৪
প্রস্তুতি সহায়ক তাফসীর নোট পর্বঃ ৯

সূরা আন নিসা (২৩-৩৩)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ وَ بَنٰتُكُمْ وَ اَخَوٰتُكُمْ وَ عَمّٰتُكُمْ وَ خٰلٰتُكُمْ وَ بَنٰتُ الْاَخِ وَ بَنٰتُ الْاُخْتِ وَ اُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِیْۤ اَرْضَعْنَكُمْ وَ اَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَ اُمَّهٰتُ نِسَآئِكُمْ وَ رَبَآئِبُكُمُ الّٰتِیْ فِیْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَآئِكُمُ الّٰتِیْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ۫ فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۫ وَ حَلَآئِلُ اَبْنَآئِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ ۙ وَ اَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

২৩. তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের মা, মেয়ে, বোন, ফুফু, খালা, ভাইয়ের মেয়ে, বোনের মেয়ে, দুধমা, দুধবোন, শাশুড়ী ও তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যার সাথে সংগত হয়েছ তার আগের স্বামীর ঔরসে তার গর্ভজাত মেয়ে, যারা তোমাদের অভিভাবকত্ব আছে, তবে যদি তাদের সাথে সঙ্গত না হয়ে থাক, তাতে তোমাদের কোন অপরাধ নেই। আর তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ তোমাদের ঔরসজাত ছেলের স্ত্রী ও দুই বোনকে একত্র করা, আগে যা হয়েছে, হয়েছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

আলোচ্য আয়াতসমূহে যাদের সাথে বিয়ে হারাম, এমন নারীদের বিবরণ দেয়া হয়েছে। তারা তিনভাগে বিভক্তঃ এক. ঐ সমস্ত হারাম নারী কোন অবস্থাতেই হালাল হয় না, তাদেরকে 'মুহাররামাতে আবাদীয়্যা' বা 'চিরতরে হারাম মহিলা' বলা হয়। এ জাতীয় মহিলা তিন শ্রেণীরঃ (১) বংশগত হারাম নারী, (২) দুধের কারণে হারাম নারী এবং (৩) শ্বশুর সম্পর্কের কারণে হারাম নারী চিরতরে হারাম। দুই. কোন কোন নারী চিরতরে হারাম নয়, কোন কোন অবস্থায় তারা হালালও হয়ে যায়। তাদেরকে 'মুহাররামাতে মুআক্কাতাহ' বা সাময়িক কারণে হারাম বলা হয়। এরা আবার দু' শ্রেণীতে বিভক্তঃ (১) পরস্ত্রী সে যতক্ষণ পর্যন্ত পরের স্ত্রী থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত হারাম। কিন্তু যখনই অপরের স্ত্রী হওয়া থেকে মুক্ত হবে তখনই সে হালাল হয়ে যাবে। (২) কোন কোন মহিলা শুধুমাত্র অন্যের সাথে একসাথে বিবাহ করা হারাম। ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিবাহ করা হারাম নয়। যেমন, দুই বোনকে একসাথে স্ত্রী হিসেবে রাখা। খালা ও বোনঝিকে একসাথে স্ত্রী হিসেবে রাখা।

মায়েরা বলতে মায়ের মা (নানী), মায়ের দাদী এবং বাপের মা (দাদী) ও দাদীর মা ও তার দাদী এইভাবে পর্যায়ক্রমে যত আসবে সকলেই মায়ের আওতায় পড়বে। আর মেয়ের আওতায় পড়বে, পুতনীরা, নাতনীরা এবং পুতনী ও নাতনীদের মেয়েরা। ব্যভিচারের মাধ্যমে জন্ম লাভকারিণী বেটি মেয়ের মধ্যে শামিল হবে কি না এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। তিন ইমাম তাকে মেয়ের মধ্যেই শামিল করেছেন এবং তার সাথে বিবাহ হারাম মনে করেছেন। তবে ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, সে বিধিসম্মত মেয়ে নয়।

কাজেই যেভাবে সে [يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلَادِكُمْ](মহান আল্লাহ তোমাদেরকে ত্যক্ত সম্পদ সন্তানদের মধ্যে বণ্টন করার নির্দেশ দিচ্ছেন।) সন্তানের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং সকলের ঐক্যমতে সে ওয়ারিস হয় না, অনুরূপ সে এই আয়াতেও মেয়ের মধ্যে শামিল হবে না। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত। (ইবনে কাসীর) বোনের পর্যায়ে পড়বে

সহোদরা বোন, বৈপিত্রেয়ী বোন এবং বৈমাত্রেয়ী বোন সকলেই। ফুফুর মধ্যে বাপের, নানার এবং দাদার তিন প্রকার বোনরা শামিল। খালার অন্তর্ভুক্ত হল, মায়ের এবং নানী ও দাদীর তিন প্রকারের বোনরা। ভাইঝি বলতে তিন প্রকার (সহোদর, বৈপিত্রেয় ও বৈমাত্রেয়) ভাইদের আপন মেয়ে এবং তাদের মেয়েদের মেয়ে সকলেই শামিল। ভাগ্নীর পর্যায়ে পড়ে তিন প্রকার বোনদের আপন মেয়ে এবং তাদের মেয়েদের মেয়ে।

দুধ সম্পর্কের কারণে যারা হারাম তারা হল, দুধ মা, যার দুধ আপনি দুধ পানের নির্দিষ্ট সময়ে (অর্থাৎ, দু'বছরের মধ্যেই) পান করেছেন। দুধ বোন, সেই মহিলা যাকে আপনার আপন মা অথবা দুধমা দুধ পান করিয়েছে। আপনার সাথেই পান করিয়ে থাক অথবা আপনার আগেই কিংবা আপনার পরে আপনার অন্য ভাই-বোনদের সাথে পান করিয়ে থাক। অনুরূপ যে মহিলার আপন মা অথবা দুধমা আপনাকে দুধ পান করিয়েছে, যদিও বিভিন্ন সময়ে পান করিয়ে থাকে। দুধ পানের কারণে সেই সমস্ত সম্পর্ক হারাম হয়ে যাবে, যা বংশীয় কারণে হারাম হয়। অর্থাৎ, দুধ মায়ের বংশীয় ও দুধ সম্পর্কের সন্তানরা দুধ পানকারীর ভাই-বোন, এই মায়ের স্বামী তার পিতা, এই পিতার বোনরা তার ফুফু, এই মায়ের বোনরা তার খালা, এবং এই মায়ের স্বামীর ভায়েরা তার চাচা হয়ে যাবে। আর দুধ পানকারী শিশুর বংশীয় ভাই-বোন ইত্যাদি দুধ পানের কারণে এই পরিবারের উপর হারাম হবে না।

বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে যারা হারাম হয় তারা হল, স্ত্রীর মা অর্থাৎ, শাশুড়ী। (স্ত্রীর নানী-দাদীও এর অন্তর্ভুক্ত হবে) যদি কোন মহিলাকে বিবাহ করার পরে পরেই সহবাস না করেই তালাক দিয়ে দেয়, তবুও তার মায়ের (শাশুড়ীর) সাথে বিবাহ হারাম হবে। তবে যদি কোন মহিলাকে বিয়ের পর সহবাস না করেই তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে তার মেয়েকে বিবাহ করা জায়েয হবে। (ফাতহুল ক্বাদীর) رَبِيْبَة'রাবীবা' (সৎ বেটী) স্ত্রীর আগের স্বামীর মেয়ে। এটা শর্তের ভিত্তিতে হারাম হয়। যেমন, যদি সৎ বেটীর মায়ের সাথে সহবাস করে নেয় তবেই সে হারাম হবে, অন্যথা তার সাথে বিয়ে হালাল।فِي حُجُوْرِكُمْ (যারা তোমাদের অভিভাবকত্বে আছে) এটা অধিকাংশ অবস্থার দিকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে, শর্ত হিসাবে বলা হয়নি। অতএব এই মেয়ে যদি কোন অন্য কারো অভিভাবকত্বে বা অন্য স্থানে লালিতা-পালিতা হয় বা অন্য জায়গায় বসবাস করে থাকে, তবুও তার সাথে বিবাহ হারাম। حلائل হলحَلِيْلَةٌ এর বহুবচন। حَلَّ يَحِلُّ (অবতরণ করা) ধাতু থেকে فَعِيْلَةٌ এর ওজনে فَاعِلَةٌ এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। স্ত্রীকে 'হালীলা' এই জন্য বলা হয়েছে যে, তার (অবতরণের জায়গা) বাসস্থান স্বামীর সাথেই হয়। অর্থাৎ, যেখানে স্বামী অবতরণ করে বা বসবাস করে, সেখানে সেও অবতরণ করে বা বসবাস করে। পোতা ও নাতীরাও পুত্রের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ, তাদের স্ত্রীদের সাথেও বিবাহ হারাম।

যারা তোমাদের অভিভাবকত্ব আছে- এখানে অভিভাবকত্ব থাকার কথাটা শর্ত হিসাবে নয়; বরং সাধারণতঃ এ ধরনের মেয়েরা মায়ের সাথেই থাকে আর মা দ্বিতীয় বিবাহের কারণে তার স্বামীর কাছেই থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। সুতরাং এ ধরনের মেয়েদের অভিভাবকত্ব থাকা না থাকা উভয় অবস্থাতেই তাদের বিয়ে করা হারাম। উম্মে হাবীব রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেনঃ আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি কি আবু সুফিয়ানের মেয়েকে বিয়ে করবেন? রাসূল বললেন যে, তাকে বিয়ে করা আমার জন্য জায়েয হবে না। আমি বললাম, আমি শুনেছি আপনি নাকি বিয়ের প্রস্তাব দিচ্ছেন। রাসূল বললেন, তুমি কি উম্মে সালামার মেয়ের কথা বলছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, যদি সে আমার রাবীবা নাও হত তারপরও

আমার জন্য জায়েয হত না। কেননা, আমাকে এবং তার পিতাকে সুআইবাহ দুধ পান করিয়েছেন। তোমরা তোমাদের কন্যাদের এবং তোমাদের বোনদের আমার কাছে বিয়ের জন্য পেশ করো না। [বুখারীঃ ৫১০৬]

আগে যা হয়েছে, হয়েছে- এখানে বুঝানো হয়েছে যে, পূর্বে এ ধরনের যা কিছু ঘটেছে তা আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দেবেন। কিন্তু যদি কেউ এরূপ অবস্থায় ইসলামে প্রবেশ করে তবে তাদের মধ্য থেকে দু'জনের একজনকে তালাক দিতে হবে। হাদীসে এসেছে, ফাইরোয আদ-দাইলামী বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললামঃ আমি ঈমান এনেছি অথচ দুই বোন আমার স্ত্রী হিসেবে আছে। রাসূল বললেনঃ তুমি তাদের যে কোন একজনকে তালাক দিয়ে দাও। [ইবন মাজাহঃ ১৯৫১, তিরমিযীঃ ১১২৯] অনুরূপভাবে এ একত্রিতকরণের মাসআলার মধ্যে এমন দু'জনকেও একত্রে বিয়ে করা জায়েয নাই, যাদের একজন পুরুষ সাব্যস্ত হলে অন্যজনের জন্য তাকে বিয়ে করা জায়েয হত না। এজন্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন মহিলা এবং তার ফুফু। অনুরূপভাবে কোন মহিলা ও তার খালাকে একত্রে বিয়ে করা যাবে না। [বুখারীঃ ৫১০৯]

وَّ الۡمُحۡصَنٰتُ مِنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا مَلَکَتۡ اَیۡمَانُکُمۡ ۚ کِتٰبَ اللّٰهِ عَلَیۡکُمۡ ۚ وَ اُحِلَّ لَکُمۡ مَّا وَرَآءَ ذٰلِکُمۡ اَنۡ تَبۡتَغُوۡا بِاَمۡوَالِکُمۡ مُّحۡصِنِیۡنَ غَیۡرَ مُسٰفِحِیۡنَ ؕ فَمَا اسۡتَمۡتَعۡتُمۡ بِهٖ مِنۡهُنَّ فَاٰتُوۡهُنَّ اُجُوۡرَهُنَّ فَرِیۡضَةً ؕ وَ لَا جُنَاحَ عَلَیۡکُمۡ فِیۡمَا تَرٰضَیۡتُمۡ بِهٖ مِنۡۢ بَعۡدِ الۡفَرِیۡضَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ کَانَ عَلِیۡمًا حَکِیۡمًا

২৪. আর নারীদের মধ্যে তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসী ছাড়া সব সধবা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ, তোমাদের জন্য এগুলো আল্লাহর বিধান। উল্লেখিত নারীগণ ছাড়া অন্য নারীকে অর্থব্যয়ে বিয়ে করতে চাওয়া তোমাদের জন্য বৈধ করা হল, অবৈধ যৌন সম্পর্কের জন্য নয়। তাদের মধ্যে যাদেরকে তোমর সম্ভোগ করেছ তাদের নির্ধারিত মাহর অর্পণ করবে। মাহর নির্ধারণের পর কোন বিষয়ে পস্পর রাযী হলে তাতে তোমাদের কোন দোষ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

কুরআন কারীমে إِحْصَانٌশব্দটি চারটি অর্থে ব্যবহার হয়েছে। যথা, (ক) বিবাহ (খ) স্বাধীনতা (গ) সতীত্ব এবং (ঘ) ইসলাম। এই দিক দিয়ে مُحْصَنَاتএর হবে চারটি অর্থঃ (ক) বিবাহিতা মহিলাগণ (খ) স্বাধীন মহিলাগণ (গ) সতী-সাধ্বী মহিলাগণ এবং (ঘ) মুসলিম মহিলাগণ। এখানে প্রথম অর্থকে বুঝানো হয়েছে।

অধিকারভুক্ত দাসী বলতে ঐ সমস্ত নারীদেরকে বুঝায়, যারা কাফের ছিল। মুসলিমগণ যুদ্ধে তাদের পুরুষদের পরাজিত করে তাদেরকে নিজেদের অধিকারে নিয়ে আসে, তখন তাদেরকে মুসলিমদের জন্য বিয়ে ছাড়াই হালাল করা হয়েছে। আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ হুনাইনের যুদ্ধের দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল যোদ্ধাকে 'আওতাস'-এর দিকে পাঠান। তারা কাফেরদের উপর জয়ী হয়ে তাদের নারীদেরকে নিয়ে আসে। কিন্তু এরা কাফের নারী হওয়ার কারণে মুসলিমগণ তাদেরকে হালাল মনে করছিল না। তখন এই আয়াত নাযিল হয়ে জানিয়ে দেয়া হয় যে, এরা তাদের জন্য হালাল, তবে শর্ত হলো এদের ইদ্দত শেষ হতে হবে। [মুসলিমঃ ১৪৫৬]

যুদ্ধ-বন্দিনী দাসীদের সাথে সংগম করার ব্যাপারে কিছু নিয়মনীতি রয়েছে-

(এক) অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে, এটা শুধুমাত্র মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যে যুদ্ধ হলেই হতে পারে। কোন কারণে যদি মুসলিমদের মধ্যে পরস্পর যুদ্ধ হয়, কিংবা মুসলিম দুটি রাষ্ট্রে যুদ্ধের সূচনা হয়, অথবা মুসলিমদের কোন জাতিগত বা ভাষাগত বা রাজনৈতিক দাঙ্গা হয় সেখানে যে যুদ্ধ হবে সে যুদ্ধের কারণে কাউকে অধিকারভুক্ত দাস-দাসী বানানোর অধিকার ইসলাম কাউকে দেয়নি। যদি কেউ এটা করতে চায় তবে সেটা হবে সম্পূর্ণ অবৈধ ও ব্যভিচার। এ ধরনের লোকদেরকে ব্যভিচারের শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

(দুই) যে সমস্ত মেয়ে বন্দী হয় তাদেরকে ইসলামী আইন অনুযায়ী সরকারের হাতে সোপর্দ করে দিতে হবে। সরকার চাইলে তাদেরকে বিনা শর্তে মুক্ত করে দিতে পারে, মুক্তিপণ গ্রহণ করতে পারে, শত্রুর হাতে যে সমস্ত মুসলিম বন্দী রয়েছে তাদের সাথে এদের বিনিময়ও করতে পারে এবং চাইলে তাদেরকে সৈন্যদের মাঝে বন্টনও করে দিতে পারে। তাই বন্দী করার সাথে সাথেই কোন সৈনিক তাদের সাথে সংগম করার অধিকার লাভ করে না। তাছাড়া কোন ক্রমেই যুদ্ধাবস্থায় এ অধিকার কারও থাকবে না। যদি কেউ যুদ্ধাবস্থায় এ কাজ করে তবে তাকে শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

(তিন) মেয়েটি গর্ভবতী নয় এতটুকু নিশ্চিত হওয়ার জন্য কমপক্ষে এক মাসিক ঋতুশ্রাব পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। গর্ভবতী হলে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বে সংগম করা যাবে না।

(চার) যে মেয়েকে যার ভাগে দেয়া হবে সে-ই শুধু তাকে ভোগ করতে পারবে: অন্য কেউ নয়।

(পাঁচ) সন্তানের জননী হওয়ার পর এ মেয়েকে আর বিক্রয় করা যাবে না। মালিকের মৃত্যুর পরপরই সে স্বাধীন হয়ে যাবে।

(ছয়) মালিক ইচ্ছে করলে তাকে অন্য কারো কাছে বিয়ে দিতে পারবে। তখন তার খেদমত মালিকের হবে কিন্তু মালিক তার সাথে যৌন সম্পর্ক রাখতে পারবে না।

(সাত) কোন সেনাপতি যদি নিছক সাময়িকভাবে তার সৈন্যদেরকে বন্দিনী মেয়েদের মাধ্যমে নিজেদের যৌন তৃষ্ণা মেটানোর অনুমতি দেয়, তবে তা হবে সম্পূর্ণ অবৈধ। কেননা, এ কাজ ও ব্যভিচারের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে, এ আয়াতে মহিলাদের মধ্যে যাদের সাথে সম্ভোগ হয়েছে তাদেরকে মাহর পরিশোধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ হিসেবে এ আয়াত পূর্বোক্ত ২১ নং আয়াতের মতই। [আদওয়াউল বায়ান] কোন কোন মুফাসসিরের মতে, এখানে মুত'আ বিবাহের কথা বলা হয়েছে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুতাআ ও সাময়িক বিয়ের অনুমতি ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে অসংখ্য সহীহ হাদীসে এটাকে হারাম ঘোষণা করা হয়। যেমন এক হাদীসে এসেছে, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খায়বার যুদ্ধের কালে মুত'আ বিয়ে ও গৃহপালিত গাধার গোস্ত হারাম করেছেন। [বুখারী ৫১১৫, ৫৫২৩; আরও দেখুন বুখারীঃ ৪২১৬, মুসলিমঃ ১৪০৬, ১৪০৭]

কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, এরপর মক্কা বিজয়ের বছর সেটাকে আবার বৈধ করা হয়েছিল। কিন্তু সহীহ হাদীসে এসেছে যে, মক্কা থেকে বের হওয়ার আগেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, এ জাতীয় বিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত হারাম করে দেয়া হয়েছে। [মুসলিম: ১৪০৬] এ হিসেবে মুত'আ বিবাহ প্রথমে খায়বারের যুদ্ধে হারাম করা হয়। এরপর মক্কা বিজয়ের সময় হালাল করা হয়, অথবা কোন কোন সাহাবী রাসূলের অগোচরেই না জানা অবস্থায় সেটা করেন। কিন্তু মক্কা বিজয়ের বছর আওতাসের পর্যন্ত হারাম করে দেয়া হয়। [যাদুল মা'আদ]

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, মাহর নির্ধারণের পর কোন বিষয়ে পরস্পর রাযী হওয়ার অর্থ হচ্ছে, ধার্যকৃত পূর্ণ মাহর প্রদান করে স্ত্রীকে তার মাহরের ব্যাপারে পূর্ণ অধিকার প্রদান করা। [তাবারী; আত-তাফসীরুস সহীহ]

وَ مَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيٰتِكُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ؕ وَ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِكُمْ ؕ بَعْضُكُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ ۚ فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَ اٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ مُحْصَنٰتٍ غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ وَّ لَا مُتَّخِذٰتِ اَخْدَانٍ ۚ فَاِذَاۤ اُحْصِنَّ فَاِنْ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنٰتِ مِنَ الْعَذَابِ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ؕ وَ اَنْ تَصْبِرُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ؕ

২৫. আর তোমাদের মধ্যে কারো মুক্ত ঈমানদার নারী বিয়ের সামর্থ্য না থাকলে তোমরা তোমাদের অধিকারভুক্ত ঈমানদার দাসী বিয়ে করবে; আল্লাহ তোমাদের ঈমান সম্পর্কে পরিজ্ঞাত। তোমরা একে অপরের সমান; কাজেই তোমরা তাদেরকে বিয়ে করবে তাদের মালিকের অনুমতিক্রমে এবং তাদেরকে তাদের মাহর ন্যায়সংগতভাবে দেবে। তারা হবে সচ্চরিত্রা, ব্যভিচারিণী নয় ও উপপতি গ্রহণকারিণীও নয়। অতঃপর বিবাহিতা হওয়ার পর তাদের শাস্তি মুক্ত নারীর অর্ধেক; তোমাদের মধ্যে যারা ব্যভিচারকে ভয় করে এগুলো তাদের জন্য; আর ধৈর্য ধারণ করা তোমাদের জন্য মঙ্গল। আল্লাহ ক্ষমাপরায়ণ, পরম দয়ালু।

আয়াতের অর্থ এই যে, যার স্বাধীন নারীদেরকে বিয়ে করার শক্তি-সামর্থ্য নেই কিংবা প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র নেই, সে ঈমানদার দাসীদেরকে বিয়ে করতে পারে। এতে বোঝা গেল যে, যতটা সম্ভব স্বাধীন নারীকেই বিয়ে করা উচিত, দাসীকে বিয়ে না করাই বাঞ্ছনীয়। অগত্যা যদি দাসীকে বিয়ে করতেই হয়, তবে ঈমানদার দাসী খোঁজ করতে হবে। স্বাধীন ইয়াহুদী-নাসারা নারীদেরকে বিয়ে করা যদিও বৈধ, কিন্তু তা থেকে বেঁচে থাকা উত্তম। বর্তমান যুগে এর গুরুত্ব অত্যাধিক। কেননা, ইয়াহুদী ও নাসারা নারীরা আজকাল সাধারণতঃ স্বয়ং স্বামীকে ও স্বামীর সন্তানদেরকে স্বধর্মে আনার উদ্দেশ্যেই মুসলিমদেরকে বিয়ে করে।

ঈমানদার নয় এমন দাসী বিয়ে করা জায়েয নেই। অন্য আয়াতেও বলা হয়েছে, "আর কিতাবী মহিলাদের মধ্যে যারা মুহসিনা" [সূরা আল-মায়িদাহ: ৫] অর্থাৎ তাদেরকে বিয়ে করা হালাল করা হয়েছে। এখানে 'মুহসিনা' বলে কোন কোন মুফাসসিরের মতে স্বাধীন বোঝানো হয়েছে। সুতরাং কোন অবস্থাতেই কাফের দাসীদেরকে বিয়ে করা জায়েয নেই। যদিও তারা কিতাবী হয়। [তাবারী; আদওয়াউল বায়ান]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন মহিলা অপর মহিলাকে বিয়ে দেবে না। অনুরূপভাবে কোন মহিলা নিজেকেও বিয়ে দেবে না। যে মহিলা নিজেকে নিজে বিয়ে দেয়, সে ব্যভিচারে লিপ্ত। [ইবন মাজাহঃ ১৮৮২] অর্থাৎ বিয়ের ব্যাপারে অবশ্যই অভিভাবকদের অনুমতি নিতে হবে।

মুক্ত নারীর শাস্তির কথা এখানে বলা হয় নি। অন্যত্র বলে দেয়া হয়েছে যে, ব্যভিচারিনী মহিলা ও ব্যভিচার পুরুষের প্রত্যেককে একশত বেত্রাঘাত করা [সূরা আন-নূর: ২] সে হিসেবে এ আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, ব্যভিচারিনী দাসীর শাস্তি হবে পঞ্চাশ বেত্রাঘাত। কিন্তু ব্যভিচারী দাসের ব্যাপারটি ভিন্ন কোন আয়াতে আসে নি। তাই ব্যাভিচারিনী দাসীর শাস্তি যেভাবে অর্ধেক হয়েছে সেভাবে ব্যভিচারী দাসের ক্ষেত্রেও তেমনি অর্ধেক শাস্তি হবে; কারণ দাসত্বের দিক থেকে উভয়েই সমান। এটাও এক প্রকার কিয়াস। [আদওয়াউল বায়ান] তবে এটা জানা আবশ্যক যে, দাস-দাসীরা বিবাহিত হোক বা অবিবাহিত হোক তাদের কোন রজম তথা প্রস্তারাঘাতে মৃত্যুদণ্ড বা দেশান্তর নেই। [তাবারী]

দাসী বিয়ে করার চেয়ে ধৈর্যধারণ করা উত্তম। যাতে করে আল্লাহ্ তাআলা যখন তাকে সামর্থ দিবে, তখন যেন স্বাধীনা নারী বিয়ে করতে পারে। [তাবারী; আত-তাফসীরুস সহীহ]

يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَ يَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ يَتُوْبَ عَلَيْكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

২৬. আল্লাহ ইচ্ছে করেন তোমাদের কাছে বিশদভাবে বিবৃত করতে, তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতিনীতি তোমাদেরকে অবহিত করতে এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করতে। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

সূরার শুরু থেকে নিয়ে এ পর্যন্ত যে নির্দেশ ও বিধান দেয়া হয়েছে এবং এই সূরা নাযিলের পূর্বে সূরা বাকারায় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের সমস্যাবলী সমাধানের জন্য যে বিধান দেয়া হয়েছিল সেসবের দিকে সামগ্রিকভাবে একটি ইঙ্গিত করে বলা হচ্ছে, মানব সভ্যতার প্রাচীনতম যুগ থেকে প্রতি যুগের নবীগণ ও তাঁদের সৎ ও সত্যনিষ্ঠ অনুসারীগণ সমাজ, সংস্কৃতি ও নৈতিকতার এই আইনগুলো কার্যকর করে এসেছেন। আল্লাহ তাঁর অসীম অনুগ্রহের বদৌলতে তোমাদেরকে জাহেলীয়াতের অবস্থা থেকে বের করে সৎ ও সত্যনিষ্ঠ লোকদের জীবনধারার দিকে পরিচালিত করেছেন। [তাফহীমুল কুরআন]

وَ اللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْكُمْ ۟ وَ يُرِيْدُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الشَّهَوٰتِ اَنْ تَمِيْلُوْا مَيْلًا عَظِيْمًا

২৭. আর আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করতে চান। আর যারা কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে তারা চায় যে, তোমরা ভীষণভাবে পথচ্যুত হও।

আল্লাহ্ তোমাদেরকে তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের প্রশংসনীয় পথে চালাতে চান, যেন তোমরা তাঁর শরীয়তের উপর আমল করতে থাক যে কাজ তাঁর নিকট প্রিয় ও যে কাজে তিনি সন্তুষ্ট। তিনি তোমাদের তাওবা কবুল করতে চান। যে পাপ ও অন্যায়কার্য হতে তোমরা তাওবা করে থাক সে তাওবা তিনি সত্তর কবুল করে থাকেন। তিনি মহাজ্ঞানী ও মহা বিজ্ঞানময়। স্বীয় শরীয়তে, স্বীয় অনুমানে, স্বীয় কার্যে ও স্বীয় ঘঘাষণায় তিনি সঠিক জ্ঞান ও পর্ণ নিপুণতার অধিকারী। প্রবত্তি পূজারীরা অর্থাৎ শয়তানের দাস ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানেরা এবং অসৎ লোকেরা

তোমাদের পদস্খলন ঘটিয়ে তোমাদেরকে সত্য ও সরল পথ হতে সরিয়ে দিয়ে অন্যায় ও অসত্যের পথে চালাতে চায়। [ইবনে কাসীর]

يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ ۚ وَ خُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا

২৮. আল্লাহ তোমাদের ভার কমাতে চান; আর মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে দুর্বলরূপে।

আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে হালকা ও সহজ বিধান দিতে চান। তোমাদের অসুবিধা দূর করার জন্য বিয়ের ব্যাপারে এমন সরল বিধান তিনি দিয়েছেন, যা সবাই পালন করতে পার। স্বাধীন নারীদেরকে বিয়ে করার শক্তি না থাকার ক্ষেত্রে বাদীদেরকে বিয়ে করার অনুমতি দান করেছেন। [তাবারী] অনুরূপভাবে উভয়পক্ষকে পারস্পরিক সম্মতিক্রমে মাহর নির্ধারণ করার ক্ষমতা দিয়েছেন এবং প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ইনসাফ ও সুবিচারের শর্তে একাধিক বিয়ে করার অনুমতিও দিয়েছেন। এসব কিছুই হাল্কা ও সহজ করার স্বার্থেই করা হয়েছে।

মানুষ সৃষ্টিগতভাবে দুর্বল। তার মাঝে কাম-বাসনার উপাদানও নিহিত রয়েছে। যদি তাকে নারীদের কাছ থেকে সম্পূর্ণ দূরে থাকার আদেশ দেয়া হত, তবে সে আনুগত্য করতে অক্ষম হয়ে পড়ত। তার অক্ষমতা ও দুর্বলতার পরিপ্রেক্ষিতে নারীদেরকে বিয়ে করার শুধু অনুমতি দেয়া হয়নি; বরং উৎসাহিত করা হয়েছে। [মাআরিফুল কুরআন]

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْۤا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۟ وَ لَا تَقْتُلُوْۤا اَنْفُسَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

২৯. হে মুমিনগণ! তোমরা একে অপরের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না; কিন্তু তোমরা পরস্পর রাযী হয়ে ব্যবসা করা বৈধ এবং নিজেদেরকে হত্যা করো না; নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।

আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, পরস্পরের মধ্যে অন্যায় পন্থায় একের সম্পদ অন্যের পক্ষে ভোগ করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। অনুরূপভাবে আরও বুঝা যায় যে, নিজস্ব সম্পদও অন্যায় পথে ব্যয় করা কিংবা অপব্যয় করা নিষিদ্ধ।

আয়াতে উল্লেখিত 'বাতিল' শব্দটির তরজমা করা হয়েছে 'অন্যায়ভাবে। আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং অন্যান্য সাহাবীগণের মতে শরীআতের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ এবং নাজায়েয সবগুলো পন্থাকেই বাতিল বলা হয়। যেমন, চুরি, ডাকাতি, আত্মসাৎ, বিশ্বাসভঙ্গ, ঘুষ, সুদ, জুয়া প্রভৃতি সকল প্রকার অন্যায় পন্থাই এ শব্দের অন্তর্ভুক্ত। [বাহরে মুহীত]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বিক্রির জন্য সন্তুষ্টি অপরিহার্য। [ইবন মাজাহঃ ২১৮৫। এ সন্তুষ্টি সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন হওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেচাকেনার ক্ষেত্রে আরও কিছু দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন, যেমন, "বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়ে সওদা করার স্থান ছেড়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত (সওদা বাতিল করার) সুযোগের অধিকারী থাকবে। তবে- পৃথক হওয়ার পরও এ সুযোগ তাদের জন্য থাকবে-যারা খেয়ার বা সুযোগের অধিকার দেয়ার শর্তে সওদা করবে।" [বুখারী: ২১০৭]

ব্যবসা করা বৈধ- এর দ্বারা বলে দেয়া হয়েছে যে, যেসব ক্ষেত্রে ব্যবসার নামে সুদ, জুয়া, ধোঁকা-প্রতারণা ইত্যাদির আশ্রয় নিয়ে অন্যের সম্পদ হস্তগত করা হয়, সেসব পন্থায় সম্পদ অর্জন করা বৈধ পন্থার অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং হারাম ও বাতিল পন্থা। তেমনি যদি স্বাভাবিক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেও লেনদেনের মধ্যে উভয় পক্ষের আন্তরিক সন্তুষ্টি না থাকে, তবে সেরূপ ক্রয়-বিক্রয়ও বাতিল ও হারাম। কাতাদা বলেন, ব্যবসা আল্লাহর রিযক ও আল্লাহর হালালকৃত বিষয়, তবে শর্ত হচ্ছে, এটাকে সত্যবাদিতা ও সততার সাথে পরিচালনা করতে হবে। [তাবারী]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথ করে বলে যে, আমি অন্য কোন ধর্মের উপর। তাহলে সে ঐ ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। বনী আদম যার মালিক নয় এমন মানত গ্রহণযোগ্য নয়। যে কেউ দুনিয়াতে নিজেকে কোন কিছু দিয়ে হত্যা করবে, এটা দিয়েই তাকে কেয়ামতের দিন শাস্তি দেয়া হবে। যে কোন মুমিনকে লা'নত করল সে যেন তাকে হত্যা করল। অনুরূপভাবে যে কেউ কোন মুমিনকে কুফরীর অপবাদ দিল, সেও যেন তাকে হত্যা করল। [বুখারীঃ ৬০৪৭, মুসলিমঃ ১৭৬]

অন্য এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে কেউ পাহাড় থেকে পড়ে আত্মহত্যা করবে, সে জাহান্নামের আগুনে চিরস্থায়ীভাবে পাহাড় থেকে পড়ার অনুরূপ শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। যে ব্যক্তি বিষ পানে আত্মহত্যা করবে, সে চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামের আগুনে বিষ পানের আযাব ভোগ করতে থাকবে। আর যে কেউ কোন ধারাল কিছু দিয়ে আত্মহত্যা করবে, সে চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামের আগুনে তা দ্বারা শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। [বুখারীঃ ৫৭৭৮, মুসলিমঃ ১৭৫]

وَ مَنۡ یَّفۡعَلۡ ذٰلِکَ عُدۡوَانًا وَّ ظُلۡمًا فَسَوۡفَ نُصۡلِیۡهِ نَارًا ؕ وَ کَانَ ذٰلِکَ عَلَی اللّٰهِ یَسِیۡرًا

৩০. আর যে কেউ সীমালংঘন করে অন্যায়ভাবে তা করবে, অবশ্যই আমরা তাকে আগুনে পোড়াবো; এসব আল্লাহর পক্ষে সহজ।

আল্লাহ তা'আলা এখানে বলেন-“যে কেউ অত্যাচার ও সীমা অতিক্রম করে একাজ করবে, অর্থাৎ হারাম জেনেও স্বীয় বীরত্বপণা দেখিয়ে ঐ কাজ করবে, সে জাহান্নামী হবে। সুতরাং প্রত্যেকেরই এ কঠিন ভীতি প্রদর্শন ব্যাপারে ভয় করা উচিত। অন্তরের পর্দা খুলে আল্লাহ তা'আলার এ নির্দেশ শ্রবণ করতঃ হারাম কাজ হতে (মানুষের) বিরত থাকা উচিত।

اِنۡ تَجۡتَنِبُوۡا کَبَآئِرَ مَا تُنۡهَوۡنَ عَنۡهُ نُکَفِّرۡ عَنۡکُمۡ سَیِّاٰتِکُمۡ وَ نُدۡخِلۡکُمۡ مُّدۡخَلًا کَرِیۡمًا

৩১. তোমাদেরকে যা নিষেধ করা হয়েছে তার মধ্যে যা কবীরা গোনাহ তা থেকে বিরত থাকলে আমরা তোমাদের ছোট পাপগুলো ক্ষমা করব এবং তোমাদেরকে সম্মানজনক স্থানে প্রবেশ করাব।

আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেনঃ এমন প্রত্যেক গোনাহ যার পরিণতিতে কুরআন ও হাদীসে জাহান্নামের ভয় দেখানো হয়েছে অথবা আল্লাহর গযবের কথা এসেছে, অথবা লানতের কথা অথবা আযাবের কথা এসেছে, তাই কবীরা গোনাহ। কবীরা গোনাহর সংখ্যা অনেক। কেউ কেউ তা সাতশ’ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। [তাবারী, ইবন আবী হাতেম]

উল্লেখিত আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হল যে, পাপ বা গোনাহ দুরকম। কিছু কবীরা অর্থাৎ কঠিন ও বড় রকমের পাপ, আর কিছু সগীরা অর্থাৎ হালকা ও ছোট পাপ। এ কথাও প্রতীয়মান হচ্ছে যে, যদি কেউ সাহস করে কবীরা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকতে পারে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা ওয়াদা করেছেন যে, তিনি তার সগীরা গোনাহগুলো নিজেই ক্ষমা করে দেবেন। যাবতীয় ফরয-ওয়াজিবগুলো সম্পাদন করাও কবীরা গোনাহ থেকে বাঁচার অন্তর্ভুক্ত। কারণ, ফরয-ওয়াজিবসমূহ ত্যাগ করাও কবীরা গোনাহ। বস্তুতঃ যে লোক ফরয-ওয়াজিবসমূহ পালনের ব্যাপারে যথাযথ অনুবর্তিতা অবলম্বন করে এবং যাবতীয় কবীরা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকে, আল্লাহ স্বয়ং তার সগীরা গোনাহসমূহের কাফফারা করে দেবেন।

এখানে গোনাহের কাফফার হওয়ার অর্থ এই যে, কর্তার সৎকর্মসমূহকে সগীরা গোনাহের ক্ষতিপূরণ হিসেবে দেখিয়ে তার হিসাব সমান সমান করে দেয়া হবে। জাহান্নামের পরিবর্তে সে জান্নাত প্রাপ্ত হবে। বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, 'কোন লোক যখন সালাত আদায়ের জন্য অযু করে, তখন প্রতিটি অঙ্গ ধৌত হওয়ার সাথে সাথে তার গোনাহর কাফফারা হয়ে যায়। মুখমণ্ডল ধুয়ে নিলে চোখ, কান ও নাক প্রভৃতি অঙ্গের পাপসমূহের কাফফারা হয়ে যায়। কুলি করার সঙ্গে সঙ্গে জিহবার পাপের কাফফারা হয়ে যায়; আর পা ধোয়ার সাথে সাথে ধুয়ে যায় পায়ের পাপসমূহ। তারপর যখন সে মসজিদের দিকে রওয়ানা হয়, তখন প্রতিটি পদক্ষেপে পাপের কাফফারা হতে থাকে [নাসায়ীঃ ১/১০৩, মুসনাদে আহমাদঃ ৪/৩৪৯]

আলোচ্য আয়াতের দ্বারা এ কথাও বোঝা গেল যে, অযু, সালাত প্রভৃতি সৎকর্মের মাধ্যমে গোনাহর কাফফারা হওয়ার ব্যাপারে হাদীসে যা উল্লেখ করা হয়েছে, তার অর্থ হল সগীরা গোনাহ্। কবীরা গোনাহ একমাত্র তাওবা ছাড়া মাফ হয় না। বস্তুতঃ সগীরা গোনাহ মাফের শর্ত হল, সাহস ও চেষ্টার মাধ্যমে কবীরা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা। অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে কেউ আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তার সাথে কাউকে শরীক করবে না, সালাত কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং কবীরা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকবে, তার জন্য রয়েছে জান্নাত। সাহাবীগণ কবীরা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, মুসলিম কোন আত্মাকে হত্যা করা এবং যুদ্ধের দিনে ময়দান থেকে পলায়ন করা। [মুসনাদে আহমাদ ৫/৪১৩]

তিনটি কারণে কোন কাজ বড় গোনাহে পরিণত হয়ঃ **একঃ** কারো অধিকার হরণ করা। সে অধিকার আল্লাহর, বাপ-মার, অন্য মানুষের বা হরণকারীর নিজেরও হতে পারে। তারপর যার অধিকার যত বেশী হবে তার অধিকার হরণও ঠিক তত বেশী বড় গোনাহ হবে। এ কারণেই গোনাহকে 'জুলুম' ও বলা হয়। আর এ জন্য কুরআনে শিরককে জুলুম বলা হয়েছে।

দুইঃ আল্লাহকে ভয় না করা এবং আল্লাহর মোকাবিলায় আত্মম্ভরিতা করা, এর ফলে মানুষ আল্লাহর আদেশ ও নিষেধের পরোয়া করে না। তাঁর নাফরমানি করার উদ্দেশ্যে ইচ্ছা করেই এমন কাজ করে যা করতে তিনি নিষেধ করেছেন এবং জেনে বুঝে এমন কাজ থেকে বিরত থাকে যা করার জন্য তিনি হুকুম দিয়েছেন। এই নাফরমানি যে পরিমাণ নির্লজ্জতা, অহমিকা, দুঃসাহস ও আল্লাহভীতির মনোভাবে সমৃদ্ধ হবে গোনাহটিও ঠিক সেই পর্যায়ের কঠিন ও মারাত্মক হবে। এই অর্থের প্রেক্ষিতেই গোনাহের জন্য 'ফিস্ক' (ফাসেকী) ও 'মাসিয়াত' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

তিনঃ যে সমস্ত সম্পর্কের সুস্থতা ও বলিষ্ঠতার ওপর মানব জীবনের শান্তি ও নিরাপত্তা নির্ভর করে সেগুলো বিকৃত ও ছিন্ন করা। এ সম্পর্ক বান্দা ও আল্লাহর মধ্যে এবং বান্দা ও বান্দার মধ্যে হতে পারে। আবার যে সম্পর্ক যত বেশী গুরুত্বপূর্ণ, যা ছিন্ন করলে শাস্তি ও নিরাপত্তার যত বেশী ক্ষতি হয় এবং যার ব্যাপারে যত বেশী নিরাপত্তার আশা করা যেতে পারে, তাকে ছিন্ন করা, কেটে ফেলা ও নষ্ট করার গোনাহ তত বেশী বড় হয়। যেমন যিনা ও তার বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে চিন্তা করুন। এ কাজটি আসলে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থায় বিপর্যয় ডেকে আনে। তাই এটি মূলত একটি বড় গোনাহ। কিন্তু এর বিভিন্ন অবস্থা গোনাহের ব্যাপারে একটি অন্যটির চাইতে বেশী মারাত্মক। বিবাহিত ব্যক্তির যিনা করা অবিবাহিত ব্যক্তির যিনা করার তুলনায় অনেক কঠিন গোনাহ। বিবাহিত মহিলার সাথে যিনা করা অবিবাহিতা মেয়ের সাথে যিনা করার তুলনায় অনেক বেশী দুষনীয়। প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে যিনা করা অপ্রতিবেশির স্ত্রীর সাথে যিনা করার তুলনায় বেশী খারাপ। যেখানে নিরাপত্তার আশা যত বেশী, যেখানে মানবিক সম্পর্ক যত বেশী সম্মানের অধিকারী এবং যেখানে এই সম্পর্ক ছিন্ন করা যত বেশী বিপর্যয়ের কারণ বলে বিবেচিত হয়, সেখানে যিনা করা তত বেশী বড় গোনাহ। এই অর্থের প্রেক্ষিতে গোনাহের জন্য ‘ফুজুর’ এর পরিভাষা করা হয়। [তাফহীমুল কুরআন]

وَ لَا تَتَمَنَّوۡا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعۡضَكُمۡ عَلٰی بَعۡضٍ ؕ لِلرِّجَالِ نَصِیۡبٌ مِّمَّا اكۡتَسَبُوۡا ؕ وَ لِلنِّسَآءِ نَصِیۡبٌ مِّمَّا اكۡتَسَبۡنَ ؕ وَ سۡـَٔلُوا اللّٰهَ مِنۡ فَضۡلِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَیۡءٍ عَلِیۡمًا ۟

৩২. আর যা দ্বারা আল্লাহ তোমাদের কাউকে কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন তোমরা তার লালসা করো না। পুরুষ যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ এবং নারী যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ। আর আল্লাহর কাছে তার অনুগ্রহ প্রার্থনা কর, নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু সম্পর্কে সর্বজ্ঞ।

কুরআনের কোন কোন আয়াত এবং একাধিক হাদীসের বর্ণনায় সৎকর্মে প্রতিযোগিতা অর্থাৎ অন্যের চাইতে এগিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টায় অগ্রণী হওয়ার নির্দেশ দেখতে পাওয়া যায়। অনুরূপ অন্যের মধ্যে যে গুণ-গরিমা রয়েছে, তা অর্জন করার জন্য সচেষ্ট হওয়ার প্রতিও উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে লক্ষণীয় এই যে, আল্লাহ এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু ঐ সমস্ত গুণ-বৈশিষ্টের ক্ষেত্রেই অন্যের সাথে প্রতিযেগিতামূলকভাবে এগিয়ে যাওয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন, যেগুলো মানুষের সাধ্যায়ত্ত, যেগুলো চেষ্টা-সাধনার মাধ্যমে মানুষ অর্জন করতে পারে। যেমন, কারো গভীর জ্ঞান বা চারিত্রিক মহত্ব দেখে তার কাছ থেকে তা অর্জন করার জন্য চেষ্টাসাধনা করা প্রশংসনীয় কাজ। তাই আয়াতের শেষাংশে সেরূপ চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করতে উৎসাহ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ পুরুষরা যা কিছু সাধনার মাধ্যমে অর্জন করবে তারা তার অংশ পাবে এবং নারীরা যা কিছু অর্জন করবে তার অংশও তারা পাবে। এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, গুণ-বৈশিষ্ট্য এবং কর্মে দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে বৈশিষ্ট্য লাভ করার চেষ্টা ব্যর্থ হবে না। প্রত্যেকেই তার প্রচেষ্টার ফল অবশ্যই পাবে। উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি অভিযোগের সুরে বলেছিলেনঃ পুরুষরা যুদ্ধ করে, আমরা মহিলারা যুদ্ধ করতে পারি না তদুপরি আমাদের জন্য মীরাসের অর্ধেক। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন। [মুসনাদে আহমাদঃ ৬/৩২২, তিরমিযীঃ ৩০২২]

অন্য এক বর্ণনায় আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ এক মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললঃ হে আল্লাহ রাসূল, একজন পুরুষ দুই মহিলার সমান মীরাস পায়, একজন পুরুষের সাক্ষী দুইজন মহিলার সাক্ষীর সমান। আমরা যখন কোন নেক কাজ করব, তখনও কি

অর্ধেক সওয়াব হবে? তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন। যাতে বলা হয়েছে যে, এটা আমার ইনসাফ এবং এটা আমিই করেছি। [আল আহাদীসুল মুখতারাহঃ ১০/১১৬-১১৭, নং- ১১৫]

وَ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَ الْاَقْرَبُوْنَ ؕ وَ الَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا

৩৩. পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যাক্ত সম্পত্তির প্রত্যেকটির জন্য আমরা উত্তরাধিকারী করেছি এবং যাদের সাথে তোমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ তাদেরকে তাদের অংশ দেবে। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বকিছুর সম্যক দ্রষ্টা।

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেনঃ মুহাজেররা যখন মদীনায় হিজরত করে আসত, তখন আনসারদের নিকটাত্মীয়দের বাদ দিয়ে যাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভ্রাতৃত্ব বন্ধন সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন মুহাজেররা তাদের ওয়ারিস হত। তারপর যখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়, তখন তা রহিত হয়ে যায়। [বুখারীঃ ২২৯২, ৪৫৮০, ৬৭৪৭]

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, যখন 'আর যাদের সাথে তোমরা অংগীকারাবদ্ধ তাদেরকে তাদের অংশ দেবে' এ আয়াত নাযিল হয়, তখন কেউ কেউ অপর কারও সাথে বংশীয় কোন সম্পর্ক না থাকা সত্বেও চুক্তিবদ্ধ হতো, এর ফলে একে অপরের ওয়ারিশ হতো। তারপর যখন আল্লাহর বাণী 'আর আত্মীয়রা আল্লাহর বিধানে একে অন্যের চেয়ে বেশী হকদার' [সূরা আল-আনফাল: ৭৫; আল-আহযাব: ৬] এ আয়াত নাযিল হয়, তখন তাও রহিত হয়ে যায়। [মুস্তাদরাকে হাকিম ৪/৩৪৬; তাবারী]

ফুটনোট

▣ যে সমস্ত হারাম নারী কোন অবস্থাতেই হালাল হয় না, তাদেরকে 'মুহাররামাতে আবাদীয়্যা' বা 'চিরতরে হারাম মহিলা' বলা হয়। এ জাতীয় মহিলা তিন শ্রেণীরঃ (১) বংশগত হারাম নারী, (২) দুধের কারণে হারাম নারী এবং (৩) শ্বশুর সম্পর্কের কারণে হারাম নারী চিরতরে হারাম।

▣ কোন কোন নারী চিরতরে হারাম নয়, কোন কোন অবস্থায় তারা হালালও হয়ে যায়। তাদেরকে 'মুহাররামাতে মুআক্কাতাহ' বা সাময়িক কারণে হারাম বলা হয়। এরা আবার দু' শ্রেণীতে বিভক্তঃ (১) পরস্ত্রী সে যতক্ষণ পর্যন্ত পরের স্ত্রী থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত হারাম। (২) কোন কোন মহিলা শুধুমাত্র অন্যের সাথে একসাথে বিবাহ করা হারাম।

▣ **বংশীয় সম্পর্কের কারণে** যেসব নারীদের বিবাহ করা হারাম তাদের বর্ণনা করা হয়েছে। তারা হল: মাতা, কন্যা, বোন, ফুফু, খালা, ভাইঝি ও ভাগ্নী। এদেরকে বিবাহ করা চিরস্থায়ী হারাম।

▣ **দুগ্ধ সম্বন্ধীয় কারণে নিষিদ্ধ:** বংশগত কারণে যাদেরকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ দুগ্ধ সম্বন্ধের কারণেও তারা নিষিদ্ধ। তারা হল: দুধ মা, দুধ বোন, দুধ মেয়ে, দুধ খালা, দুধ ফুফু, দুধ ভাইঝি ও ভাগ্নী।

▣ **বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে যেসব নারীকে বিবাহ করা অবৈধ করা হয়েছে,** তারা হল
১. শাশুড়ী, স্ত্রীর দাদী ও নানী। এভাবে যত উর্ধ্বতন হোক না কেন।
২. স্ত্রীর সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপিত হলেই তার কন্যা, তার পুত্রের কন্যা ইত্যদি হারাম হয়ে যাবে।

৩. নিজের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রীগণ (পুত্র-বধু)।
৪. পিতা, দাদা ও নানা (যতই উপরে যাক না কেন) যাদেরকে বিবাহ করেছেন।
৫. কোন মহিলাকে বিবাহ করলেই তার আপন বোন, ফুফু, খালাকে বিবাহ করা হারাম গণ্য হবে।
এছাড়াও মুশরিক নারী, কাফির নারী, অন্য পুরুষের ইদ্দত পালন করছে এমন নারী ও মুহরিম অবস্থায় রয়েছে এমন নারী বিবাহ করা হারাম। অনুরূপ ব্যভিচারী নারীও বিবাহ করা হারাম, তবে যদি সে কাজ থেকে তাওবাহ করে তাহলে বিবাহ করা যাবে।

▣ যে সকল বিবাহ শরীয়তসম্মত নয় তা হল-
১. নিকাহ শিগার তথা কারো মেয়ে বা বোনকে এ শর্তে বিবাহ করা যে, তার কাছে এ ব্যক্তির বোন বা মেয়েকে বিবাহ দেবে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরূপ বিবাহ করা থেকে নিষেধ করেছেন। (সহীহ মুসলিম হা: ১৪১৭)
২. কারো জন্য বৈধ করে দেয়ার উদ্দেশ্যে বিবাহ করা, যেমন কোন ব্যক্তি একত্র তিন তালাকপ্রাপ্তা নারীকে বিবাহ করল, তারপর তালাক দিয়ে দিল যাতে পূর্বের স্বামীর জন্য বৈধ হয়। এটাকে আমাদের দেশে হিল্লা বিবাহ বলা হয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লা'নত করেছেন যারা এরূপ কাজ করে এবং যার জন্য করে উভয়কে। (তিরমিযী হা: ১১২০, নাসায়ী হা: ৬/১৪৯, সহীহ)
৩. মুতা বিবাহ: তা হল অর্থের বিনিময়ে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিবাহ করা। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খায়বারের বছর এবং পরে ফাতহে মক্কার বছর এ ধরণের বিবাহ হারাম করেছেন। (সহীহ বুখারী হা: ৫১১৫, সহীহ মুসলিম হা: ১৪০৬)
৪. অন্যের স্ত্রীকে বিবাহ করা। অর্থাৎ কোন মহিলা স্বামীর সাথে বৈধ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ। পরকীয়া, জবরদস্তি বা অন্য কোন পন্থায় এমন মহিলাদের বিবাহ করা হারাম। তেমনি ব্যভিচারী ও দেহ ব্যবসায়ী নারীদের বিবাহ করা হারাম, তবে তাওবা করে উক্ত কাজ থেকে ফিরে আসলে বিবাহ করা যাবে।
▣ কুরআনে مُحْصَنَات এর **চারটি** অর্থে ব্যবহৃত হয়েছেঃ ক) বিবাহিতা মহিলাগণ (খ) স্বাধীন মহিলাগণ (গ) সতী-সাধ্বী মহিলাগণ এবং (ঘ) মুসলিম মহিলাগণ।

▣ যারা স্বাধীন মু'মিনা নারীকে বিবাহ করতে অক্ষম তারা দাসীদের চারটি শর্তে বিবাহ করতে পারে। তবে এ থেকেও ধৈর্য ধারণ শ্রেয়। একজন স্বাধীন মুসলিম ব্যক্তির একজন ক্রীতদাসীকে বিবাহ করা বৈধ **চারটি শর্তে:**
১. বাহ্যিক পবিত্র থাকতে হবে।
২. অভ্যন্তরীণ পবিত্র থাকতে হবে। অর্থাৎ প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে কোন প্রকার ব্যভিচারে লিপ্ত থাকতে পারবে না।
৩. স্বাধীন মু'মিন নারীকে মাহর ও ভরণ পোষণ দিতে অক্ষম।
৪. যে ব্যক্তি নিজের ব্যাপারে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়ার আশঙ্কা করে।

▣ বান্দার ওপর আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ অসীম। আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত বিধান মানুষের পালন করা সাধ্যের অধীন।
▣ প্রতিটি মানুষ তার সহজাত বাসনার কাছে দুর্বল। প্রবৃত্তির অনুসরণ করে সঠিক পথের সন্ধান পাওয়া যায় না। একমাত্র কুরআন ও সুন্নাহ সঠিক পথ দিতে পারে।
▣ অন্যায়ভাবে মুসলিম ভাইয়ের সম্পদ খাওয়া হারাম। হালাল বস্তু ও পণ্যের ব্যবসায়-বাণিজ্য বৈধ।
▣ কোন মুসলিম ব্যক্তিকে বা নিজেকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হারাম।
▣ জান, মাল, সম্পদ ও সম্মান সকল অধিকার ইসলাম যথাযথভাবে সংরক্ষণ করেছে।
▣ কবীরা গুনাহ থেকে দূরে থাকা ওয়াজিব এবং নেকীর কাজ। কবীরা গুনাহ ক্ষমার জন্য তাওবাহ করা শর্ত।
▣ কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকলে আল্লাহ তা'আলা সাগীরাহ গুনাহ এমনিতেই মাফ করে দেবেন।

কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২৪
প্রস্তুতি সহায়ক তাফসীর নোট পর্বঃ ১০

সূরা আনকাবুত ১-১৩ আয়াত

আল আনকাবূত কুরআনের ২৯ তম সূরা। এই সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং এর আয়াত সংখ্যা ৬৯টি। রুকু সংখ্যা ৭।

নামকরণ

একচল্লিশের আয়াতের অংশবিশেষ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ থেকে সূরাটির নামকরণ করা হয়েছে। অর্থাৎ যে সূরার মধ্যে আনকাবুত শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, এটি সে সূরা। الْعَنْكَبُوْتِ (আনকাবূত) শব্দের অর্থ মাকড়সা। উক্ত সূরাতে 'মাকড়সা' সংক্রান্ত একটি ঘটনা বিবৃত হয়েছে বিধায় এ সূরাকে আনকাবূত নামে নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

৫৬ থেকে ৬০ আয়াতের মধ্যে যে বক্তব্য এসেছে তা থেকে সুস্পষ্টভাবে জানা যায় যে, এ সূরাটি হাবশায় হিজরতের কিছু আগে নাযিল হয়েছিল। অধিকন্তু বিষয়বস্তু গুলোর অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যও একথাই সমর্থন করে। কারণ, পশ্চাতপটে সে যুগের অবস্থার চিত্র ঝলকে উঠতে দেখা যায়। যেহেতু এর মধ্যে মুনাফিকদের আলোচনা এসেছে এবং মুনাফিকীর প্রথম দশটি আয়াত হচ্ছে মাদানী এবং বাকি সমস্ত সূরাটি মক্কী। অথচ এখানে যেসব লোকের মুনাফিকীর কথা বলা হয়েছে তারা কেবল কাফেরদের জুলুম, নির্যাতন ও কঠোর শারীরিক নিপীড়নের ভয়ে মুনাফিকী অবলম্বন করছিল। আর একথা সুস্পষ্ট, এ ধরনের মুনাফিকীর ঘটনা মক্কায় ঘটতে পারে, মদীনায় নয়। এভাবে এ সূরায় মুসলমানদেরকে হিজরত করার উপদেশ দেয়া হয়েছে, এ বিষয়টি দেখেও কোন কোন মুফাসসির একে মক্কায় নাযিলকৃত শেষ সূরা গণ্য করেছেন।। অথচ মদীনায় হিজরতের আগে মুসলমানগণ হাবশায়ও হিজরত করেছিলেন। এ ধারণাগুলো আসলে কোন হাদীসের ভিত্তিতে নয়। বরং শুধুমাত্র বিষয়বস্তুর অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে। আর সমগ্র সূরার বিষয়বস্তুর ওপর সামগ্রিকভাবে দৃষ্টিপাত করলে এ অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য মক্কার শেষ যুগের নয় বরং এমন এক যুগের অবস্থার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে যে যুগে মুসলমানদের হাবশায় হিজরত সংঘটিত হয়েছিল।

বিষয়বস্তু ও কেন্দ্রীয় বক্তব্য

সূরাটি পড়লে মনে হবে এটি যখন নাযিল হচ্ছিল তখন মক্কায় মুসলমানরা মহা বিপদ-মুসিবতের মধ্যে অবস্থান করছিল। কাফেরদের পক্ষ থেকে পূর্ণ শক্তিতে চলছিল ইসলামের বিরোধিতা এবং মু'মিনদের ওপর চালানো হচ্ছিল কঠোর জুলুম-নিপীড়ন। এহেন অবস্থায় মহান আল্লাহ একদিকে সাচ্চা ঈমানদারদের লজ্জা দেবার জন্য এ সূরাটি নাযিল করেন। এই সাথে এর মধ্যে মক্কায় কাফেরদেরকেও এ মর্মে কঠোর ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে যে, নিজেদের জন্য এমন পরিণতি ডেকে এনো না সত্যের সাথে শত্রুতা পোষণকারীরা প্রতি যুগে যার সম্মুখীন হয়ে এসেছে।

সে সময় কিছু কিছু যুবক যেসব প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছিলেন এ প্রসঙ্গে তারও জবাব দেয়া হয়েছে। যেমন তাদের পিতা-মাতারা তাদের ওপর মুহাম্মদ (সা.) এর দ্বীন ত্যাগ করে তাদের দ্বীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য চাপ প্রয়োগ করতো। তাদের পিতা-মাতারা বলতো, যে কুরআনের প্রতি তোমরা ঈমান এনেছো তাতেও তো লেখা আছে যে, মা-বাপের হক সবচেয়ে বেশি। কাজেই আমরা যা কিছু বলছি তাই তোমরা মেনে নাও। নয়তো তোমরা নিজেদের ঈমান বিরোধী কাজে লিপ্ত হবে। ৮ আয়াতে এর জবাব দেয়া হয়েছে।

অনুরূপভাবে কোন কোন নওমুসলিমকে তাদের গোত্রের লোকেরা বলতো, তোমরা আমাদের কথা মেনে নাও এবং ঐ ব্যক্তি থেকে আলাদা হয়ে যাও, এ জন্য আযাব-সওয়াব যাই হোক, তার দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করছি। যদি এ জন্য আল্লাহ তোমাদের পাকড়াও করেন তাহলে আমরা অগ্রবর্তী হয়ে বলে দেবোঃ জনাব, এ বেচারাদের কোন দোষ নেই। আমরাই এদেরকে ঈমান ত্যাগ করতে বাধ্য করেছিলাম। কাজেই আমাদের পাকড়াও করুন। এর জবাব দেয়া হয়েছে ১২-১৩ আয়াতে।

এ সূরায় যে কাহিনীগুলো বর্ণনা করা হয়েছে সেখানেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এ দিকটিই সুস্পষ্ট করা হয়েছে যে, পূর্ববর্তী নবীদেরকে দেখো, তারা কেমন কঠিন বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন। কত দীর্ঘকাল ধরে তারা নির্যাতিত হয়েছেন। তারপর আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের সাহায্য করা হয়েছে। কাজেই ভয় পেয়ো না। আল্লাহর সাহায্য নিশ্চয়ই আসবে কিন্তু পরীক্ষার একটি সময়কাল অতিবাহিত হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন। মুসলমানদেরকে এ শিক্ষা দেবার সাথে সাথে মক্কার কাফেরদেরকেও এ কাহিনীগুলোতে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে পাকড়াও হতে দেরি হয়, তাহলে তাতে আর কোনদিন পাকড়াও হবেই না বলে মনে করে নিয়ো না। অতীতের ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগুলোর চিহ্ন ও ধ্বংসাবশেষ তোমাদের সামনে রয়েছে। দেখে নাও, শেষ পর্যন্ত তাদের সর্বনাশ হয়েই গেছে এবং আল্লাহ তার নবীদেরকে সাহায্য করেছেন।

তারপর মুসলমানদেরকে এভাবে পথনির্দেশনা দেয়া হয়েছে যে, জুলুম নির্যাতন যদি তোমাদের সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়, তাহলে ঈমান পরিত্যাগ করার পরিবর্তে তোমরা ঘরবাড়ি ত্যাগ করে বের হয়ে যাও। আল্লাহর যমীন অনেক প্রশস্ত। যেখানে আল্লাহর বন্দেগী করার সুযোগ আছে সেখানে চলে যাও।

এসব কথার সাথে সাথে কাফেরদেরকে বুঝাবার দিকটিও বাদ দেয়া হয়নি। তাওহীদ ও আখেরাত উভয় সত্যকে যুক্তিসহকারে তাদেরকে বুঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। শির্ককে খণ্ডন করা হয়েছে। বিশ্ব-জাহানের নির্দশনাবলীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাদেরকে জানানো হয়েছে যে, আমার নবী তোমাদের সামনে যে শিক্ষা পেশ করছেন এ নির্দশনাবলী তার সত্যতা প্রমাণ করছে।

الٓمٓ

১. আলিফ-লাম-মীম

আলিফ, লাম, মীমঃ এ হরফগুলোকে কুরআনের পরিভাষায় ‘হরূফে মুকাত্তা'আত' বলা হয়। ঊনত্রিশটি সূরার প্রারম্ভে এ ধরনের হরূফে মুকাত্তা’ আত ব্যবহার করা হয়েছে। এগুলোর সংখ্যা ১৪টি। মূলতঃ এ অক্ষরগুলোর প্রত্যেকটিকে পৃথক পৃথকভাবে সাকিন করে পড়া হয়ে থাকে। যথা---(الف - لام - ميم) (আলিফ্-লাম্-মীম্)। এ বর্ণগুলো তাদের নিকট প্রচলিত ভাষার বর্ণমালা হতে গৃহীত। যা দিয়ে তারা কথা বলে এবং শব্দ তৈরী করে।

কিন্তু কি অর্থে এবং এসব আয়াত বর্ণনার কি রহস্য রয়েছে এ ব্যাপারে মুফাস্সিরগণের মধ্যে বিভিন্ন মত রয়েছে। এক্ষেত্রে সর্বমোট প্রসিদ্ধ অভিমত হচ্ছে চারটিঃ ১) এগুলোর কোন অর্থ নেই, কেবলমাত্র আরবী বর্ণমালার হরফ হিসেবে এগুলো পরিচিত। ২) এগুলোর অর্থ আছে কিনা তা আল্লাহ্ই ভাল জানেন, আমরা এগুলোর অর্থ সম্পর্কে কিছুই জানিনা। আমরা শুধুমাত্র তিলাওয়াত করবো। ৩) এগুলোর নির্দিষ্ট অর্থ রয়েছে, কারণ কুরআনের কোন বিষয় বা কোন আয়াত বা শব্দ অর্থহীনভাবে নাযিল করা হয়নি। কিন্তু এগুলোর অর্থ শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। অন্য কেউ এ আয়াতসমূহের অর্থ জানেনা, যদি কেউ এর কোন অর্থ নিয়ে থাকে তবে তা সম্পূর্ণভাবে ভুল হবে। আমরা শুধু এতটুকু বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ্ তা'আলা তার কুরআনের কোন অংশ অনর্থক নাযিল করেননি। ৪) এগুলো 'মুতাশাবিহাত' বা অস্পষ্ট বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত। এ হিসাবে অধিকাংশ সাহাবী, তাবেয়ী ও ওলামার মধ্যে সর্বাধিক প্রচলিত মত হচ্ছে যে, হরূফে মুকাত্তা' আতগুলো এমনি রহস্যপূর্ণ যার প্রকৃত মর্ম ও মাহাত্ম্য একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। কিন্তু 'মুতাশবিহাত' আয়াতসমূহের প্রকৃত অর্থ আল্লাহ্ তা'আলার কাছে থাকলেও গভীর জ্ঞানের অধিকারী আলেমগণ এগুলো থেকে হেদায়াত গ্রহণ করার জন্য এগুলোর বিভিন্ন অর্থ করেছেন। কোন কোন তাফসীরকারক এ হরফগুলোকে সংশ্লিষ্ট সূরার নাম বলে অভিহিত করেছেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, এগুলো আল্লাহ্র নামের তত্ত্ব বিশেষ। আবার অনেকে এগুলোর স্থানভেদে ভিন্ন ভিন্ন অর্থও করেছেন। [তাফসীরে জাকারিয়া]

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَ هُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ

২. মানুষ কি মনে করেছে যে, আমরা ঈমান এনেছি এ কথা বললেই তাদেরকে পরীক্ষা না করে অব্যাহতি দেয়া হবে?

يُفْتَنُونশব্দটি فتنةথেকে উদ্ভূত। এর অর্থ পরীক্ষা। ঈমানদার বিশেষত: নবীগণকে এ জগতে বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়েছে। পরিশেষে বিজয় ও সাফল্য তাদেরই হাতে এসেছে। এসব পরীক্ষা জান ও মালের উপর ছিল। [ফাতহুল কাদীর] এর মাধ্যমে তাদের ঈমানের দৃঢ়তার পরীক্ষা হয়ে যেত। কোন সময় কাফের ও পাপাচারীদের শত্রুতা এবং তাদের নির্যাতনের মাধ্যমে হয়েছে, যেমন অধিকাংশ নবীগণ, শেষনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সাহাবীগণ প্রায়ই এ ধরনের পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন। সীরাত ও ইতিহাসের গ্রন্থাবলী এ ধরনের ঘটনাবলী দ্বারা পরিপূর্ণ। কোন সময় এই পরীক্ষা রোগ-ব্যাধি ও অন্যান্য কষ্টের মাধ্যমে হয়েছে। যেমন আইয়ুব আলাইহিস সালাম-এর হয়েছিল। কারও কারও বেলায় সর্বপ্রকার পরীক্ষার সমাবেশও করে দেয়া হয়েছে।

বর্ণনাদৃষ্টে বোঝা যায়, আলোচ্য আয়াত সেসব সাহাবীদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছিল, যারা মদীনায় হিজরতের প্রাক্কালে কাফেরদের হাতে নির্যাতিত হয়েছিলেন। কিন্তু উদ্দেশ্য ব্যাপক। সর্বকালের আলেম, সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন এবং হতে থাকবেন। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সৎকর্মপরায়ন বান্দাদেরকে, তারপর তাদের অনুরূপ, তারপর তাদের অনুরূপদেরকে। প্রত্যেক মানুষকে তার দ্বীনদারী অনুসারে পরীক্ষা করা হয়। যদি দ্বীনদারী বেশী হয় তাকে বেশী পরীক্ষা করা হয়। [তিরমিযী ২৩৯৮, ইবনে মাজাহ ৪০২৩] কুরআনের অন্যত্রও এ পরীক্ষার কথা বলা হয়েছে, যেমন: "তোমরা কি মনে করেছ তোমাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে অথচ, আল্লাহ এখনো তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করেছে তাদের জেনে নেননি।" [সূরা আত-তাওবাহ: ১৬]

যে অবস্থায় একথা বলা হয় তা ছিল এই যে, মক্কা মুআযযিমায় কেউ ইসলাম গ্রহণ করলেই তার ওপর বিপদ আপদ ও জুলুম-নিপীড়নের পাহাড় ভেঙ্গে পড়তো। এ পরিস্থিতি যদিও দৃঢ় ঈমানের অধিকারী সাহাবীগণের অবিচল নিষ্ঠার মধ্যে কোন প্রকার দোদুল্যমানতা সৃষ্টি করে নি তবুও মানবিক প্রকৃতির তাগিদে অধিকাংশ সময় তাদের মধ্যেও চিত্তচাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়ে যেতো। এ ধরনের অবস্থার একটা চিত্র পেশ করে খাব্বাব ইবনে আরত বর্ণিত একটি হাদীস। তিনি বলেন, 'যে সময় মুশরিকদের কঠোর নির্যাতনে আমরা ভীষণ দুরবস্থার সম্মুখীন হয়ে পড়েছিলাম সে সময় একদিন আমি দেখলাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাবাঘরের দেয়ালের ছায়ায় বসে রয়েছেন।

আমি সেখানে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি আমাদের জন্য দোআ করেন না? একথা শুনে তাঁর চেহারা আবেগে-উত্তেজনায় রক্তিমবর্ণ ধারণ করলো এবং তিনি বললেন, "তোমাদের পূর্বে যেসব মুমিনদল অতিক্রান্ত হয়েছে তারা এর চাইতেও বেশী নিগৃহীত হয়েছে। তাদের কাউকে মাটিতে গর্ত করে তার মধ্যে বসিয়ে দেয়া হতো এবং তারপর তার মাথার ওপর করাত চালিয়ে দুটুকরা করে দেয়া হতো। কারো অংগ-প্রত্যংগের সন্ধিস্থলে কসম, এ কাজ সম্পন্ন হবেই, এমন কি এক ব্যক্তি সান'আ থেকে হাদ্বারামাউত পর্যন্ত নিঃশংক চিত্তে সফর করবে এবং আল্লাহ ছাড়া আর কারো ভয় তার মনে থাকবে না।" [বুখারী ৩৬১২, মুসনাদে আহমাদ ৫/১০৯]

এ চিত্তচাঞ্চল্যকে অবিচল ধৈর্য ও সহিষ্ণুতায় রূপান্তরিত করার জন্য মহান আল্লাহ মুমিনদেরকে বুঝান, দুনিয়া ও আখেরাতের সাফল্য অর্জনের জন্য আমার যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি রয়েছে কোন ব্যক্তি নিছক মৌখিক ঈমানের দাবীর মাধ্যমে তার অধিকারী হতে পারে না। বরং প্রত্যেক দাবীদারকে অনিবার্যভাবে পরীক্ষা অতিক্রম করতে হবেই। অন্যত্র আল্লাহ বলেনঃ "তোমরা কি মনে করেছে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করে যাবে, অথচ এখনো তোমরা সে অবস্থার সম্মুখীন হওনি, যে অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী ঈমানদারগণ? তারা সম্মুখীন হয়েছিল নির্মমতা ও দুঃখ-ক্লেশের এবং তাদেরকে অস্থির করে তোলা হয়েছিল। এমনকি রাসূল ও তাঁর সাথে যারা ঈমান এনেছিল তারা চিৎকার করে বলে উঠেছিল আল্লাহর সাহায্য কবে আসবে? (তখনই তাদেরকে সুখবর দেয়া হয়েছিল। এই মর্মে যে) জেনে রাখো, আল্লাহর সাহায্য নিকটেই।" [সূরা আল-বাকারাহ: ২১৪]

অনুরূপভাবে ওহুদ যুদ্ধের পর যখন মুসলিমদের ওপর আবার বিপদ-মুসীবতের একটি দুযোগপূর্ণ যুগের অবতারণা হয় তখন বলা হয়ঃ "তোমরা কি মনে করে নিয়েছে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করে যাবে, অথচ এখনো আল্লাহ দেখেনইনি যে, তোমাদের মধ্য থেকে কে জিহাদে প্রাণ উৎসর্গকারী এবং কে সবরকারী?" [সূরা আলে ইমরান: ১৪২] প্রায় একই বক্তব্য সূরা আলে ইমরানের ১৭৯, সূরা তাওবার ১৬ এবং সূরা মুহাম্মাদের ৩১ আয়াতে বলা হয়েছে। এসব বক্তব্যের মাধ্যমে মহান আল্লাহ মুসলিমদের মনে এ সত্যটি গেথে দিয়েছেন যে, পরীক্ষাই হচ্ছে এমন একটি মানদণ্ড যার মাধ্যমে ভেজাল ও নির্ভেজাল যাচাই করা যায়। [তাফহীমুল কুরআন]

وَ لَقَدۡ فَتَنَّا الَّذِیۡنَ مِنۡ قَبۡلِهِمۡ فَلَیَعۡلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِیۡنَ صَدَقُوۡا وَ لَیَعۡلَمَنَّ الۡكٰذِبِیۡنَ

৩. আর অবশ্যই আমরা এদের পূর্ববতীদেরকেও পরীক্ষা করেছিলাম; অতঃপর আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করে দেবেন কারা সত্যবাদী এবং তিনি অবশ্যই প্রকাশ করে দেবেন কারা মিথ্যাবাদী।

তোমাদের সাথে যা কিছু হচ্ছে, তা কোন নতুন ব্যাপার নয়। ইতিহাসে হরহামেশা এমনটিই হয়ে এসেছে। যে ব্যক্তিই ঈমানের দাবী করেছে তাকে অবশ্যই পরীক্ষার অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে দগ্ধ করা হয়েছে। আর অন্যদেরকেও যখন পরীক্ষা না করে কিছু দেয়া হয়নি তখন তোমাদের এমন কি বিশেষত্ব আছে যে, কেবলমাত্র মৌখিক দাবীর ভিত্তিতেই তোমাদেরকে দেয়া হবে?

এই সকল আয়াতের অবতীর্ণ হওয়ার কারণ সম্পর্কে যে বর্ণনা রয়েছে তাতে বলা হয়েছে যে, সাহাবা (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট মক্কার কাফেরদের অত্যাচার ও উৎপীড়নের কথা অভিযোগ করে দু'আর আবেদন জানালেন, যাতে আল্লাহ তাঁদের সাহায্য করেন। তিনি বললেন, দুখঃ-কষ্ট ভোগ করা ঈমানদারদের ইতিহাসের একটি অংশ। তোমাদের পূর্বের কোন কোন মু'মিনকে গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে দাঁড় করিয়ে করাত দিয়ে তাকে দু'ফাঁক করে দেওয়া হয়েছে। অনুরূপ লোহার চিরুনি দিয়ে তাদের শরীর হতে গোশত আলাদা করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই সমস্ত অত্যাচার তাদেরকে হক পথ হতে ফেরাতে পারেনি। *(বুখারীঃ আম্বিয়ার হাদীস অধ্যায়)*আম্মার, তাঁর মাতা সুমাইয়্যাহ ও পিতা ইয়াসির, সুহায়েব, বিলাল ও মিকদাদ (রাঃ) ইত্যাদি সাহাবাদের উপর ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে যে অত্যাচারের পাহাড় ভাঙ্গা হয়েছিল তা ইতিহাসের পাতায় আজও সংরক্ষিত আছে। এই পরিস্থিতি ও ঘটনাবলীই এসব আয়াতের অবতীর্ণ হওয়ার কারণ। পরন্তু আয়াতের সাধারণ অর্থের দিক দিয়ে কিয়ামতের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সকল ঈমানদারও এতে শামিল। [তাফসীরে আহসানুল বায়ান]

এখানে لَيَعْلَمَنَّএর শাব্দিক অনুবাদ হবে, "আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন"। অর্থাৎ এসব পরীক্ষা ও বিপদাপদের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা খাঁটি-অখাঁটি এবং সৎ ও অসাধুর মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য ফুটিয়ে তুলবেন। কেননা, খাঁটিদের সাথে কপট বিশ্বাসীদের মিশ্রণের ফলে মাঝে মাঝে বিরাট ক্ষতিসাধিত হয়ে যায়। [মুয়াসসার] আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য সৎ, অসৎ এবং খাঁটি-অখাঁটি পার্থক্য ফুটিয়ে তোলা। একে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা জেনে নেবেন কারা সত্যবাদী এবং কারা মিথ্যাবাদী। প্রত্যেক মানুষের সত্যবাদিতা ও মিথ্যাবাদিতা তার জন্মের পূর্বেই আল্লাহ্ তা'আলার জানা রয়েছে। তবুও পরীক্ষার মাধ্যমে জানার অর্থ এই যে, এই পার্থক্যকে অপরাপর লোকদের কাছেও প্রকাশ করে দেবেন। [তাফহীমুল কুরআন]

বস্তুত: মানুষকে আল্লাহ্ তা'আলা বিভিন্ন ভাবে পরীক্ষা করে থাকেন। ভাল-মন্দ, ধনী-গরিব, দুঃখকষ্ট, সার্বিক অবস্থায় ফেলে তিনি তাদের পরীক্ষা সম্পন্ন করেন। এসমস্ত অবস্থায় বিশ্বাসে সন্দেহ হলে যদি সে তা তাড়িয়ে দিয়ে ঈমানের উপর স্থির থাকতে পারে তবেই সে সফলকাম। অনুরূপভাবে তার প্রবৃত্তির পাগলা ঘোড়া তাকে যা ইচ্ছে তা করতে বললে সে যদি তা থেকে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে তবেই সে এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ও পাশ করেছে বলে বিবেচিত হবে।

اَمۡ حَسِبَ الَّذِيۡنَ يَعۡمَلُوۡنَ السَّيِّاٰتِ اَنۡ يَّسۡبِقُوۡنَا ؕ سَآءَ مَا يَحۡكُمُوۡنَ

৪. তবে কি যারা মন্দকাজ করে তারা মনে করে যে, তারা আমাদের আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে? তাদের সিদ্ধান্ত কত মন্দ!

মূল শব্দ হচ্ছে سابق অর্থাৎ আমার থেকে এগিয়ে যাবে। আয়াতের এ অর্থও হতে পারে, "আমার পাকড়াও এড়িয়ে অন্য কোথাও পালিয়ে যেতে পারবে।" অপর অর্থ হচ্ছে, তারা কি মনে করে যে, তাদের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড ও গোনাহসমূহ এমনিতেই ছেড়ে দেয়া হবে? তারা কি মনে করে যে, আল্লাহ এগুলো থেকে উদাসীন হয়ে যাবেন? আর এজন্যই কি তারা অপরাধগুলো করে যাচ্ছে? [সা'দী]

কারও কারও মতে, এখানে এর অর্থ হচ্ছে, যা কিছু আমি করতে চাই তা করতে আমার সফল না হওয়া এবং যা কিছু তারা করতে চায় তা করতে তাদের সফল হওয়া। আয়াতের আরেকটি অর্থ হচ্ছে, যারা অপরাধী তারা যেন এটা মনে না করে যে, তারা পরীক্ষা থেকে বাদ পড়ে যাবে। তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না। এ ধারণা কখনো ঠিক নয়। তারা যদি এ দুনিয়াতে পারও পেয়ে যায়, তাদের সামনে এমন শাস্তি ও আযাব রয়েছে তা তাদের জন্য যথেষ্ট। [ইবনে কাসীর]

مَنۡ كَانَ يَرۡجُوۡا لِقَآءَ اللّٰهِ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَاٰتٍ ؕ وَ هُوَ السَّمِيۡعُ الۡعَلِيۡمُ

৫. যে আল্লাহর সাক্ষাত কামনা করে সে জেনে রাখুক, আল্লাহর নির্ধারিত সময় আসবেই। আর তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

যে ব্যক্তি আখেরাতের জীবনে বিশ্বাসই করে না এবং মনে করে, কারো সামনে নিজের কাজের জবাবদিহি করতে হবে না এবং এমন কোন সময় আসবে না যখন নিজের জীবনের যাবতীয় কাজের কোন হিসেবা-নিকেশ দিতে হবে, তার কথা আলাদা। সে নিজের গাফলতির মধ্যে পড়ে থাকুক এবং নিশ্চিন্তে যা করতে চায় করে যাক। নিজের আন্দাজ-অনুমানের বিপরীত নিজের পরিণাম সে নিজেই দেখে নেবে। কিন্তু যারা আশা রাখে, এক সময় তাদেরকে তাদের মা'বুদের সামনে হাজির হতে হবে এবং নিজের কর্ম অনুযায়ী পুরস্কার ও শাস্তি পেতে হবে, তাদের এ ভুল ধারণায় ডুবে থাকা উচিত নয় যে, মৃত্যুর সময় অনেক দূরে। তাদের তো মনে করা উচিত, সে সময় অতি নিকটেই এসে গেছে এবং কাজের অবকাশ খতম হবারই পথে। তাই নিজের শুভ পরিণামের জন্য তারা যা কিছু করতে চায় করে ফেলুক। দীর্ঘ জীবন-কালের ভিত্তিহীন নির্ভরতার ওপর ভরসা করে নিজের সংশোধনে বিলম্ব করা উচিত নয়। অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "কাজেই যে তার রব-এর সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন সৎকাজ করে ও তার রব-এর ইবাদাতে কাউকেও শরীক না করে"। [সূরা আল-কাহাফ: ১১০]

তাদের এ ভুল ধারণাও পোষণ করা উচিত নয় যে, এমন কোন বাদশাহর সাথে তাদের ব্যাপার জড়িত, যিনি বিভিন্ন ব্যাপারের কোন খোঁজ খবর রাখেন না। যে আল্লাহর সামনে তাদের জবাবদিহি করার জন্য হাজির হতে হবে তিনি বেখবর নন বরং সবকিছু শোনেন ও জানেন। তাঁর কাছে তাদের কোন কথা গোপন নেই। [ইবনে কাসীর] তিনি জানেন কে কোন নিয়তে কাজ করে, আরও জানেন কে তাঁর মহব্বতের উপযুক্ত আর কে উপযুক্ত নয়। [সা'দী]

وَ مَنۡ جَاهَدَ فَاِنَّمَا یُجَاهِدُ لِنَفۡسِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِیٌّ عَنِ الۡعٰلَمِیۡنَ

৬. আর যে কেউ প্রচেষ্টা চালায়, সে তো নিজের জন্যই প্রচেষ্টা চালায়; আল্লাহ তো সৃষ্টিকুল থেকে অমুখাপেক্ষী।

"মুজাহাদা" শব্দটির মূল অর্থ হচ্ছে, কোন বিরোধী শক্তির মোকাবিলায় দ্বন্দ্ব, সংগ্রাম, প্রচেষ্টা ও সাধনা করা। আর যখন কোন বিশেষ বিরোধী শক্তি চিহ্নিত করা হয় না বরং সাধারণভাবে "মুজাহাদা" শব্দ ব্যবহার করা হয়, তখন এর অর্থ হয় একটি সর্বাত্মক ও সর্বব্যাপী দ্বন্দ্ব-সংঘাত। মু'মিনকে এ দুনিয়ায় যে দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম করতে হয় তা হচ্ছে এ ধরনের। তাকে শয়তানের সাথেও লড়াই করতে হয়, যে তাকে সর্বক্ষণ সৎকাজের ক্ষতির ভয় দেখায় এবং অসৎকাজের লাভ ও স্বাদ উপভোগের লোভ দেখিয়ে বেড়ায়। তাকে নিজের নফসের বা কুপ্রবৃত্তির সাথেও লড়তে হয়, যে তাকে সর্বক্ষণ নিজের খারাপ ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার দাসে পরিণত করে রাখার জন্য জোর দিতে থাকে। নিজের গৃহ থেকে নিয়ে বিশ্ব-সংসারের এমন সকল মানুষের সাথে তাকে লড়তে হয় যাদের আদর্শ, মতবাদ, মানসিক প্রবণতা, চারিত্রিক নীতি, রসম-রেওয়াজ, সাংস্কৃতিক ধারা এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিধান সত্য দ্বীনের সাথে সংঘর্ষশীল। তাকে এমন রাষ্ট্রের সাথেও লড়তে হয় যে আল্লাহর আনুগত্যমুক্ত থেকে নিজের ফরমান জারী করে এবং সততার পরিবর্তে অসততাকে বিকশিত করার জন্য শক্তি নিয়োগ করে। এ প্রচেষ্টা-সংগ্রাম এক-দু'দিনের নয়, সারাজীবনের। দিন-রাতের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে প্রতি মুহূর্তের। কোন একটি ময়দানে নয় বরং জীবনের প্রত্যেকটি ময়দানের ও প্রতিটি দিকে। [তাফহীমুল কুরআন]

আল্লাহ এ জন্য তোমাদের কাছে এ দ্বন্দ্ব-সংগ্রামের দাবী করছেন না যে, নিজের সার্বভৌম কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করার ও প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য তোমাদের সাহায্যের প্রয়োজন, বরং এটিই তোমাদের উন্নতি ও অগ্রগতির পথ, তাই তিনি তোমাদের এ দ্বন্দ্ব-সংগ্রামে লিপ্ত হবার নির্দেশ দিচ্ছেন। এ পথে অগ্রসর হয়ে তোমরা এমন শক্তির অধিকারী হতে পারো যার ফলে দুনিয়ায় তোমরা কল্যাণ ও সুকৃতির ধারক এবং আখেরাতে আল্লাহর জান্নাতের অধিকারী হবে। এ যুদ্ধ চালিয়ে তোমরা আল্লাহর কোন উপকার করবে না বরং তোমরা নিজেরাই উপকৃত হবে। তাছাড়া এ প্রচেষ্টার মাধ্যমে তোমরা আল্লাহর সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পার যার কথা সূরার শুরুতে আল্লাহ উল্লেখ করেছেন। [ইবনে কাসীর; ফাতহুল কাদীর; সা'দী, ইবনুল কাইয়্যেম, শিফাউল আলীল: ২৪৬]

وَ الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُکَفِّرَنَّ عَنۡهُمۡ سَیِّاٰتِهِمۡ وَ لَنَجۡزِیَنَّهُمۡ اَحۡسَنَ الَّذِیۡ کَانُوۡا یَعۡمَلُوۡنَ

৭. আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে আমরা অবশ্যই তাদের থেকে তাদের মন্দকাজগুলো মিটিয়ে দেব এবং আমরা অবশ্যই তাদেরকে তারা যে উত্তম কাজ করত, তার প্রতিদান দেব।

ঈমান অর্থ এমন সব জিনিসকে আন্তরিকভাবে মেনে নেয়া, যেগুলো মেনে নেবার জন্য আল্লাহ, তার রসূল ও তার কিতাব দাওয়াত দিয়েছে। আর সৎকাজ হচ্ছে, আল্লাহ ও তার রসূলের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করা। মানুষের চিন্তাধারা, ধারণা-কল্পনা ও ইচ্ছার পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতাই হচ্ছে মন ও মস্তিষ্কেও সৎকাজ। খারাপ কথা না বলা এবং হক-ইনসাফ ও সত্য-সততা অনুযায়ী সব কথা বলাই হচ্ছে কণ্ঠের সৎকাজ। আর মানুষের সমগ্র জীবন আল্লাহর আনুগত্য ও বন্দেগীর মধ্যে এবং তার বিধানসমূহ মেনে চলে অতিবাহিত করাই হচ্ছে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয়ের সৎকাজ। এ ঈমান ও সৎকাজের দু'টি ফল বর্ণনা করা হয়েছে।

একঃ মানুষের দুষ্কৃতি ও পাপগুলো তার থেকে দূর করে দেয়া হবে।

দুইঃ তার সর্বোত্তম কাজসমূহের সর্বোত্তম পুরস্কার তাকে দেয়া হবে। পাপ ও দুষ্কৃতির কয়েকটি অর্থ হয়। একটি অর্থ হচ্ছে ঈমান আনার আগে মানুষ যতই পাপ করে থাকুক না কেন ঈমান আনার সাথে সাথেই তা সব মাফ হয়ে যাবে। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, ঈমান আনার পর মানুষ বিদ্রোহ প্রবণতা সহকারে নয় বরং মানবিক দুর্বলতা বশত যেসব ভুল-ত্রুটি করে থাকে, তার সৎকাজের প্রতি নজর রেখে সেগুলো উপেক্ষা করা হবে। তৃতীয় অর্থ হচ্ছে, ঈমান ও সৎকর্মশীলতার জীবন অবলম্বন করার কারণে আপনা-আপনিই মানুষের নফসের সংশোধন হয়ে যাবে এবং তার অনেকগুলো দুর্বলতা দূর হয়ে যাবে। ঈমান ও সৎকাজের প্রতিদান সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছেঃ **لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ** এর দু'টি অর্থ হয়। একটি হচ্ছেঃ মানুষের সৎকাজগুলোর মধ্যে যেটি হবে সবচেয়ে ভালো সৎকাজ, তাকে সামনে রেখে তার জন্য প্রতিদান ও পুরস্কার নির্ধারণ করা হবে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, মানুষ তার কার্যাবলীর দৃষ্টিতে যতটা পুরস্কারের অধিকারী হবে তার চেয়ে বেশি ভালো পুরস্কার তাকে দেয়া হবে। একথাটি কুরআনের অন্যান্য স্থানেও বলা হয়েছেঃ "যে ব্যক্তি সৎকাজ নিয়ে আসবে তাকে তার থেকে দশগুণ বেশি দেয়া হবে।" (আনআমঃ ১৬০ আয়াত)

সূরা আল কাসাসে বলা হয়েছেঃ "যে ব্যক্তি সৎকাজ নিয়ে আসবে তাকে তার চেয়ে উত্তম প্রতিদান দেয়া হবে"

সূরা নিসায় বলা হয়েছেঃ "আল্লাহ তো কণামাত্র ও জুলুম করেন না এবং সৎকাজ হলে তাকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেন।"

وَ وَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ؕ وَ اِنْ جَاهَدٰكَ لِتُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ؕ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

৮. আর আমরা মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে। তবে তারা যদি তোমার উপর বল প্রয়োগ করে আমার সাথে এমন কিছু শরীক করতে যার সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তাহলে তুমি তাদেরকে মেনো না আমারই কাছে তোমাদের ফিরে আসা। অতঃপর তোমরা কি করছিলে তা আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব।

কুরআন কারীমের বিভিন্ন স্থানে মহান আল্লাহ তাঁর একত্ববাদের ও ইবাদতের আদেশ দানের সাথে সাথে পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করারও আদেশ দিয়েছেন। যাতে একথা সুস্পষ্ট হয় যে, আল্লাহর প্রতিপালকত্ব ও উপাস্যত্বের চাহিদা তারাই সঠিকভাবে বুঝতে ও পূরণ করতে পারে, যারা পিতা-মাতার আনুগত্য ও খিদমতের চাহিদাকে বুঝে ও পূরণ করে থাকে। যে ব্যক্তি এ কথা বুঝতে অক্ষম যে, পৃথিবীতে তার অস্তিত্ব তার মাতা-পিতার মিলনের একান্ত ফল এবং তার লালন-পালন তাদের সীমাহীন করুণা ও মায়া-মমতার ফসল। অতএব তাদের খিদমতে কোন প্রকার অনীহা ও তাদের কথার কোন প্রকার অবাধ্যতা প্রকাশ করা কোনক্রমেই সন্তানের উচিত নয়। পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান অবশ্যই সৃষ্টিকূলের সৃষ্টিকর্তাকে বুঝতে এবং তাঁর একত্ববাদ ও ইবাদতের চাহিদা পূরণ করতে অক্ষম। এই কারণেই পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার তাকীদ হাদীসেও এসেছে। এক হাদীসে মাতা-পিতার সন্তুষ্টিকে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং তাঁদের অসন্তুষ্টিকে আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ বলা হয়েছে। (সূরা ইসরা' ২৩-২৪ আয়াত দ্রষ্টব্য)

হাদীসে এসেছে, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লহু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহর কাছে সবচেয়ে উত্তম আমল কোনটি? তিনি বললেন; সময়মত সালাত আদায় করা। বললঃ তারপর কোনটি? তিনি বললেনঃ পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার। বললঃ তারপর কোনটি? তিনি বললেনঃ আল্লাহর পথে জিহাদ। [বুখারী: ৫৯৭০]

আয়াতে বর্ণিত "যাকে তুমি আমার শরীক হিসেবে জানো না" বাক্যাংশটিও অনুধাবনযোগ্য। এর মধ্যে তাদের কথা না মানার সপক্ষে একটি শক্তিশালী যুক্তি প্রদান করা হয়েছে। এতে শির্কের জঘন্যতা প্রকাশ পেয়েছে। কারণ শির্কের সপক্ষে কোন জ্ঞান নেই। কেউ শির্ককে সঠিক বলে প্রমাণ করতে পারবে না। [সা'দী] এটা পিতা-মাতার অধিকার যে, ছেলেমেয়েরা তাদের সেবা করবে, তাদেরকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করবে এবং বৈধ বিষয়ে তাদের কথা মেনে চলবে। কিন্তু শির্কের ব্যাপারে তাদের অনুসরণ করা যাবে না। অনুরূপভাবে কোন গোনাহর কাজেও নয়। যেমনটি রাসূলের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। [মুয়াস্‌সার]

এ অধিকার দেয়া হয়নি যে, মানুষ নিজের জ্ঞানের বিরুদ্ধে পিতামাতার অন্ধ অনুকরণ করবে। শুধুমাত্র বাপ-মায়ের ধর্ম বলেই তাদের ছেলে বা মেয়ের সেই ধর্ম মেনে চলার কোন কারণ নেই। সন্তান যদি এ জ্ঞান লাভ করে যে, তার বাপ-মায়ের ধর্ম ভুল ও মিথ্যা তাহলে তাদের ধর্ম পরিত্যাগ করে তার সঠিক ধর্ম গ্রহণ করা উচিত এবং তাদের চাপ প্রয়োগের পরও যে পথের ভ্রান্তি তার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে সে পথ অবলম্বন করা তার উচিত নয়। বাপ-মায়ের সাথে যখন এ ধরনের ব্যবহার করতে হবে তখন দুনিয়ার প্রত্যেক ব্যক্তির সাথেও এ ব্যবহার করা উচিত। যতক্ষণ না কোন ব্যক্তির সত্য পথে থাকা সম্পর্কে জানা যাবে ততক্ষণ তার অনুসরণ করা বৈধ নয়।

পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার সাথে সাথে এটাও জরুরী যে, আল্লাহর নির্দেশাবলীর অবাধ্যতা না হয়, সীমা পর্যন্ত পিতা-মাতার আনুগত্য করতে হবে। তারা যদি সন্তানকে কুফর ও শির্ক করতে বাধ্য করে, তবে এ ব্যাপারে কিছুতেই তাদের আনুগত্য করা যাবে না; যেমন হাদীসে আছে, আল্লাহর অবাধ্যতা করে কোন মানুষের আনুগত্য করা বৈধ নয়। [মুসনাদে আহমাদ: ১/১৩১] কোন কোন বর্ণনা মতে আলোচ্য আয়াত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি দশ জন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবীগণের অন্যতম ছিলেন এবং অতিশয় মাতৃভক্ত ছিলেন। তার মাতা হামনা বিনতে সুফিয়ান পুত্রের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ অবগত হয়ে খুবই মর্মাহত হয়। সে পুত্রকে শাসিয়ে শপথ করল, আমি তখন পর্যন্ত আহার্য ও পানীয় গ্রহণ করব না, যে পর্যন্ত তুমি পৈতৃক ধর্মে ফিরে না আস। আমি এমনিভাবে ক্ষুধা ও পিপাসায় মৃত্যুবরণ করব, যাতে তুমি মাতৃহন্তা রূপে বিশ্ববাসীর দৃষ্টিতে হেয় প্রতিপন্ন হও। [মুসলিম: ১৭৪৮]

এই আয়াত সাদকে মাতার আবদার রক্ষা করতে নিষেধ করল। অন্য বর্ণনায় এসেছে, সাদের জননী একদিন একরাত মতান্তরে তিনদিন তিনরাত শপথ অনুযায়ী অনশন ধর্মঘট অব্যাহত রাখলে সা'দ উপস্থিত হলেন। মাতৃভক্তি পূর্ববৎ ছিল; কিন্তু আল্লাহর ফরমানের মোকাবেলায় তা ছিল তুচ্ছ। তাই জননীকে সম্বোধন করে তিনি বললেনঃ আম্মাজান, যদি আপনার দেহে একশ' আত্মা থাকত, এবং একটি একটি করে বের হতে থাকত, তা দেখেও আমি আমার দ্বীন ত্যাগ করতাম না। এখন আপনি ইচ্ছা করলে পানাহার করুন অথবা মৃত্যুবরণ করুন। আমি আমার দ্বীন ত্যাগ করতে পারি না। এ কথায় নিরাশ হয়ে তার মাতা অনশন ভঙ্গ করল। [বাগভী]

এ দুনিয়ার আত্মীয়তা এবং আত্মীয়দের সাহায্য-সহযোগিতা কেবলমাত্র এ দুনিয়ার সীমা-ত্রিসীমা পর্যন্তই বিস্তৃত। সবশেষে পিতা-মাতা ও সন্তান সবাইকে তাদের স্রষ্টার কাছে ফিরে যেতে হবে। সেখানে তাদের প্রত্যেকের জবাবদিহি হবে। তাদের ব্যক্তিগত দায়িত্বের ভিত্তিতে। যদি পিতা-মাতা সন্তানকে পথভ্রষ্ট করে থাকে তাহলে তারা পাকড়াও হবে। যদি সন্তান পিতা-মাতার জন্য পথভ্রষ্টতা গ্রহণ করে থাকে তাহলে তাকে শাস্তি পেতে হবে। আর

সন্তান যদি সঠিক পথ অবলম্বন করে থাকে এবং পিতা-মাতার বৈধ অধিকার আদায় করার ক্ষেত্রেও কোন প্রকার ত্রুটি না করে থাকে। কিন্তু পিতা-মাতা কেবলমাত্র পথভ্রষ্টতার ক্ষেত্রে তাদের সহযোগী না হবার কারণে তাকে নির্যাতন করে থাকে, তাহলে তারা আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচতে পারবে না। আল্লাহ বলছেন যে, কিয়ামতের দিন তোমাদের প্রত্যাবর্তন তো আমারই কাছে।

তখন আমি তোমাদেরকে তোমাদের পিতামাতার প্রতি যে সদ্ব্যবহার করেছ এবং তোমাদের দ্বীনের উপর যে দৃঢ়পদ থেকেছ তার জন্য পুরস্কৃত করব। আর আমি তোমাকে সৎবান্দাদের সাথে হাশর করব, তোমার পিতা-মাতার দলে নয়। যদিও তারা দুনিয়াতে তোমার সবচেয়ে কাছের মানুষ ছিল। কারণ, একজন মানুষের হাশর কিয়ামতের দিন তার সাথেই হবে, যাকে সে ভালবাসে অর্থাৎ দ্বীনী ভালবাসা। তাই পরবর্তী আয়াতে বলেছেন যে, "আর যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে আমরা অবশ্যই তাদেরকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করব।" [ইবনে কাসীর, ফাতহুল কাদীর]

وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِى الصّٰلِحِيْنَ

৯. আর যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে আমরা অবশ্যই তাদেরকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করব।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, যারা সৎ আমল করবে ও ঈমান নিয়ে আসবে তিনি তাদেরকে সৎ কর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করবেন। অর্থাৎ তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। আর তারা তাদের এ সকল সৎ আমলের কারণে জান্নাতে অনাবিল আনন্দে বসবাস করবে। যেখানে তারা শুধু সুখই ভোগ করবে, কোন দুঃখ তাদেরকে স্পর্শ করবে না। এটা মূলত তাদের সৎ আমলের প্রতি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির কারণেই। তাই আমাদের উচিত সর্বদা ভাল আমল করা এবং মন্দ আমল করা থেকে বিরত থাকা। [ফাতহুল মাজীদ]

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ فَاِذَاۤ اُوْذِىَ فِى اللّٰهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللّٰهِ ؕ وَ لَئِنْ جَآءَ نَصْرٌ مِّنْ رَّبِّكَ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ؕ اَوَ لَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِمَا فِىْ صُدُوْرِ الْعٰلَمِيْنَ

১০. আর মানুষের মধ্যে কেউ কেউ বলে, আমরা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি, কিন্তু আল্লাহর পথে যখন তারা নিগৃহীত হয়, তখন তারা মানুষের পীড়নকে আল্লাহর শাস্তির মত গণ্য করে। আর আপনার রবের কাছ থেকে কোন সাহায্য আসলে তারা বলতে থাকে, আমরা তো তোমাদের সঙ্গেই ছিলাম সৃষ্টিকুলের অন্তঃকরণে যা আছে, আল্লাহ কি তা সম্যক অবগত নন?

যদিও বক্তা এক ব্যক্তিমাত্র কিন্তু সে "আমি ঈমান এনেছি" বলার পরিবর্তে বলছে, "আমরা ঈমান এনেছি"। এর মধ্যে একটি সূক্ষ্ম অর্থের প্রতি ইংগিত রয়েছে তা হলো মুনাফিক সবসময় নিজেকে মুমিনদের মধ্যে শামিল করার চেষ্টা করে থাকে এবং নিজের ঈমানের উল্লেখ এমনভাবে করে থাকে যাতে মনে হয় সেও ঠিক অন্যদের মতই মুমিন। এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে, যেমন কোন কাপুরুষ যদি কোন সেনাদলের সাথে গিয়ে থাকে এবং সেনাদলের অসম সাহসী সৈনিকেরা লড়াই করে শত্রুদলকে বিতাড়িত করে দিয়ে থাকে তাহলে কাপুরুষটি নিজে কোন কাজে অংশ গ্রহণ না করে থাকলেও সে এসে লোকদেরকে বলবে, আমরা গিয়েছি, আমরা ভীষণ যুদ্ধ করেছি এবং শত্রুকে

পরাস্ত করেছি। অর্থাৎ সেও যেন সেই অমিত সাহসী যোদ্ধাদের সাথে মিলে যুদ্ধ করেছিল। [আত-তাফসীরুল কাবীর]

আল্লাহর আযাবের ভয়ে যেমন কুফরী ও গোনাহ থেকে বিরত থাকা উচিত এ ব্যক্তি ঠিক তেমনি বান্দা প্রদত্ত নির্যাতন-নিগ্রহের ভয়ে ঈমান ও সৎকাজ থেকে বিরত হয়েছে। ঈমান আনার পর যখন সে কাফেরদের হুমকি, মারধর ও নির্যাতনের সম্মুখীন হয় তখন সে মনে করে যে এটা বোধ হয় আল্লাহর শাস্তি তখন সে ঈমান থেকে সরে যায়। [ইবন কাসীর] অথবা আয়াতের অর্থ, তখন সে এমন পেরেশান হয়ে যায় যে রকম পেরেশান হতে হয় আল্লাহর আযাবের ক্ষেত্রে। ফলে মুরতাদ হয়ে যায় [মুয়াস্সার] অথবা আয়াতের অর্থ, তারা মানুষের নির্যাতনের সম্মুখীন হলে সে নির্যাতন তাদের জন্য দ্বীন ইসলাম থেকে ফিরে যাওয়া বা মুরতাদ হওয়ার কারণে পরিণত হয়, যেমন আল্লাহর আযাব কুফরি ও গোনাহ থেকে ফিরে থাকার কারণ হয়। এ আয়াতের সমর্থনে অন্য আয়াত হচ্ছে, “আর মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর ইবাদাত করে দ্বিধার সাথে; তার মংগল হলে তাতে তার চিত্ত প্রশান্ত হয় এবং কোন বিপর্যয় ঘটলে সে তার পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। সে ক্ষতিগ্রস্ত হয় দুনিয়াতে এবং আখেরাতে; এটাই তো সুস্পষ্ট ক্ষতি।” [সূরা আল হাজ্জ: ১১]

আজ সে নিজেকে বাঁচাবার জন্য কাফেরদের সাথে যোগ দিয়েছে এবং মুমিনদের পক্ষ ত্যাগ করেছে। কারণ সত্য দ্বীনের সম্প্রসারণের জন্য নিজের গায়ে আঁচড়টি লাগাতেও সে প্রস্তুত নয়। কিন্তু যখন এ দ্বীনের জন্য জীবন উৎসর্গকারীদেরকে আল্লাহ সাফল্য ও বিজয়-দান করবেন তখন এ ব্যক্তি বিজয়ের ফল গনীমতের মাল ভাগ করে নেবার জন্য এসে যাবে এবং মুসলিমদের বলবে, আমি তো মনে প্রাণে তোমাদেরই সাথে ছিলাম, তোমাদের সাফল্যের জন্য দো'আ করছিলাম এবং তোমাদের প্রচেষ্টা, সংগ্রাম ও কুরবানীকে আমি বিরাট মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখেছি। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, “যারা তোমাদের অমংগলের প্রতীক্ষায় থাকে, তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের জয় হলে বলে, “আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না।” আর যদি কাফেরদের কিছু বিজয় হয়, তবে তারা বলে, আমরা কি তোমাদের বিরুদ্ধে প্রবল ছিলাম না এবং আমরা কি তোমাদেরকে মুমিনদের হাত থেকে রক্ষা করিনি?” [সূরা আন-নিসা: ১৪১]

আরও বলেন, “আর নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে এমন লোক আছে, যে গড়িমসি করবেই। অতঃপর তোমাদের কোন মুসীবত হলে সে বলবে, তাদের সংগে না থাকায় আল্লাহ আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আর তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ হলে, যেন তোমাদের ও তার মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই এমনভাবে বলবেই, ‘হায়! যদি তাদের সাথে থাকতাম। তবে আমিও বিরাট সাফল্য লাভ করতাম।” [সূরা আন-নিসা: ৭২-৭৩] আরও বলেন, “অতঃপর হয়ত আল্লাহ বিজয় বা তার কাছ থেকে এমন কিছু দেবেন যাতে তারা তাদের অন্তরে যা গোপন রেখেছিল সে জন্য লজ্জিত হবে।” [সূরা আল-মায়িদাহ: ৫২] মোটকথা পরবর্তী বাক্যে আল্লাহ্ তাদেরকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে বলেছেন যে, তিনি সৃষ্টিকুলের অন্তরের সব খবর জানেন। [আদওয়াউল বায়ান]

وَ لَيَعۡلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَ لَيَعۡلَمَنَّ الۡمُنٰفِقِيۡنَ

১১. আর আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন কারা ঈমান এনেছে এবং অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন কারা মুনাফিক।

আয়াতের শাব্দিক অনুবাদ হচ্ছে, আল্লাহ অবশ্যই জানবেন কারা ঈমান এনেছে, আর অবশ্যই জানবেন কারা মুনাফিক। আল্লাহর এ জানার অর্থ প্রকাশ করে দেয়া। যাতে করে মুমিনদের ঈমান ও মুনাফিকদের মুনাফিকির অবস্থা যাতে উন্মুক্ত হয়ে যায় এবং যার মধ্যে যা কিছু লুকিয়ে আছে সব সামনে এসে যায় সে জন্য আল্লাহ বারবার পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন। [দেখুন, ইবন কাসীর] একথাটিই কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছেঃ “আল্লাহ মুমিনদেরকে কখনো এমন অবস্থায় থাকতে দেবেন না, যে অবস্থায় এখন তোমরা আছে (অর্থাৎ সাচ্চা ঈমানদার

ও মুনাফিক সবাই মিশ্রিত হয়ে আছো) যতক্ষণ না তিনি পবিত্র লোকদেরকে অপবিত্র লোকদের থেকে সুস্পষ্টভাবে আলাদা করে দেবেন।” [সূরা আলে ইমরান: ১৭৯]

আরও এসেছে, “আর আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব, যতক্ষণ না আমরা জেনে নেই তোমাদের মধ্যে জিহাদকারী ও ধৈর্যশীলদেরকে এবং আমরা তোমাদের কর্মকাণ্ড পরীক্ষা করি।” [সূরা মুহাম্মাদ: ৩১] অর্থাৎ আল্লাহ তা’আলা শুধু তাঁর জ্ঞান অনুসারে কোন ফয়সালা করতে চান না। তিনি চান তাদের অন্তরের লুকানো বিষয় প্রকাশ হয়ে পড়ুক। আর সে জন্যই তিনি তাদেরকে পরীক্ষা করেন। এ পরীক্ষার মাধ্যমে তিনি প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করতে চান। যাতে কিয়ামতের মাঠে বলতে না পারে যে, আপনি আমাদের যদি পরীক্ষা করতেন হয়ত আমরা সে পরীক্ষায় টিকে যেতাম।

ۛ وَ قَالَ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا لِلَّذِيۡنَ اٰمَنُوا اتَّبِعُوۡا سَبِيۡلَنَا وَ لۡنَحۡمِلۡ خَطٰيٰكُمۡ ؕ وَ مَا هُمۡ بِحٰمِلِيۡنَ مِنۡ خَطٰيٰهُمۡ مِّنۡ شَیۡءٍ ؕ اِنَّهُمۡ لَكٰذِبُوۡنَ

১২. আর কাফিররা মুমিনদেরকে বলে, তোমরা আমাদের পথ অনুসরণ কর তাহলে আমরা তোমাদের পাপভার বহন করব। কিন্তু ওরা তো তাদের পাপভারের কিছুই বহন করবে না। নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী।

কুরাইশ সর্দারদের এ উক্তিটি ছিল সেসব ঈমানদারদের প্রতি যারা তাওহীদ ও আখেরাতের পুরস্কার ও শাস্তিতে বিশ্বাস করত। তারা তাদেরকে তাওহীদের কথা, মৃত্যু পরবর্তী জীবন, হাশর-নশর, হিসেব ও শাস্তি-পুরষ্কার সম্পর্কে বলত, এসব কথা একদম বাজে ও উদ্ভট। কিন্তু ধরে নেয়া যাক যদি আখেরাতের কোন জীবন এবং সেখানে জবাবদিহির কোন বিষয় থেকেই থাকে, তাহলে তার দায়ভার আমরা গ্রহণ করছি। আল্লাহর সামনে সমস্ত শাস্তি ও পুরস্কারের বোঝা আমরা মাথা পেতে নেবো। আমাদের কথায় তোমরা এ নতুন দ্বীন ত্যাগ করো এবং নিজেদের পিতৃ পুরুষের দ্বীনের দিকে ফিরে এসো।

‘মিথ্যাচার’ মানে তারা যে বলেছিল “তোমরা আমাদের অনুসরণ করো এবং তোমাদের গোনাহগুলো আমরা নিজেদের ওপর চাপিয়ে নেবো।” এটা পুরোপুরি মিথ্যাচার। [দেখুন: মুয়াসসার] কারণ কিয়ামতে একে অপরের বোঝা কখনও বহন করবে না। আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেন, “আর কোন বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না; এবং কোন ভারাক্রান্ত ব্যক্তি যদি কাউকেও তা বহন করতে ডাকে তবে তার থেকে কিছুই বহন করা হবে না— এমনকি নিকট আত্মীয় হলেও।”। [সূরা ফাতির: ১৮] আরও বলেন, “আর সুহৃদ সুহৃদের খোঁজ নেবে না, তাদেরকে করা হবে এককে অন্যের দৃষ্টিগোচর। অপরাধী সেদিনের শাস্তির বদলে দিতে চাইবে তার সন্তানসন্ততিকে—” [সূরা আল-মা'আরিজ: ১০–১১]

وَ لَيَحۡمِلُنَّ اَثۡقَالَهُمۡ وَ اَثۡقَالًا مَّعَ اَثۡقَالِهِمۡ ۫ وَ لَيُسۡـَٔلُنَّ يَوۡمَ الۡقِيٰمَةِ عَمَّا كَانُوۡا يَفۡتَرُوۡنَ

১৩. তারা তো বহন করবে নিজেদের ভার এবং নিজেদের বোঝার সাথে আরো কিছু বোঝা; আর তারা যে মিথ্যা রটনা করত সে সম্পর্কে কিয়ামতের দিন অবশ্যই তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে।

কাফেররা মুসলিমগণকে বলত, তোমরা অহেতুক আখেরাতে শাস্তির ভয়ে আমাদের পথে চলছ না। আমরা কথা দিচ্ছি, যদি তোমাদের কথাই সত্য হয় যে, আমাদের পথে চললে আখেরাতে শাস্তি পেতে হবে, তবে তোমাদের পাপভার আমরাই বহন করব। যা কিছু শাস্তি হবে, আমাদেরই হবে। [ইবন কাসীর] সাধারণ মুসলিমগণের সাথে কাফেরদের এমনি ধরনের উক্তির জওয়াবে আল্লাহ তা'আলা বলছেন, যারা এরূপ বলে তারা সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদী।

আখেরাতের ভয়াবহ আযাব দেখে তারা তাদের পাপভার বহন করবেই না। কাজেই তাদের এই ওয়াদা মিথ্যা। তাছাড়া তোমাদের পাপভোর বহন করে তারা তোমাদেরকে মুক্ত করে দেবে- একথা তো ভ্রান্ত ও মিথ্যা, তবে তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করা ও সত্য পথ থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টা স্বয়ং একটি বড় পাপ। এই পাপভারও তাদের কাঁধে চাপিয়ে দেয়া হবে। ফলে তারা নিজেদের পাপভারও বহন করবে এবং যাদের বিভ্রান্ত করেছিল, তাদের পাপভারও এক সাথে বহন করবে। [ইবন কাসীর]

এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, যে ব্যক্তি অপরকে পাপকাজে লিপ্ত করতে অনুপ্রাণিত করে অথবা পাপকাজে তাকে সাহায্য করে, সে-ও আসল পাপীর অনুরূপ অপরাধী। কুরআন মজীদের অন্য এক জায়গায় এ নিয়মটিকে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, “যাতে কিয়ামতের দিন তারা নিজেদের বোঝাও পুরোপুরি বহন করে এবং এমনসব লোকদের বোঝার একটি অংশও বহন করে যাদেরকে তারা জ্ঞান ছাড়াই গোমরাহ করে।” [সূরা আন-নাহল: ২৫] আর এ নিয়মটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নোক্ত হাদীসটিতে বর্ণনা করেছেন: “যে ব্যক্তি সঠিক পথের দিকে আহবান জানায় সে তাদের সমান প্রতিদান পাবে যারা তার আহবানে সাড়া দিয়ে সঠিক পথ অবলম্বন করে, এ জন্য তাদের প্রাপ্যে কোন কমতি করা হবে না। আর যে ব্যক্তি গোমরাহীর দিকে আহবান জানায় সে তাদের সবার সমান গোনাহের ভাগী হবে যারা তার অনুসরণ করে এবং এ জন্য তাদের গোনাহের মধ্যে কোন কমতি করা হবে না।” [মুসলিম: ২৬৭৪]

ফুটনোট

▣ ঈমান, শুধুমাত্র মুখে দাবি করার মতো কোনো বিষয় নয়; বরং এর সঙ্গে থাকে নানা ধরনের পরীক্ষা। ঈমানদার ব্যক্তিকে কাজে-কর্মে একথা প্রমাণ করতে হবে যে, ঈমান রক্ষার জন্য সে যেকোনো ধরনের ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত।

▣ ইতিহাসের নানা পরিক্রমায় মহান আল্লাহ তার বান্দাদের পরীক্ষা নিয়েছেন। প্রত্যেক ব্যক্তিকেই জীবনের কোনো না কোনো সময় পরীক্ষায় পড়তে হয়। ধনি ব্যক্তিকে ধন দিয়ে, গরীবকে দারিদ্র দিয়ে, ক্ষমতাসীনকে ক্ষমতা দিয়ে এবং দুর্বলকে অক্ষমতা দিয়ে পরীক্ষা করা হয়। মানুষকে তার ঈমান অনুপাতে পরীক্ষা করা হয়। যার ঈমান যত মজবুত তার পরীক্ষা তত কঠিন।

▣ অনবরত পাপকাজ করতে থাকলে তা মানুষের চিন্তাধারার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। ফলে সে আল্লাহ ও তার সৃষ্টিজগত সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করতে থাকে।

▣ মানুষ যা আমল করে তা আমলকারীর ওপর বর্তাবে, ভাল করলে ভাল আর মন্দ করলে মন্দ। ঈমানদার সৎ ব্যক্তিদের দ্বারা কোন পাপ কাজ হয়ে গেলে তা থেকে তাওবা করলে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দেন এমনকি আরো উত্তম প্রতিদান দেন।

▣ এখানে জিহাদের যে কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার অর্থ সব সময় তলোয়ার নিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া নয়। এখানে জিহাদের অর্থ চেষ্টা ও সংগ্রাম করা। নিজের নফস বা কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধের পাশাপাশি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে শত্রুর ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম উভয়কেই এই জিহাদের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এই দুই ধরনের জিহাদেই লাভ হবে মুসলমানদের।

▣ আল্লাহর রাস্তায় চেষ্টা ও সংগ্রাম করলে তিনি আমাদের ভুল-ত্রুটিগুলো ক্ষমা করে দেবেন এবং আমাদের প্রচেষ্টার উৎকৃষ্টতর প্রতিদান দেবেন।

▣ সর্বদা পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করতে হবে। তারা খারাপ ব্যবহার করলেও তাদের সাথে অসদ্ব্যবহার করা যাবে না। পিতা-মাতা যদি আল্লাহ তা'আলার সাথে শির্ক করার নির্দেশ দেয় শুধু সেক্ষেত্রে তাদের অনুসরণ করা যাবে না।

▣ মানুষকে সর্বশেষে আল্লাহ তা'আলার দিকেই ফিরে যেতে হবে। সৎ কর্ম করলে সৎ কর্মশীলদের মধ্যে শামিল হওয়া যায়।

▣ কিছু মানুষের ঈমান শুধু মুখে প্রকাশ পায়; অন্তরে প্রবেশ করে না। কাজেই কেউ নিজেকে ঈমানদার দাবি করলেই তার কথা বিশ্বাস করা যাবে না। কঠিন ও বিপদের দিনগুলোতেই খাঁটি ঈমানদার ব্যক্তিদের চেনা সম্ভব।

▣ ঈমানদার ব্যক্তিকে অনেক সময় চরম বিপদের মুখোমুখি হতে হয়। প্রকৃত মুমিন ব্যক্তিরা এ ধরনের বিপদের দিনে ধৈর্য ধরে এবং আল্লাহর সাহায্য চায়।

▣ মুনাফেক হচ্ছে সুযোগ-সন্ধানী ব্যক্তি। বিপদের সময় ও কঠিন দিনে সে পালিয়ে থাকে এবং বিজয়ের দিনে সে নিজের ডেরা থেকে বেরিয়ে এসে বিজয়ী জনতার কাতারে মিশে যায়। সে নিজেকে মুমিনদের সহযোগী দাবি করে যুদ্ধজয়ের গনিমাত বা ক্ষমতার অংশ দাবি করে বসে।

▣ প্রত্যেককে তার পাপের বোঝা বহন করতে হবে। অসৎ কাজ করা ও অসৎ কাজের পথ দেখানো সমান অপরাধ।

▣ কাফিররা বিভিন্ন কৌশল ও লোভ দেখিয়ে মুসলিমকে পথভ্রষ্ট করতে চাইবে, সুতরাং সর্বদা সাবধান থাকতে হবে, কখনো তাদের প্ররোচনায় প্ররোচিত হওয়া যাবে না।

কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২৪
প্রস্তুতি সহায়ক তাফসীর নোট পর্বঃ ১১

সূরা আনকাবুত ১৪-২২ আয়াত

وَ لَقَدۡ اَرۡسَلۡنَا نُوۡحًا اِلٰی قَوۡمِهٖ فَلَبِثَ فِیۡهِمۡ اَلۡفَ سَنَۃٍ اِلَّا خَمۡسِیۡنَ عَامًا ؕ فَاَخَذَهُمُ الطُّوۡفَانُ وَ هُمۡ ظٰلِمُوۡنَ

১৪. আর আমরা তো নূহকে তার সম্প্রদায়ের কাছে পাঠিয়েছিলাম। তিনি তাদের মধ্যে অবস্থান করেছিলেন পঞ্চাশ কম হাজার বছর। অতঃপর প্লাবন তাদেরকে গ্রাস করে; এমতাবস্থায় যে তারা ছিল যালিম।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফেরদের বিরোধিতা ও মুসলিমদের উপর নির্যাতনমূলক অবস্থা বর্ণিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে নির্যাতনমূলক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সান্তনা দেয়ার জন্যে পূর্ববর্তী নবীগণ ও তাদের উম্মতের কিছু অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, প্রাচীনকাল থেকেই সত্যপন্থীদের উপর কাফেরদের তরফ থেকে নির্যাতনের ধারা অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু এসব-উৎপীড়নের কারণে তারা কোন সময় সাহস হারাননি। মুমিনদের উচিত কাফেরদের উৎপীড়নের পরওয়া না করা। পূর্ববর্তী নবীগণের মধ্যে সর্বপ্রথম নূহ আলাইহিস সালাম-এর কাহিনী উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমত: এর কারণ এই যে, তিনিই প্রথম নবী, যিনি কুফর ও শিরকের মোকাবেলা করেছেন। দ্বিতীয়ত: তার সম্প্রদায়ের তরফ থেকে তিনি যতটুকু নির্যাতিত হয়েছিলেন, অন্য কোন নবী ততটুকু হননি। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বিশেষভাবে সুদীর্ঘ জীবন দান করেছিলেন এবং তার সমস্ত জীবন কাফেরদের নিপীড়নের মধ্যে অতিবাহিত হয়।

কুরআনের এ সূরায় বর্ণিত তার বয়স সাড়ে নয়শ' বছর তো অকাট্য ও নিশ্চিতই। কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, এটা তার প্রচার ও দাওয়াতের বয়স। এর আগে এবং প্লাবনের পরেও তার আরও বয়স আছে। [ফাতহুল কাদীর] মোটকথা, এই অসাধারণ সুদীর্ঘ বয়স অবিরাম দাওয়াত ও তাবলীগে ব্যয় করা এবং প্রতিক্ষেত্রেই কাফেরদের তরফ থেকে নানারকম উৎপীড়ন সহ্য করা সত্বেও কোন সময় সাহস না হারানো—এগুলো সব নূহ আলাইহিস সালাম-এরই বৈশিষ্ট্য। এখানে এ জিনিসটি বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য যে, হে মুহাম্মাদ! আপনি কাফের মুশরিকদের অবাধ্যতায় আফসোস করে নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত করবেন না। কারণ হেদায়াত আল্লাহর হাতে তিনি যাকে ইচ্ছা হেদায়াত করবেন আর যাকে ইচ্ছে হেদায়াত থেকে দূরে রাখবেন। আপনার দায়িত্ব তো তাবলীগের মাধ্যমেই সমাপ্ত হবে। তবে এটা জেনে রাখুন যে, আল্লাহ আপনার দ্বীনকে জয়ী করবেন। আপনার শত্রুদের বিনাশ করবেন। [ইবনে কাসীর]

আর আয়াতের মাধ্যমে মুমিনদের হেদায়াত দেয়া হচ্ছে যে, তোমরা তো মাত্র পাঁচ বছর থেকে জুলুম-নির্যাতন সহ্য করছো এবং একটি গোমরাহ জাতির হঠকারিতা বরদাশত করে চলছো। কিন্তু আমার এ বান্দা যে অনবরত সাড়ে নয়শ' বছর ধরে এসবের মোকাবিলা করেছে তার সবর ও দৃঢ়তার কথা ভেবে দেখো। তুলনামূলক অধ্যয়নের জন্য দেখুন সূরা আলে ইমরান: ৩৩–৩৪; সূরা আন নিসা: ১৬৩; সূরা আল আন'আম: ৮৪; সূরা আল-আ'রাফ: ৫৯ থেকে ৬৪; সূরা ইউনুস: ৭১ ও ৭৩; সূরা হূদ: ২৫ ও ৪৮; সূরা আল আম্বিয়া: ৭৬ ও ৭৭; সূরা আল মুমিনুন: ২৩ ও ৩০; সূরা আল ফুরকান: ৩৭; সূরা আশ শো'আরা: ১০৫ থেকে ১২৩; সূরা আস সাফ্ফাত: ৭৫ ও ৮২; সূরা আল কামার: ৯০; সূরা আল হাক্কাহ: ১১ ও ১২ আয়াত এবং সূরা নূহ সম্পূর্ণ।

তারা নিজেদের যুলুম-নিপীড়ন চালিয়ে যেতে থাকা অবস্থায় মহাপ্লাবনের গ্রাসে পরিণত হয়। যদি মহাপ্লাবন আসার আগে তারা নিজেদের যুলুম-নিপীড়ন থেকে বিরত হতো তাহলে আল্লাহ তাদের ওপর এ আযাব পাঠাতেন না। কিন্তু তারা নূহের কথা না শুনে যুলুম ও শির্কেই নিপতিত ছিল। [ফাতহুল কাদীর]

فَاَنۡجَیۡنٰهُ وَ اَصۡحٰبَ السَّفِیۡنَۃِ وَ جَعَلۡنٰهَاۤ اٰیَۃً لِّلۡعٰلَمِیۡنَ

১৫. অতঃপর আমরা তাকে এবং যারা নৌকায় আরোহণ করেছিল তাদেরকে রক্ষা করলাম এবং সৃষ্টিকুলের জন্য এটাকে করলাম একটি নিদর্শন।

এর অর্থ এও হতে পারে যে, এ ভয়াবহ শাস্তি অথবা এ যুগান্তকারী ঘটনাটিকে পরবর্তীকালের লোকদের জন্য শিক্ষণীয় করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু এখানে এবং সূরা কামারে একথাটি যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে তা থেকে একথাই সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, নৌকাটিই ছিল শিক্ষণীয় নিদর্শন। শত শত বছর ধরে সেটি পর্বত শৃঙ্গে অবস্থান করছিল। এর মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মদের কাছে এ সংবাদ পৌঁছিয়ে যেতে থেকেছে যে, এ ভূখণ্ডে এক সময় এমন ভয়াবহ প্লাবন এসেছিল যার ফলে এ নৌকাটি পাহাড়ের মাথায় উঠে যায়। সূরা আল কামারে এ সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ

“আর নূহকে আমি আরোহণ করালাম তখতা ও পেরেকের তৈরি নৌকায়। তা চলছিল আমার তত্ত্বাবধানে সেই ব্যক্তির জন্য পুরস্কার স্বরূপ যাকে অস্বীকার করা হয়েছিল। আর আমি তাকে ছেড়ে দিলাম একটি নিদর্শনে পরিণত করে; কাজেই আছে কি কেউ শিক্ষা গ্রহণকারী? ”

সূরা আল কামারের এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে জারীর কাতাদার এ বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেনঃ সাহাবীগণের আমলে মুসলমানরা যখন আল জাযীরায় যায় তখন তারা জুদী পাহাড়ের ওপর (অন্য একটি বর্ণনা মতে বাকেরওয়া নামক জনবসতির কাছে) এ নৌকাটি দেখে। বর্তমানকালে মাঝে মাঝে এ ধরনের খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হতে দেখা গেছে যে, নূহের নৌকা অনুসন্ধান করার জন্য অভিযাত্রী দল পাঠানো হচ্ছে। এর কারণ বর্ণনা করে বলা হয়, অনেক সময় বিমান আরারাতের পার্বত্য এলাকা অতিক্রম করার সময় আরোহীরা একটি পর্বতশৃঙ্গে একটি নৌকার মতো জিনিস দেখেছে।

وَ اِبۡرٰهِیۡمَ اِذۡ قَالَ لِقَوۡمِهِ اعۡبُدُوا اللّٰهَ وَ اتَّقُوۡهُ ؕ ذٰلِكُمۡ خَیۡرٌ لَّكُمۡ اِنۡ كُنۡتُمۡ تَعۡلَمُوۡنَ

১৬. আর স্মরণ করুন ইবরাহীমকে, যখন তিনি তার সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর এবং তার তাকওয়া অবলম্বন কর; তোমাদের জন্য এটাই উত্তম। যদি তোমরা জানতে!

এখানে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে, যিনি অনেক কঠিন অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। নমরূদের অগ্নি, অতঃপর শাম থেকে হিজরত করে তরুলতাহীন জনশূন্য প্রান্তরে অবস্থান, আদরের দুলালকে যবেহ করার ঘটনা ইত্যাদি। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর কাহিনী প্রসঙ্গে লুত আলাইহিস সালাম ও তার উম্মতের ঘটনাবলী এবং সূরার শেষ পর্যন্ত অন্য কয়েকজন নবী ও তাদের উম্মতের অবস্থা এগুলো সব রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও উম্মতে মুহাম্মদীর সান্ত্বনার জন্যে এবং তাদেরকে দ্বীনের কাজে দৃঢ়পদ রাখার জন্যে বর্ণিত হয়েছে।

اِنَّمَا تَعۡبُدُوۡنَ مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ اَوۡثَانًا وَّ تَخۡلُقُوۡنَ اِفۡكًا ؕ اِنَّ الَّذِيۡنَ تَعۡبُدُوۡنَ مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ لَا يَمۡلِكُوۡنَ لَكُمۡ رِزۡقًا فَابۡتَغُوۡا عِنۡدَ اللّٰهِ الرِّزۡقَ وَ اعۡبُدُوۡهُ وَ اشۡكُرُوۡا لَهٗ ؕ اِلَيۡهِ تُرۡجَعُوۡنَ

১৭. তোমরা তো আল্লাহ ছাড়া শুধু মূর্তিপূজা করছ এবং মিথ্যা উদ্ভাবন করছ।(তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদত কর তারা তো তোমাদের রিযিকের মালিক নয়। কাজেই তোমরা আল্লাহর কাছেই রিযিক চাও এবং তারই ইবাদাত কর। আর তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তোমরা তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে।

এ কয়েকটি বাক্যের মধ্যে হযরত ইবরাহীম (আ) মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে সমস্ত যুক্তি একত্র করেছেন। কাউকে মাবুদ বা আরাধ্য করতে হলে এ জন্য যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকতে হবে। একটি যুক্তিসঙ্গত কারণ এ হতে পারে, তার নিজের সত্তার মধ্যে মাবুদ হবার কোন অধিকার থাকে। দ্বিতীয় কারণ হতে পারে, সে মানুষের স্রষ্টা এবং মানুষ নিজের অস্তিত্বের জন্য তার কাছে অনুগৃহীত। তৃতীয় কারণ হতে পারে, সে মানুষের লালন-পালনের ব্যবস্থা করে। তাকে রিযিক তথা জীবন ধারণের উপকরণ সরবরাহ করে। চতুর্থ কারণ হতে পারে, মানুষের ভবিষ্যত তার অনুগ্রহের ওপর নির্ভরশীল এবং মানুষ আশঙ্কা করে তার অসন্তুষ্টি অর্জন করলে তার নিজের পরিণাম অশুভ হবে। হযরত ইবরাহীম বলেন, এ চারটি কারণের কোন একটিও মূর্তি পূজার পক্ষে নয়। বরং এর প্রত্যেকটিই নির্ভেজাল আল্লাহর প্রতি আনুগত্যেও দাবী কর। “এ নিছক মূর্তিপূজা” বলে তিনি প্রথম কারণটিকে বিলুপ্ত করে দেন। কারণ নিছক মূর্তি মাবুদ হবার ব্যক্তিগত কি অধিকার বিলুপ্ত করেন। তারপর “তোমরা তাদের স্রষ্টা” একথা বলে দ্বিতীয় কারণটিকে বিলুপ্ত করেন। এরপর তারা তোমাদের কোনো প্রকারের কোন রিযিক দান করতে পারে না, একথা বলে তৃতীয় কারণটিকে বিলুপ্ত করেন। আর সবশেষে বলেন, তোমাদের তো আল্লাহর দিকে ফিরে যেতেই হবে, এ মূর্তিগুলোর দিকে ফিরে যেতে হবে না। কাজেই তোমাদের পরিণাম ও পরকালকে সমৃদ্ধ বা ধ্বংস করার ক্ষমতাও এদের নেই। এ ক্ষমতা আছে একমাত্র আল্লাহর হাতে। এভাবে শিরককে পুরোপুরি বাতিল করে দিয়ে তিনি তাদের ওপর একথা সুস্পষ্ট করে দেন যে, মানুষ যে সমস্ত কারণে কাউকে মাবুদ বা আরাধ্য গণ্য করতে পারে তার কোনটাই এক ও লা-শারীক আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ইবাদাত করার দাবী করে না। [তাফহীমুল কুরআন]

وَ اِنۡ تُكَذِّبُوۡا فَقَدۡ كَذَّبَ اُمَمٌ مِّنۡ قَبۡلِكُمۡ ؕ وَ مَا عَلَى الرَّسُوۡلِ اِلَّا الۡبَلٰغُ الۡمُبِيۡنُ

১৮. আর যদি তোমরা মিথ্যারোপ কর তবে তো তোমাদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যারোপ করেছিল। সুস্পষ্টভাবে প্রচার করা ছাড়া রাসূলের আর কোন দায়িত্ব নেই।

এটি ইবরাহীম (আঃ)-এর উক্তিও হতে পারে যা তিনি নিজ জাতির উদ্দেশ্যে করেছিলেন। অথবা আল্লাহরও কথা হতে পারে যাতে মক্কাবাসীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। আর এতে নবী (সাঃ)-কে সান্ত্বনা দেওয়া হচ্ছে যে, যদি মক্কার কাফেররা তোমাকে মিথ্যাবাদী মনে করে, তাহলে এতে ঘাবড়ে যাওয়ার কিছুই নেই। নবীদের সাথে এই আচরণই করা হয়ে থাকে। পূর্বের জাতিরাও তাদের নবীদেরকে মিথ্যাবাদী মনে করেছে। আর তার কুফলস্বরূপ তাদেরকে পৃথিবী হতে নিশ্চিহ্ন হতে হয়েছে।

অতএব তুমিও প্রচারের কাজ চালিয়ে যাও; কেউ হিদায়াতপ্রাপ্ত হোক বা না-ই হোক। এ দায়িত্ব তোমার নয় এবং এ সম্পর্কে তুমি জিজ্ঞাসিতও হবে না। কারণ, হিদায়াত দান করা একমাত্র আল্লাহর এখতিয়ারভুক্ত। যিনি নিজ হিকমত ও নিয়মানুসারে যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দানে ধন্য করেন। আর অন্যদেরকে ভ্রষ্ট ও অন্ধকার পথের পথিক বানিয়ে উদভ্রান্ত ছেড়ে দেন। [তাফসীরে আহসানুল বায়ান]

اَوَ لَمۡ يَرَوۡا كَيۡفَ يُبۡدِئُ اللّٰهُ الۡخَلۡقَ ثُمَّ يُعِيۡدُهٗ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيۡرٌ

১৯. তারা কি লক্ষ্য করে না, কিভাবে আল্লাহ্ সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেন? তারপর তিনি তা আবার সৃষ্টি করবেন। নিশ্চয় এটা আল্লাহর জন্য সহজ।

তাওহীদ (একতত্ত্ববাদে) ও রিসালাতের পর এখানে পরকালের প্রমাণ দেওয়া হচ্ছে, যা কাফেররা অস্বীকার করত। তিনি বলেছেন, প্রথম যখন তোমাদের কোন অস্তিতত্ত্বই ছিল না, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করলেন। তারপর তোমরা দেখা, শোনা ও বুঝার ক্ষমতা লাভ করলে। পরে যখন আবার তোমরা মৃত্যুর পর মাটিতে মিশে যাবে এবং বাহ্যিক দৃষ্টিতে তোমাদের কোনই নাম-নিশান থাকবে না, তখন মহান আল্লাহ তোমাদেরকে পুনর্বার সৃষ্টি করবেন। তোমাদের কাছে এ কাজ যতই অসম্ভব মনে হোক না কেন, আল্লাহর কাছে তা নিতান্ত সহজ কাজ।

قُلۡ سِيۡرُوۡا فِى الۡاَرۡضِ فَانۡظُرُوۡا كَيۡفَ بَدَاَ الۡخَلۡقَ ثُمَّ اللّٰهُ يُنۡشِئُ النَّشۡاَةَ الۡاٰخِرَةَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىۡءٍ قَدِيۡرٌ

২০. বলুন, তোমরা যমীনে ভ্রমণ করে অতঃপর প্রত্যক্ষ কর, কিভাবে তিনি সৃষ্টি আরম্ভ করেছেন? তারপর আল্লাহ সৃষ্টি করবেন পরবর্তী সৃষ্টি। নিশ্চয় আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

বিশ্ব-জাহানে ছড়িয়ে থাকা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের প্রতি লক্ষ্য কর। পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে দেখ, তাকে কিভাবে বিছিয়ে দিয়েছেন, তাতে পাহাড়-পর্বত নদ-নদী ও সমুদ্র সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে বিভিন্ন প্রকার ফল-ফসল উৎপন্ন করেছেন। এ সব কি এ কথার প্রমাণ বহন করে না যে, এ সব সৃষ্টি করা হয়েছে ও এ সবের সৃষ্টিকর্তা কেউ অবশ্যই আছেন?

يُعَذِّبُ مَنۡ يَّشَآءُ وَ يَرۡحَمُ مَنۡ يَّشَآءُ ۚ وَ اِلَيۡهِ تُقۡلَبُوۡنَ

২১. তিনি যাকে ইচ্ছে শাস্তি দেন এবং যার প্রতি ইচ্ছে অনুগ্রহ করেন। আর তোমরা তারই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে।

মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন এবং যার প্রতি ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন। তিনি পরম বিচারপতি, অধিপতি। তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই করেন। কেউ তাঁর হুকুম নড়াতে-টলাতে পারে না। কেউ তাঁর কাছে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারে না। পক্ষান্তরে তিনি সবারই উপর বিজয়ী ও পূর্ণ ক্ষমতাবান। তিনি যাকে ইচ্ছা প্রশ্ন করবেন। সবাই তার অধিকারভুক্ত, সবাই তার অধীনস্থ। সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা এবং সবকিছুরই মালিক তিনিই। তিনি যা কিছু করেন সবই ন্যায়ের ভিত্তিতে করেন। যেহেতু তিনিই মালিক, তিনি যুলুম হতে পবিত্র। হাদীস শরীফে আছে যে, আল্লাহ তা'আলা যদি সপ্ত আসমানবাসী ও সপ্ত যমীনবাসীর উপর শাস্তি অবতীর্ণ করেন তবুও তিনি অত্যাচারী সাব্যস্ত হবেন না। শাস্তি দেয়া এবং দয়া করা সবই তাঁরই হাতে। কিয়ামতের দিন সবাই তারই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে। সবকেই তাঁরই নিকট হাযির হতে হবে। [ইবনে কাসীর]

وَ مَاۤ اَنۡتُمۡ بِمُعۡجِزِیۡنَ فِی الۡاَرۡضِ وَ لَا فِی السَّمَآءِ ۫ وَ مَا لَکُمۡ مِّنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ مِنۡ وَّلِیٍّ وَّ لَا نَصِیۡرٍ

২২. আর তোমরা আল্লাহকে ব্যর্থ করতে পারবে না যমীনে, আর না আসমানে এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোন অভিভাবক নেই, সাহায্যকারীও নেই।

আসমান ও যমীনের কেউ আল্লাহকে অপারগ করতে পারবে না। অথবা, তোমরা পালিয়ে এমন কোন জায়গায় চলে যেতে পারো না যেখানে গিয়ে আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচতে পারো। সূরা আর রাহমানে এ কথাটিই জিন ও মানুষকে সম্বোধন করে চ্যালেঞ্জের সুরে এভাবে বলা হয়েছে যে, যদি তোমরা আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্ব ও শাসন থেকে বের হয়ে যেতে পারো তাহলে একটু বের হয়ে দেখিয়ে দাও। তা থেকে বের হবার জন্য শক্তির প্রয়োজন এবং সে শক্তি তোমাদের নেই। কাজেই তোমরা কোনক্রমেই বের হতে পারো না। [সূরা আর-রাহমান: ২৩]

আল্লাহর পাকড়াও থেকে নিজেদের শক্তির জোরে রক্ষা পাওয়ার ক্ষমতা তোমাদের নেই এবং তোমাদের এমন কোন অভিভাবক, পৃষ্ঠপোষক বা সাহায্যকারীও নেই যে আল্লাহর মোকাবিলায় তোমাদের আশ্রয় দিতে পারে এবং তাঁর কাছে জবাবদিহি থেকে বাঁচতে পারে। যারা শির্ক ও কুফরী করেছে, আল্লাহ্‌র নাফরমানী করেছে, সমগ্র বিশ্ব জাহানে তাদের সাহায্য ও সহায়তা দানকারী হিসেবে দাঁড়িয়ে যাবার এবং আল্লাহর আযাবকে তাদের ওপর কার্যকর হওয়া থেকে ঠেকিয়ে রাখার ক্ষমতা কারো নেই।

ফুটনোট

◘ পূর্ববর্তী নবীগণের মধ্যে সর্বপ্রথম নূহ আলাইহিস সালাম-এর কাহিনী উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমত: এর কারণ এই যে, তিনিই প্রথম নবী, যিনি কুফর ও শিরকের মোকাবেলা করেছেন। দ্বিতীয়ত: তার সম্প্রদায়ের তরফ থেকে তিনি যতটুকু নির্যাতিত হয়েছিলেন, অন্য কোন নবী ততটুকু হননি। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বিশেষভাবে সুদীর্ঘ জীবন দান করেছিলেন।

◘ এই দুনিয়াতে কোনো জাতির ধ্বংস ও মুক্তি নির্ভর করছে তার ঈমান ও কুফরের ওপর।

◘ দ্বীন প্রচারের ও দাওয়াতী কাজের ক্ষেত্রে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা বজায় রাখতে হবে। মনে মনে এই প্রস্তুতি থাকতে হবে যে, বেশিরভাগ লোক ঈমান নাও আনতে পারে।

◘ শামে হিজরত করার পর আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম (আঃ)-কে ইসহাক ও ইয়াকুব নামক দুটি সন্তান দান করেন। ইবরাহীম (আঃ)-এর পর যত নাবী এসেছেন সবাই তাঁর বংশ থেকে। এমনকি নবুওয়াতের ধারা শেষ হয়েছে আমাদের নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মাধ্যমে।

◘ কাফির-মুশরিকদেরকে সর্বপ্রথম তাওহীদের দাওয়াত দিতে হবে। আমরা যখন কাফির-মুশরিকদেরকে যখন তাওহীদের দাওয়াত দিব তখন তাদের বাতিল মা 'বূদগুলোর অক্ষমতা তুলে ধরব।

◘ যারা পার্থিব জীবনের সুযোগ সুবিধা পাওয়ার জন্য আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ওপর নির্ভর করে তারা প্রকারান্তরে আল্লাহর সঙ্গে শিরক করছে।

◘ যারা আল্লাহর পথে অবিচল থাকে তাদেরকে আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে সাহায্য করেন।

◘ ইসলাম একদিকে পার্থিব জীবনের চাহিদা মেটানোর জন্য প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম করার আহ্বান জানিয়েছে অন্যদিকে তাদেরকে আল্লাহর দেয়া নেয়ামতের শোকর আদায় করতে বলেছে। সেইসঙ্গে বলেছে, তোমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করো।

◘ নবী রাসূলরা কখনো মানুষকে ঈমান আনতে বাধ্য করতেন না। তারা মনে করতেন দাওয়াতের বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। তবে তা গ্রহণ করার জন্য জোরজবরদস্তি করা যাবে না।

◘ পবিত্র কুরআনে বহুবার মানুষকে সৃষ্টিজগত সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করার আহ্বান জানানো হয়েছে। প্রাণের অস্তিত্ব দান ও তার মৃত্যুর ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর ক্ষমতার নিদর্শনস্থল হচ্ছে এই সৃষ্টিজগত।

◘ প্রকৃতিতে বিচরণ করে মহান আল্লাহর সৃষ্টির নিদর্শন প্রত্যক্ষ করার জন্য ইসলামে পর্যটনকে উৎসাহিত করা হয়েছে। আমরা যত বেশি আল্লাহর সৃষ্টি দেখব তত বেশি তাঁকে চিনতে পারব এবং এর ফলে আমাদের ঈমান তত বেশি দৃঢ় হবে।

◘ আল্লাহর অনুগ্রহ ও আজাব পাশাপাশি অবস্থান করে। সৎকর্মশীল ঈমানদার বান্দারা তাঁর অনুগ্রহের আশায় থাকে এবং মন্দ কর্মশীল ব্যক্তিদের জন্য অপেক্ষা করে কঠোর আজাব।

◘ মহান আল্লাহর অনুগ্রহের ভাণ্ডার অনেক বিশাল এবং যে কেউ তার ধারণক্ষমতা অনুযায়ী এখান থেকে দয়া লাভ করতে পারে। কিন্তু আল্লাহর নিদর্শন অস্বীকার করলে এবং তার আয়াত প্রত্যাখ্যান করলে এই অনুগ্রহ লাভের পথ বন্ধ হয়ে যায়।যারা কাফের একমাত্র তারাই আল্লাহর অসীম রহমতের ব্যাপারে হতাশ হয়।

কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২৪
প্রস্তুতি সহায়ক তাফসীর নোট পর্বঃ ১২

সূরা আনকাবুত ২৩-৩০ আয়াত

وَ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا بِاٰیٰتِ اللّٰهِ وَ لِقَآئِهٖۤ اُولٰٓئِکَ یَئِسُوۡا مِنۡ رَّحۡمَتِیۡ وَ اُولٰٓئِکَ لَهُمۡ عَذَابٌ اَلِیۡمٌ

২৩. আর যারা আল্লাহর নিদর্শন ও তাঁর সাক্ষাত অস্বীকার করে, তারাই আমার অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়েছে। আর তাদের জন্যই রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

পৃথিবীতে আল্লাহর রহমত ও করুণা সকল সৃষ্টির জন্য ব্যাপক। যার দ্বারা মু'মিন-কাফের, মুখলিস-মুনাফিক, (একনিষ্ঠ-নিষ্ঠাহীন), ভাল-মন্দ সকল শ্রেণীর মানুষই উপকৃত হয়ে থাকে। মহান আল্লাহ সকলকেই জীবন উপকরণ ও ধন-সম্পদ দিয়ে থাকেন। এটি আল্লাহর দয়ার সেই পরিব্যাপ্তি, যার সম্পর্কে তিনি বলেন,{وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ} অর্থাৎ, আমার দয়া প্রত্যেক বস্তুতে পরিব্যাপ্ত। কিন্তু পরকাল যেহেতু প্রতিদান ও প্রতিফল পাওয়ার জন্য; মানুষ দুনিয়াতে যে ফসল বপন করবে, সেই ফসল সে আখেরাতে কর্তন করবে। পৃথিবীতে যে যেমন কাজ করবে সেই অনুপাতে তাকে ফল দেওয়া হবে। সেদিন আল্লাহ পক্ষপাতহীন ফায়সালা দান করবেন। পৃথিবীর ন্যায় পরকালেও যদি মু'মিন-কাফের ও ভাল-মন্দের সাথে একই প্রকার ব্যবহার করা হয়, সবাই যদি আল্লাহর দয়ার যোগ্য হয়, তাহলে প্রথমতঃ আল্লাহর ন্যায় বিচারের উপর প্রশ্ন উঠবে এবং দ্বিতীয়তঃ কিয়ামতের উদ্দেশ্য অর্থহীন হয়ে পড়বে। মহান আল্লাহ কিয়ামত এই জন্যই অনুষ্ঠিত করবেন যে, যারা সৎকর্মশীল তাদেরকে সুখময় স্থান জান্নাত দান করবেন। আর যারা অসৎকর্মশীল তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক স্থান জাহান্নাম দান করবেন। সেই জন্য কিয়ামত দিবসে আল্লাহর রহমত একমাত্র মু'মিনদের জন্যই হবে। এখানেও উক্ত কথাই বর্ণনা করা হয়েছে যে, যারা পরকাল ও পুনর্জীবন অস্বীকার করবে, তাদের ভাগ্যে আমার রহমত জুটবে না। উক্ত কথাটি সূরা আ'রাফে এই ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে,{فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ} অর্থাৎ, সুতরাং আমি তা (দয়া পরকালে) তাদের জন্য নির্ধারিত করব, যারা পরহেযগার হয়, যাকাত দেয় ও আমার নিদর্শনসমূহে বিশ্বাস করে। (সূরা আ'রাফ ১৫৬ আয়াত)

فَمَا کَانَ جَوَابَ قَوۡمِهٖۤ اِلَّاۤ اَنۡ قَالُوا اقۡتُلُوۡهُ اَوۡ حَرِّقُوۡهُ فَاَنۡجٰىهُ اللّٰهُ مِنَ النَّارِ ؕ اِنَّ فِیۡ ذٰلِکَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوۡمٍ یُّؤۡمِنُوۡنَ

২৪. উত্তরে ইবরাহীমের সম্প্রদায় শুধু এটাই বলল, একে হত্যা কর অথবা অগ্নিদগ্ধ করা। অতঃপর আল্লাহ তাকে আগুন থেকে রক্ষা করলেন। নিশ্চয় এতে বহু নিদর্শন রয়েছে, এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা ঈমান আনে।

এখান থেকে বর্ণনা আবার ইবরাহীমের কাহিনীর দিকে মোড় নিচ্ছে।

হযরত ইবরাহীমের ন্যায়সঙ্গত যুক্তির কোন জবাব তাদের কাছে ছিল না। তাদের যদি কোন জবাব থেকে থাকে তাহলে তা এই ছিল যে, হক কথা বলছে যে কণ্ঠটি সেটি স্তব্ধ করে দাও এবং যে ব্যক্তি আমাদের ভুল আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরছে এবং তা থেকে আমাদের বিরত থাকতে বলছে তাকে জীবন্ত রেখো না। "হত্যা করো ও জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারো" শব্দাবলী থেকে একথা প্রকাশিত হচ্ছে যে, সমগ্র জনতা হযরত ইবরাহীমকে মেরে ফেলার ব্যাপারে একমত ছিল তবে মেরে ফেলার পদ্ধতির ব্যাপারে ছিল বিভিন্ন মত। কিছু লোকের মত ছিল,

তাকে হত্যা করা হোক। আবার কিছু লোকের মত ছিল, জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হোক, এর ফলে ভবিষ্যতে যারা এ ভূখণ্ডে হক কথা বলার পাগলামী করতে চাইবে এটা তাদের জন্য একটা শিক্ষা হয়ে থাকবে।

তারা শেষ পর্যন্ত হযরত ইবরাহীমকে পুড়িয়ে মারার সিদ্ধান্ত করেছিল। তাকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। এখানে শুধুমাত্র এতটুকু কথা বলা হয়েছে, মহান আল্লাহ তাকে আগুনের হাত থেকে রক্ষা করেন। কিন্তু সূরা আল আম্বিয়ায় পরিষ্কার করে বলা হয়েছেঃ আল্লাহর নির্দেশে আগুন হযরত ইবরাহীমের জন্য ঠাণ্ডা ও নিরাপদ বস্তু হয়ে যায়,قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ "আমি বললাম, হে আগুন! ঠাণ্ডা হয়ে যাও এবং শান্তি ও নিরাপত্তা হয়ে যাও ইবরাহীমের প্রতি।" (৬৯ আয়াত) একথা বলা নিষ্প্রয়োজন, তাকে যদি আগুনের মধ্যে নিক্ষেপই না করা হয়ে থাকতো তাহলে আগুনকে ঠাণ্ডা হয়ে যাও এবং তার প্রতি শান্তি ও নিরাপত্তা হয়ে যাও এ হুকুম দেবার কোন অর্থই হয় না। এ থেকে এ কথা পরিষ্কার প্রমাণিত হয় যে, সমস্ত বস্তুর ধর্ম বা প্রকৃতি মহান আল্লাহর হুকুমের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এবং তিনি যখনই চান যে কোন বস্তুর ধর্ম ও বিশেষত্ব পরিবর্তন করতে পারেন। সাধারণভাবে আগুনের ধর্ম হচ্ছে জ্বালানো এবং দগ্ধীভূত হবার মতো প্রত্যেকটি জিনিসকে পুড়িয়ে ফেলা। কিন্তু আগুনের এ ধর্ম তার নিজের প্রতিষ্ঠিত নয় বরং আল্লাহ প্রতিষ্ঠিত। তার এ ধর্ম আল্লাহকে এমনভাবে বেঁধে ফেলেনি যে, তিনি এর বিরুদ্ধে কোন হুকুম দিতে পারেন না। তিনি নিজে আগুনের মালিক। যে কোন সময় তিনি তাকে জ্বালাবার কাজ পরিত্যাগ করার হুকুম দিতে পারেন। যে কোন সময় নিজের এক ইঙ্গিতে তিনি অগ্নিকুণ্ডকে ফুল বাগানে পরিণত করতে পারেন। এ অস্বাভাবিক নিয়মের ব্যত্যয় তার রাজ্যে প্রতিদিন হয় না। কোন বড় রকমের তাৎপর্যবহ শিক্ষা ও প্রয়োজনের খাতিরেই হয়ে থাকে। কিন্তু নিয়মমাফিক যেসব জিনিস প্রতিদিন দেখতে আমরা অভ্যস্ত সেগুলোকে কোনক্রমেই এর স্বপক্ষে যুক্তি হিসেবে খাড়া করা যেতে পারে না যে, সেগুলোর মধ্যে তার শক্তি আবদ্ধ হয়ে গেছে এবং নিয়ম বিরোধী কোন ঘটনা আল্লাহর হুকুমেও সংঘটিত হতে পারে না।

তাছাড়া এতে আরও নিদর্শন রয়েছে আল্লাহর ক্ষমতা, তাঁর রাসূলদের সম্মান রক্ষা, তার ওয়াদার বাস্তবায়ণ, তাঁর শত্রুদের হেয়করণ। তাছাড়া আরও প্রমাণ রয়েছে যে, সমস্ত সৃষ্ট সে বড় কিংবা ছোট যাই হোক না কেন আল্লাহ্ তা'আলার কুদরতের অধীন। তাছাড়া এ ব্যাপারেও নির্দশন রয়েছে যে, তিনি আগুনের ভয়াবহ শাস্তি মেনে নিতে প্রস্তুত হয়ে যান এবং সত্য ও ন্যায়ের পথ পরিহার করতে প্রস্তুত হননি। নিদর্শন এ ব্যাপারেও রয়েছে যে, মহান আল্লাহ ইবরাহীম আলাইহিস সালামকেও পরীক্ষার পুল পার না করিয়ে ছাড়েননি। আবার এ ব্যাপারেও যে, ইবরাহীমকে আল্লাহ যে পরীক্ষার সম্মুখীন করেন তাতে তিনি সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হন, তবে এই আল্লাহর সাহায্য তার জন্য এমন অলৌকিক পদ্ধতিতে আসে যে, জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড তাঁর জন্য ঠাণ্ডা করে দেয়া হয়।

وَ قَالَ اِنَّمَا اتَّخَذۡتُمۡ مِّنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ اَوۡثَانًا ۙ مَّوَدَّةَ بَیۡنِکُمۡ فِی الۡحَیٰوۃِ الدُّنۡیَا ۚ ثُمَّ یَوۡمَ الۡقِیٰمَۃِ یَکۡفُرُ بَعۡضُکُمۡ بِبَعۡضٍ وَّ یَلۡعَنُ بَعۡضُکُمۡ بَعۡضًا ۫ وَّ مَاۡوٰىکُمُ النَّارُ وَ مَا لَکُمۡ مِّنۡ نّٰصِرِیۡنَ

২৫. ইবরাহীম আরও বললেন, তোমরা তো আল্লাহর পরিবর্তে মূর্তিগুলোকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছ, দুনিয়ার জীবনে তোমাদের পারস্পরিক বন্ধুত্বের খাতিরে। পরে কিয়ামতের দিন তোমরা একে অন্যকে অস্বীকার করবে এবং পরস্পর পরস্পরকে লা'নত দেবে। আর তোমাদের আবাস হবে জাহান্নাম এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না।

বক্তব্যের ধারাবাহিকতা থেকে বুঝা যায়, আগুনের মধ্য থেকে নিরাপদে বের হয়ে আসার পর ইবরাহীম আলাইহিস সালাম লোকদেরকে একথা বলেন।

তোমরা আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের পরিবর্তে মূর্তিপূজার ভিত্তিতে নিজেদের সামাজিক জীবন গড়ে তুলেছে। এ ব্যবস্থা দুনিয়ার জীবনের সীমানা পর্যন্ত তোমাদের জাতীয় সত্ত্বকে একত্র করে রাখতে পারে। কারণ এখানে সত্য-মিথ্যা নির্বিশেষে যে কোন আকীদার ভিত্তিতেই যে কোন ঐক্য ও সমাজ গড়ে উঠুক না কেন তা পারস্পরিক বন্ধুত্ব, আত্মীয়তা, ভ্রাতৃত্ব ও অন্যান্য সকল ধর্মীয়, সামাজিক, তামাদ্দুনিক, অর্থনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মাধ্যম হতে পারে। সেটাই কেবল তোমাদেরকে এ শির্কের উপর একত্রিত করে রেখেছে। [আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর]

মিথ্যা আকীদার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত তোমাদের এ সম্পর্ক আখেরাতে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না। সেখানে পারস্পরিক প্রীতি-ভালোবাসা, সহযোগিতা, আত্মীয়তা এবং আকীদা-বিশ্বাস ও কামনা-বাসনার কেবলমাত্র এমন ধরনের সম্পর্ক বজায় থাকতে পারে যা দুনিয়ায় এক আল্লাহর বন্দেগী এবং সৎকর্মশীলতা ও আল্লাহভীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। কুফার ও শির্ক এবং ভুল পথ ও কুপথের সাথে জড়িত যাবতীয় সম্পর্ক সেখানে ছিন্ন হয়ে যাবে। সকল ভালোবাসা শত্রুতায় পরিণত হবে। সমস্ত শ্রদ্ধা-ভক্তি ঘৃণায় রূপান্তরিত হবে। একে অন্যের ওপর লা'নত বর্ষণ করবে [ইবন কাসীর] এবং প্রত্যেকে নিজের গোমরাহীর দায়-দায়িত্ব অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে বলবে, এই যালেম আমাকে ধ্বংস করেছে, কাজেই একে দ্বিগুণ শাস্তি দেয়া হোক। একথা কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বলা হয়েছে। এক স্থানে বলা হয়েছেঃ "বন্ধুরা সেদিন পরস্পরের শত্রু হয়ে যাবে, মুত্তাকীরা ছাড়া।" [সূরা যুখরুফ: ৬৭]

অন্যত্র বলা হয়েছে, "প্রত্যেকটি দল যখন জাহান্নামে প্রবেশ করবে তখন তার কাছের দলের প্রতি লানত বর্ষণ করতে করতে প্রবেশ করবে, এমনকি শেষ পর্যন্ত যখন সবাই সেখানে একত্র হয়ে যাবে তখন প্রত্যেক পরবর্তী দল পূর্ববর্তী দলের বিরুদ্ধে বলবে: হে আমাদের রব! এ লোকেরাই আমাদের পথভ্রষ্ট করেছে, কাজেই এদেরকে দ্বিগুণ আগুনের শাস্তি দিন।" [সূরা আল-আ'রাফ: ৩৮] অন্যত্র বলা হয়েছে, "আর তারা বলবো, হে আমাদের রব! আমরা নিজেদের সরদারদের ও বড়দের আনুগত্য করেছি এবং তারা আমাদের বিপথগামী করেছে। হে আমাদের রব! আপনি তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দিন এবং তাদের ওপর বড় রকমের লানত বর্ষণ করুন।" [সূরা আল-আহযাব: ৬৭–৬৮]

فَاٰمَنَ لَهٗ لُوۡطٌ ۘ وَ قَالَ اِنِّیۡ مُهَاجِرٌ اِلٰی رَبِّیۡ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الۡعَزِیۡزُ الۡحَکِیۡمُ

২৬. অতঃপর লুত তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলেন। আর ইবরাহীম বললেন, আমি আমার রবের উদ্দেশ্যে হিজরত করছি। নিশ্চয় তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

লূত (আঃ) ইবরাহীম (আঃ)-এর ভাইপো (ভাতিজা) ছিলেন। তিনি ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রতি ঈমান আনেন এবং পরবর্তীতে তাঁকেও 'সাদূম' এলাকায় নবী হিসাবে প্রেরণ করা হয়।

ইবরাহীম আলাইহিস সালাম বললেন, আমি আমার পালনকর্তার উদ্দেশ্যে দেশ-ত্যাগ করছি। উদ্দেশ্য এই যে, এমন কোন জায়গায় যাব, যেখানে পালনকর্তার ইবাদাতে কোন বাধা নেই। ইবরাহীম নখায়ী ও কাতাদাহ বলেন, (إِنِّي مُهَاجِرٌ) ইবরাহীমের উক্তি। কেননা, এর পরবর্তী বাক্য (وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ) নিশ্চিতরূপে তারই অবস্থা। কোন কোন তফসীরকার (إِنِّي مُهَاجِرٌ) কে লুত আলাইহিস সালাম-এর উক্তি প্রতিপন্ন করেছেন। [ইবন

কাসীর; ফাতহুল কাদীর] কিন্তু পূর্বাপর বর্ণনাদৃষ্ট প্রথম তফসীরই উপযুক্ত। লুত আলাইহিস সালামও এই হিজরতে শরীক ছিলেন, কিন্তু ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর অধীন হওয়ার কারণে যেমন সারার কথা উল্লেখ করা হয়নি, তেমনি লুত আলাইহিস সালাম-এর হিজরতের কথাও স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয়নি।

وَ وَهَبۡنَا لَهٗۤ اِسۡحٰقَ وَ یَعۡقُوۡبَ وَ جَعَلۡنَا فِیۡ ذُرِّیَّتِهِ النُّبُوَّۃَ وَ الۡکِتٰبَ وَ اٰتَیۡنٰهُ اَجۡرَهٗ فِی الدُّنۡیَا ۚ وَ اِنَّهٗ فِی الۡاٰخِرَۃِ لَمِنَ الصّٰلِحِیۡنَ

২৭. আর আমরা ইবরাহীমকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকুব এবং তাঁর বংশধরদের জন্য স্থির করলাম নবুওয়ত ও কিতাব। আর আমরা তাকে তার প্রতিদান দুনিয়ায় দিয়েছিলাম; এবং আখিরাতেও তিনি নিশ্চয়ই সৎকর্মপরায়ণদের অন্যতম হবেন।

ইসহাক (আঃ) এর ঔরসে ইয়াকূব (আঃ)-এর জন্ম হয়। (ইয়াকূব (আঃ)-এর অপর নাম ছিল ইস্রাঈল।) যাঁর ঔরসে বানী ইস্রাঈল বংশের সূত্রপাত হয় এবং তাদের মধ্যেই সমস্ত নবী আগমন করেন ও আসমানী কিতাব অবতীর্ণ হয়। শেষ পর্যায়ে নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) ইবরাহীম (আঃ)-এর দ্বিতীয় পুত্র ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশে জন্মলাভ করে নবী হন এবং তাঁর উপর কুরআন অবতীর্ণ হয়।

আল্লাহ্ তা'আলা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর আত্মত্যাগ ও অন্যান্য সৎকর্মের প্রতিদান দুনিয়াতেও দান করেছেন। তাঁকে মানুষের প্রিয় ও নেতা করেছেন। যারাই ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দাওয়াতকে হেয় প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিল তারা সবাই দুনিয়ার বুক থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং এমনভাবে বিলুপ্ত হয়ে গেছে যে, আজ দুনিয়ার কোথাও তাদের কোন নাম নিশানাও নেই। কিন্তু যে ব্যক্তিকে আল্লাহর কালেমা বুলন্দ করার অপরাধে তারা জ্বলিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিতে চেয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত যাকে সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় স্বদেশভূমি ত্যাগ করতে হয়েছিল তাকে আল্লাহ এমন সফলতা দান করেন যে, দুনিয়াতে তাকে উত্তম স্বচ্ছন্দ রিযিক, প্রশস্ত আবাস, উত্তম নেককার স্ত্রী, সুপ্রশংসা প্রদান করা হয়েছে।

তাছাড়া চার হাজার বছর থেকে দুনিয়ার বুকে তার নাম সমুজ্জ্বল রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। দুনিয়ার সকল মুসলিম, নাসারা ও ইয়াহুদী রাব্বুল আলমীনের সেই খলীল তথা বন্ধুকে একযোগে নিজেদের নেতা বলে স্বীকার করে। একমাত্র সেই ব্যক্তি এবং তার সন্তানদের থেকেই তারা হিদায়াতের আলোকবর্তিকা লাভ করতে পেরেছে। আখেরাতে তিনি যে মহাপুরস্কার লাভ করবেন তাতো তার জন্য নির্ধারিত হয়েই আছে কিন্তু এ দুনিয়ায়ও তিনি যে মর্যাদা লাভ করেছেন তা দুনিয়ার বৈষয়িক স্বার্থ উদ্ধার প্রচেষ্টায় জীবনপাতকারীদের একজনও আজ পর্যন্ত লাভ করতে পারেনি। এ থেকে জানা গেল যে, কর্মের আসল প্রতিদান তো আখেরাতে পাওয়া যাবে, কিন্তু তার কিছু অংশ দুনিয়াতেও নগদ দেয়া হয়। অনেক নির্ভরযোগ্য হাদীসে অনেক সৎকর্মের পার্থিব উপকারিতা ও অসৎকর্মের পার্থিব অনিষ্ট বর্ণিত হয়েছে।

وَ لُوۡطًا اِذۡ قَالَ لِقَوۡمِهٖۤ اِنَّکُمۡ لَتَاۡتُوۡنَ الۡفَاحِشَۃَ ۫ مَا سَبَقَکُمۡ بِهَا مِنۡ اَحَدٍ مِّنَ الۡعٰلَمِیۡنَ

২৮. আর স্মরণ করুন লুতের কথা, যখন তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, নিশ্চয় তোমরা এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের আগে সৃষ্টিকুলের কেউ করেনি।

এখানে অশ্লীল কর্ম বলতে সমকামিতা (পুরুষে-পুরুষে যৌন-মিলন)-কে বুঝানো হয়েছে। পৃথিবীর ইতিহাসে লূত (আঃ)-এর জাতিই এ কাজ সর্বপ্রথম শুরু করেছিল; যেমন কুরআন তা স্পষ্ট করেছে।

اَئِنَّكُمۡ لَتَاۡتُوۡنَ الرِّجَالَ وَ تَقۡطَعُوۡنَ السَّبِیۡلَ ۬ۙ وَ تَاۡتُوۡنَ فِیۡ نَادِیۡكُمُ الۡمُنۡكَرَ ؕ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوۡمِهٖۤ اِلَّاۤ اَنۡ قَالُوا ائۡتِنَا بِعَذَابِ اللّٰهِ اِنۡ كُنۡتَ مِنَ الصّٰدِقِیۡنَ

২৯. তোমরাই তো পুরুষে উপগত হচ্ছ, তোমরাই তো রাহাজানি করে থাক এবং তোমরাই তো নিজেদের মজলিশে প্রকাশ্যে ঘৃণ্য কাজ করে থাক উত্তরে তার সম্প্রদায় শুধু এটাই বলল, আমাদের উপর আল্লাহ্‌র শাস্তি আনয়ন কর—তুমি যদি সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাক।

এখানে লুত আলাইহিস সালাম তার সম্প্রদায়ের বেশ কয়েকটি গুরুতর পাপের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথমত, পুংমৈথুন, যা এর পূর্বে আদম সন্তানদের আর কেউ করে নি। সাথে সাথে তারা আল্লাহর সাথে কুফরি করত এবং রাসূলদের প্রতি মিথ্যারোপ করত। দ্বিতীয়ত, রাহাজানি, অর্থাৎ পথে মানুষদেরকে আক্রমন করে তাদের হত্যা করত এবং সবকিছু নিয়ে নিত। আর তৃতীয়ত, তারা মজলিসে সবার সামনে এমন অপকর্ম করত, যা সম্পূর্ণ অশোভনীয় ছিল। তাদের একজন অন্যজনকে তা থেকে বাধা দিত না। কুরআন তৃতীয় পাপকাজটি নির্দিষ্ট করেনি। এ থেকে জানা যায় যে, যে কোন গুনাহ প্রকাশ্যে করাও একটি স্বতন্ত্র গোনাহ।

কোন কোন তফসীরকারক এ স্থলে সেসব গোনাহ একটি একটি করে উল্লেখ করেছেন, যেগুলো এই নির্লজেরা তাদের প্রকাশ্যে মজলিসে করত। উদাহরণত: পথিকদের গায়ে পাথর ছুড়ে মারা এবং তাদের প্রতি বিদ্রুপাত্মক ধ্বনি দেয়া। কেউ কেউ বলেন, তাদের প্রসিদ্ধ অশ্লীল কাজটি তারা গোপনে নয়, প্রকাশ্যেই মজলিসের সবার সামনে করত। কারও কারও মতে, তারা প্রকাশ্যে বড় শব্দ করে গুহ্যদেশ দিয়ে বাতাস বের করত। কারও কারও মতে, ছাগল ও মোরগ লড়াই চালিয়ে যেত। এই সবই তারা করত। আর তারা আরও কঠিন প্রকৃতির খারাপ কাজ করত। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] আয়াতে উল্লেখিত প্রথম গোনাহাটিই সর্বাধিক মারাত্মক। তাদের পূর্বে পৃথিবীতে কেউ এই অপকর্ম করত না। বনের পশুরাও এ থেকে বেঁচে থাকে। এটা যে এক গুরুতর অপরাধ, এ ব্যাপারে কারও দ্বিমত নেই।

قَالَ رَبِّ انۡصُرۡنِیۡ عَلَی الۡقَوۡمِ الۡمُفۡسِدِیۡنَ

৩০. তিনি বললেন, হে আমার রব! বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করুন।

কুফরী, হঠকারিতা এবং ঔদ্ধত্যপনা তাদের এতো বেড়ে গিয়েছিল যে, নবী (আঃ)-এর উপদেশের জবাবে তাঁকে তারা বলতোঃ “ছেড়ে দাও তোমার উপদেশবাণী। যদি তুমি সত্যবাদী হও তবে আমাদের উপর আল্লাহর শাস্তি আনয়ন কর।” শেষে অসহ্য হয়ে হযরত লুত (আঃ) আল্লাহর সামনে হাত বাড়িয়ে দিয়ে প্রার্থনা করেনঃ “হে আমার প্রতিপালক! বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করুন।”

ফুটনোট

◘ মুমিন ব্যক্তিরা সংখ্যায় কম হলেও অত্যাচারী ও জালিম শাসকের সামনে মাথানত করে না। ইব্রাহিম (আঃ) একা হওয়া সত্ত্বেও পথভ্রষ্ট ও কাফেরদের সামনে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন এবং এ কারণে মহান আল্লাহ তাঁকে সাহায্য করেন।

◘ পৃথিবীতে আল্লাহর দেয়া অন্যতম পুরস্কার হচ্ছে নেক সন্তান ও বংশধর। যা মহান আল্লাহ তার নেক বান্দাদেরকে দান করেন।

◘ একজন মানুষের পক্ষে দুনিয়া ও আখেরাত- দুই জীবনেই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে পুরস্কার পাওয়া সম্ভব। তবে ইসলামে আখেরাতের জীবনকে বাদ দিয়ে দুনিয়াপুজারি হতে যেমন নিষেধ করা হয়েছে তেমনি আখেরাতকে পেতে গিয়ে দুনিয়ার জীবনকে ধ্বংস করতেও নিরুৎসাহিত করা হয়েছে।

◘ লূত (আঃ) ইবরাহীম (আঃ)-এর ভাইপো (ভাতিজা) ছিলেন। তিনি ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রতি ঈমান আনেন এবং পরবর্তীতে তাঁকে 'সাদূম' এলাকায় নবী হিসাবে প্রেরণ করা হয়।

◘ আল্লাহর প্রেরিত নবী-রাসূলগণ কোনো নির্দিষ্ট দেশ ও জাতির গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নন। যখনই প্রয়োজন তখনই তারা হিজরত করে মাতৃভূমি ছেড়ে অন্য কোনো জনপদে চলে যান।

◘ লুত আলাইহিস সালাম তার সম্প্রদায়ের বেশ কয়েকটি গুরুতর পাপের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথমত, পুংমৈথুন, যা এর পূর্বে আদম সন্তানদের আর কেউ করে নি। দ্বিতীয়ত, রাহাজানি, অর্থাৎ পথে মানুষদেরকে আক্রমন করে তাদের হত্যা করত এবং সবকিছু নিয়ে নিত। আর তৃতীয়ত, তারা মজলিসে সবার সামনে এমন অপকর্ম করত, যা সম্পূর্ণ অশোভনীয় ছিল। তাদের একজন অন্যজনকে তা থেকে বাধা দিত না।

◘ কোন গুনাহ প্রকাশ্যে করাও একটি স্বতন্ত্র গোনাহ।

◘ সব ধর্মে সমকামিতাকে জঘন্য পাপাচার বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ইসলামি আইনে সমকামিতাকে সমাজে ফেতনা বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির সমতুল্য বলে মনে করা হয়। সমাজে এ ধরনের পাপাচার ছড়িয়ে পড়তে গেলে কঠোরভাবে তার মোকাবিলা করার পাশাপাশি পাপিষ্ঠ ব্যক্তিদের ওপর বিজয় অর্জনের জন্য আল্লাহর সাহায্য চাইতে হবে।

◘ লুত (আঃ) দোয়া করেছিলেন- رَبِّ انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ - হে আমার প্রতিপালক! দুষ্কার্যকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করো।

কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২৪
প্রস্তুতি সহায়ক তাফসীর নোট পর্বঃ ১৩

সূরা আনকাবুত ৩১-৪৪ আয়াত

وَ لَمَّا جَآءَتۡ رُسُلُنَاۤ اِبۡرٰهِیۡمَ بِالۡبُشۡرٰی ۙ قَالُوۡۤا اِنَّا مُهۡلِكُوۡۤا اَهۡلِ هٰذِهِ الۡقَرۡیَۃِ ۚ اِنَّ اَهۡلَهَا كَانُوۡا ظٰلِمِیۡنَ

৩১. আর যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ সুসংবাদসহ ইবরাহীমের কাছে আসল, তারা বলেছিল, নিশ্চয় আমরা এ জনপদবাসীকে ধ্বংস করব, এর অধিবাসীরা তো যালিম।

সূরা হূদ ও সূরা হিজরে এর যে বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে তা হচ্ছে এই যে, লূতের জাতির ওপর আযাব নাযিল করার জন্য যেসব ফেরেশতাকে পাঠানো হয়েছিল তারা প্রথমে হযরত ইবরাহীমের কাছে হাজির হন এবং তাকে হযরত ইসহাকের এবং তার পর হযরত ইয়াকূবের জন্মেও সুসংবাদ দেন তারপর বলেন, লূতের জাতিকে ধ্বংস করার জন্য আমাদের পাঠানো হয়েছে।

"এ জনপদ" বলে লূত জাতির সমগ্র এলাকাকে বুঝানো হয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আ) এ সময় ফিলিস্তিনের জাবরুন (বর্তমান আল খলীল) শহরে থাকতেন। এ শহরের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে কয়েক মাইল দূরে মরুসাগরে (dead Sea) অংশ রয়েছে। সেখানে পূর্বে বাস করতো লূত জাতির লোকেরা এবং বর্তমানে এ সমগ্র এলাকা রয়েছে সাগরের পানির তলায়। এ এলাকাটি নিম্নভূমির দিকে অবস্থিত এবং জাবরুনের উঁচু উঁচু পর্বতগুলো থেকে পরিষ্কার দেখা যায়। তাই ফেরেশতারা সেদিকে ইঙ্গিত করে হযরত ইবরাহীমকে বলেন, "আমরা এ জনপদটি ধ্বংস করে দেবো।"

قَالَ اِنَّ فِیۡهَا لُوۡطًا ؕ قَالُوۡا نَحۡنُ اَعۡلَمُ بِمَنۡ فِیۡهَا ۫٭۟ لَنُنَجِّیَنَّهٗ وَ اَهۡلَهٗۤ اِلَّا امۡرَاَتَهٗ ٭۫ كَانَتۡ مِنَ الۡغٰبِرِیۡنَ

৩২. ইবরাহীম বললেন, এ জনপদে তো লুত রয়েছে। তারা বলল, সেখানে কারা আছে, তা আমরা ভাল করে জানি, নিশ্চয় আমরা লূতকে ও তার পরিজনবর্গকে রক্ষা করব, তার স্ত্রীকে ছাড়া; সে তো পিছনে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

সূরা হূদে এ কাহিনীর প্রারম্ভিক অংশ এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, প্রথমে হযরত ইবরাহীম (আ) ফেরেশতাদেরকে মানুষের আকৃতিতে দেখে ভয় পেয়ে যান। কারণ এ আকৃতিতে ফেরেশতাদের আগমন কোন ভয়াবহ অভিযানের পূর্বাভাস দেয়। তারপর যখন তারা তাকে সুসংবাদ দান করেন এবং তার ভীতি দূর হয়ে যায় তখন তিনি বুঝতে পারেন যে, লূতের জাতি হচ্ছে এ অভিযানের লক্ষ। তাই সে জাতির জন্য তিনি করুণার আবেদন জানাতে থাকেনঃ

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ - إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ

“কিন্তু তার এ আবেদন গৃহীত হয়নি এবং বলা হয় এ ব্যাপারে এখন আর কিছু বলো না। তোমার রবের ফয়সালা হয়ে গেছে এ আযাবকে এখন আর ফেরানো যাবে না।”

يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ

এ জবাবের মাধ্যমে হযরত ইবরাহীম (আ) যখন বুঝতে পারেন লূত জাতির জন্য আর কোন অবকাশের আশা নেই তখনই তার মনে জাগে হযরত লূতের চিন্তা। তিনি যা বলেন তা এখানে উদ্ধৃত হয়েছে। তিনি বলেন “সেখানে তো লূত রয়েছে।” অর্থাৎ এ আযাব যদি লূতের উপস্থিতিতে নাযিল হয় তাহলে তিনিও তার পরিবারবর্গ তা থেকে কেমন করে নিরাপদ থাকবেন।

এ মহিলা সম্পর্কে সূরা তাহরীমের ১০ আয়াতে বলা হয়েছেঃ হযরত লূতের এই স্ত্রী তার প্রতি বিশ্বস্ত ছিল না। এ জন্য তার ব্যাপারে এ ফয়সালা করা হয় যে, একজন নবীর স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও তাকে আযাবের মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে। সম্ভবত হিজরত করার পর হযরত লূত জর্দান এলাকায় বসতি স্থাপন করে থাকবেন এবং তখনই তিনি এ জাতির মধ্যে বিয়ে করে থাকবেন। কিন্তু তার সাহচর্যে জীবনের একটি বিরাট অংশ পার করে দেবার পরও এ মহিলা ঈমান আনেনি এবং তার সকল সহানুভূতি ও আকর্ষণ নিজের জাতির ওপরই কেন্দ্রীভূত থাকে। যেহেতু আল্লাহর কাছে আত্মীয়তা ও রক্ত সম্পর্কেও কোন গুরুত্ব নেই, প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যাপারে ফয়সালা হয় তার ঈমান ও চরিত্রের ভিত্তিতে, তাই নবীর স্ত্রী হওয়ায় তার কোন লাভ হয়নি। তার পরিণাম তার স্বামীর অনুরূপ হয়নি বরং যে জাতির ধর্ম ও চরিত্র সে গ্রহণ করে রেখেছিল তার অনুরূপ হয়।

وَ لَمَّاۤ اَنۡ جَآءَتۡ رُسُلُنَا لُوۡطًا سِیۡٓءَ بِهِمۡ وَ ضَاقَ بِهِمۡ ذَرۡعًا وَّ قَالُوۡا لَا تَخَفۡ وَ لَا تَحۡزَنۡ ۟ اِنَّا مُنَجُّوۡکَ وَ اَهۡلَکَ اِلَّا امۡرَاَتَکَ کَانَتۡ مِنَ الۡغٰبِرِیۡنَ

৩৩. আর যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ লুতের কাছে আসল, তখন তাদের জন্য তিনি বিষন্ন হয়ে পড়লেন এবং নিজেকে তাদের রক্ষায় অসমর্থ মনে করলেন। আর তারা বলল, ভয় করবেন না, দুঃখও করবেন না; আমরা আপনাকে ও আপনার পরিজনবর্গকে রক্ষা করব, আপনার স্ত্রী ছাড়া; সে তো পিছনে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত;

سِيءَ بِهِم এর অর্থ তাঁর নিকট ফিরিশতা এলে তাঁদেরকে দেখে তাঁর খারাপ লাগল, (তিনি তাঁদের আগমনকে অপছন্দ করলেন, বিষণ্ণ ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলেন) এবং ভয় পেয়ে গেলেন। কারণ তাঁর নিকট যে সমস্ত ফিরিশতা (সুদর্শন কিশোর) মানুষের রূপ ধরে এসেছিলেন, তাঁদেরকে তিনি মানুষই ভেবেছিলেন। সুতরাং নিজ জাতির বদ অভ্যাস ও উদ্ধত আচরণের জন্য এই ভয় পেলেন যে, যদি তারা এই সকল সুদর্শন মেহমানদের আসার খবর জানতে পারে, তাহলে তারা বলপূর্বক এদের সাথে অশ্লীল কাজ করতে চাইবে, যার কারণে আমি অপমানিত হব। ضَاقَ بِهِم ذَرعًا (তাদের কারণে তার হৃদয় সঙ্কুচিত হয়ে গেল) কথায় তাঁর অক্ষমতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেমন ضَاقَت يَدُه (হাত সংকীর্ণ হওয়ার) কথা বলে দরিদ্র হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়। অর্থাৎ, ঐ সকল সুশ্রী চেহারাবিশিষ্ট মেহমানদেরকে বদ-অভ্যাসে অভ্যাসী জাতির হাত হতে বাঁচানোর যখন কোন রাস্তা খুঁজে পেলেন না, তখন তিনি চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হলেন।

ফিরিশতাগণ যখন লূত (আঃ)-এর বিষণ্ণ ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার কথা অনুভব করলেন, তখন তাঁরা তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন যে, তুমি কোন প্রকার ভয় ও চিন্তা করবে না। আমরা আল্লাহর প্রেরিত ফিরিশতা। আমাদের উদ্দেশ্য তোমার স্ত্রী ব্যতীত তোমাকে ও তোমার পরিবারকে পরিত্রাণ দেওয়া।

اِنَّا مُنۡزِلُوۡنَ عَلٰۤی اَهۡلِ هٰذِهِ الۡقَرۡیَۃِ رِجۡزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوۡا یَفۡسُقُوۡنَ

৩৪. নিশ্চয় আমরা এ জনপদবাসীদের উপর আকাশ হতে শাস্তি নাযিল করব, কারণ তারা পাপাচার করছিল।

আকাশের শাস্তি বলতে ঐ শাস্তিকে বুঝানো হয়েছে, যার দ্বারা লূত জাতিকে ধ্বংস করা হয়েছিল। জিব্রাঈল (আঃ) তাদের জনপদগুলোকে শূন্যে তুলে নিয়ে গিয়ে উল্টে দিলেন। তারপর তাদের উপর পাথর বর্ষণ করা হল এবং ঐ জায়গাটিকে একটি অতি দুর্গন্ধময় উপসাগরে পরিণত করা হল। [ইবনে কাসীর]

وَ لَقَدۡ تَّرَكۡنَا مِنۡهَاۤ اٰیَۃًۢ بَیِّنَۃً لِّقَوۡمٍ یَّعۡقِلُوۡنَ

৩৫. আর অবশ্যই আমরা এতে বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য একটি স্পষ্ট নিদর্শন রেখেছি।

এই সুস্পষ্ট নিদর্শনটি হচ্ছে মৃতসাগর। একে লুত সাগরও বলা হয়। কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে মক্কার কাফেরদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, এই যালেম জাতিটির ওপর তার কৃতকর্মের বদৌলতে যে আযাব নাযিল হয়েছিল তার একটি চিহ্ন আজো প্রকাশ্যে রাজপথে বর্তমান রয়েছে। তোমরা সিরিয়ার দিকে নিজেদের বাণিজ্য সফরে যাবার সময় দিনরাত এ চিহ্নটি দেখে থাকো। [দেখুন: সূরা আল-হিজর: ৭৫–৭৭; সূরা আস-সাফফাত: ১৩৭] বর্তমান যুগে এখানে পানির মধ্যে কিছু ডুবন্ত জনপদের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়।

وَ اِلٰی مَدۡیَنَ اَخَاهُمۡ شُعَیۡبًا ۙ فَقَالَ یٰقَوۡمِ اعۡبُدُوا اللّٰهَ وَ ارۡجُوا الۡیَوۡمَ الۡاٰخِرَ وَ لَا تَعۡثَوۡا فِی الۡاَرۡضِ مُفۡسِدِیۡنَ

৩৬. আর আমরা মাদইয়ানবাসীদের প্রতি তাদের ভাই শু'আইবকে পাঠিয়েছিলাম অতঃপর তিনি বলেছিলেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর, এবং শেষ দিনের আশা কর। আর যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়িও না।

তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর, এবং শেষ দিনের আশা কর - এর দু'টো অর্থ হতে পারে। একটি হচ্ছে, আখেরাতের আগমন কামনা করো। একথা মনে করো না, যা কিছু আছে ব্যস। এ দুনিয়ার জীবন পর্যন্তই এবং এরপর আর এমন কোন জীবন নেই, যেখানে তোমাদের নিজেদের যাবতীয় কাজ-কর্মের হিসেব দিতে হবে এবং তার পুরস্কার ও শাস্তি লাভ করতে হবে। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, এমন কাজ করো যার ফলে তোমরা আখেরাতে ভালো পরিণতি লাভের আশা করতে পারো। যেমন অন্য আয়াতে এসেছে, "তোমরা যারা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রত্যাশা কর অবশ্যই তাদের জন্য রয়েছে ওদের মধ্যে উত্তম আদর্শী।" [সূরা আল-মুমতাহিনাহ: ৬]

হযরত শুআইব (আঃ) মাদইয়ানে স্বীয় কওমকে আল্লাহর আযাব হতে ভয় প্রদর্শন করেন। তাদেরকে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার কথা বিশ্বাস করাতে গিয়ে তিনি বলেনঃ "ঐদিনের জন্যে তোমরা কিছু প্রস্তুতি গ্রহণ কর। ঐ দিনের খেয়াল। রেখে লোকদের উপর যুলুম ও অবিচার করা হতে বিরত থাকো। আল্লাহর যমীনে বিপর্যয়, বিশৃংখলা ও অশান্তি সৃষ্টি করো না। অন্যায় ও দুষ্কর্ম হতে দূরে থাকো।"

তাদের মধ্যে একটি দোষ এও ছিল যে, তারা মাপে ও ওজনে কম করতো, মানুষের হক তারা নষ্ট করে দিতো। তারা রাস্তা বন্ধ করে ফেলতো এবং সাথে সাথে তারা আল্লাহ ও তার রাসূল (আঃ)-এর সাথে কুফরী করতো।

فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ

৩৭. অতঃপর তারা তার প্রতি মিথ্যা আরোপ করল; ফলে তারা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হয়ে নিজ ঘরে নতজানু অবস্থায় শেষ হয়ে গেল।

তারা তাদের নবী (আঃ)-এর উপদেশের প্রতি কর্ণপাত করেনি। বরং তাকে তারা মিথ্যাবাদী বলে। এর ফলে তাদের উপর আল্লাহর শাস্তি নেমে আসে। কঠিন ভূমিকম্প শুরু হয় এবং সাথে সাথে এমন জোরে শব্দ হয় যে, প্রাণ উড়ে যায়। তারা নিজ নিজ গৃহে নতজানু অবস্থায় শেষ হয়ে যায়। তাদের পূর্ণ ঘটনা সূরায়ে আরাফ ও সূরায়ে শুআ'রাতে গত হয়েছে।

وَ عَادًا وَّ ثَمُوْدَاۡ وَ قَدْ تَّبَيَّنَ لَكُمْ مِّنْ مَّسٰكِنِهِمْ ۟ وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَ كَانُوْا مُسْتَبْصِرِيْنَ

৩৮. আর আমরা আদ ও সামূদকে ধ্বংস করেছিলাম; তাদের বাড়ীঘরের কিছু তোমাদের জন্য উন্মোচিত হয়েছে। আর শয়তান তাদের কাজকে তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল এবং তাদের সৎপথ অবলম্বনে বাধা দিয়েছিল, যদিও তারা ছিল বিচক্ষণ।

আরবের যেসব এলাকায় এ সব জাতির বসতি ছিল আরবের লোকেরা তা জানতো। দক্ষিণ আরবের যেসব এলাকা বর্তমানে আহকাফ, ইয়ামন ও হাদরামাউত নামে পরিচিত, প্রাচীনকালে সে এলাকাগুলোতে ছিল আদ জাতির বাস। হিজাযের দক্ষিণ অংশে রাবেগ থেকে আকাবাহ পর্যন্ত শু'আইব জাতির এবং মদীনার ওয়াদিউল কুরা থেকে তাইমা ও তাবুক পর্যন্ত সমগ্র এলাকা আজো সামূদ জাতির ধ্বংসাবশেষে পরিপূর্ণ দেখা যায়। কুরআন নাযিল হবার যুগে এ ধ্বংসাবশেষগুলোর অবস্থা বর্তমানের তুলনায় আরো কিছু বেশী সুস্পষ্ট থেকে থাকবে। [ইবন কাসীর]

مُسْتَبْصِر এর অর্থ বিচক্ষণ বা চক্ষুষ্মান। উদ্দেশ্য এই যে, যারা কুফর ও শির্ক করে আযাব ও ধ্বংসে পতিত হয়েছে, তারা মোটেই বেওকুফ অথবা উম্মাদ ছিল না। তারা দলীল-প্রমাণাদি থেকে সত্য গ্রহণ করতে সমর্থ ছিল, কিন্তু পার্থিব স্বার্থ তাদেরকে অস্বীকারে বাধ্য করে রেখেছিল। তারা ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে চিন্তে ও খোলা চোখে শয়তান যে পথ দেখিয়েছিল এবং যে পথে তারা বড়ই লাভ ও ভোগের সন্ধান পেয়েছিল সে পথে পাড়ি জমিয়েছিল এবং এমন পথ পরিহার করেছিল যা তাদের কাছে নীরস, বিস্বাদ এবং নৈতিক বিধি-নিষেধের বেড়াজালে আবদ্ধ হবার কারণে কষ্টকর মনে হচ্ছিল। অন্যত্র বলা হয়েছে: “তারা জাগতিক কাজ কর্ম খুব বোঝে; কিন্তু আখেরাতের ব্যাপারে উদাসীন।” [সূরা আর-রূম: ৭]

وَ قَارُوْنَ وَ فِرْعَوْنَ وَ هَامٰنَ ۟ وَ لَقَدْ جَآءَهُمْ مُّوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ فَاسْتَكْبَرُوْا فِى الْاَرْضِ وَ مَا كَانُوْا سٰبِقِيْنَ

৩৯. আর আমরা ধ্বংস করেছিলাম কারূন, ফির'আউন ও হামানকে। আর অবশ্যই মূসা তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ এসেছিল; অতঃপর তারা যমীনে অহংকার করেছিল; কিন্তু তারা আমার শাস্তি এড়াতে পারেনি।

কারূন ছিল একজন সম্পদশালী লোক, যার পরিপূর্ণ ধনভাণ্ডারের চাবি একদল শক্তিশালী লোককে উঠাতে হতো।

ফিরাউন ছিল মিসরের বাদশাহ্। আর হামান ছিল তার প্রধানমন্ত্রী। তার যুগেই হযরত মূসা (আঃ)-কে নবীরূপে তার নিকট প্রেরণ করা হয়। ফিরাউন ও হামান উভয়েই কিবতী কাফির। যখন তাদের ঔদ্ধত্য ও হঠকারিতা চরমে পৌছে, তারা আল্লাহর একত্ববাদকে অস্বীকার করে বসে, রাসূলদেরকে (আঃ) কষ্ট দেয় এবং তাদেরকে

অবিশ্বাস করে তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রত্যেককেই বিভিন্ন প্রকারের শাস্তি দিয়ে ধ্বংস করে দেন। আ'দ সম্প্রদায়ের উপর তিনি প্রবল ঝটিকা প্রেরণ করেন। তারা তাদের শক্তির বড়ই গর্ব করতো। কেউ তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে এটা তারা বিশ্বাসই করতো না। আল্লাহ তাআলা তাদের উপর প্রচণ্ড বায়ু প্রেরণ করেন, যা যমীন হতে পাথর উঠিয়ে উঠিয়ে তাদের উপর বর্ষণ করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ঐ বায়ু এমন প্রচণ্ড আকার ধারণ করে যে, তাদেরকে একেবারে আকাশে উঠিয়ে নিয়ে যায় এবং সেখান হতে উল্টো মুখে নীচে নিক্ষেপ করে। মাথার ভরে পড়ে তাদের মাথা দেহ হতে পৃথক হয়ে যায় এবং তাদের এমন অবস্থা হয় যে, যেন খেজুরের গাছ, যার কাণ্ড পৃথক হয়ে গেছে।

সামূদ সম্প্রদায়ের উপরও আল্লাহর হুজ্জত পূর্ণ হয়। তাদেরকে নিদর্শন দেয়া হয়। তাদের দাবী ও চাহিদামত পাথরের মধ্য থেকে তাদের চোখের সামনে উষ্ট্রী বের হয়ে আসে। কিন্তু তথাপি তাদের ভাগ্যে ঈমান আসেনি। বরং হঠকারিতায় তারা বাড়তেই থাকে। নবী হযরত সালেহ (আঃ)-কে ভয় প্রদর্শন করতে ও ধমক দিতে থাকে। ঈমানদারদেরকে তারা বলতে শুরু করেঃ "তোমরা আমাদের শহর ছেড়ে অন্যত্র চলে যাও, অন্যথায় আমরা তোমাদেরকে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করে ফেলবো।" ফলে তাদেরকে এক গুরুগম্ভীর শব্দ দ্বারা ধ্বংস করে দেয়া হয়।

কারূন ঔদ্ধত্য ও দাম্ভিকতা প্রকাশ করে। সে মহা-প্রতাপান্বিত আল্লাহর অবাধ্যাচরণ করতঃ ভূ-পৃষ্ঠে বিপর্যয় সৃষ্টি করে। যমীনে সে গর্বভরে চলতে থাকে এবং ধনের গর্বে গর্বিত হয় ও ফুলে ওঠে। সে ধরাকে সরা জ্ঞান করে বসে। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে তার দলবল ও প্রাসাদসহ ভূ-গর্ভে প্রোথিত করেন। আজ পর্যন্ত সে প্রোথিত হতেই আছে।

ফিরাউন, হামান এবং তাদের দলবলকে সকাল সকালই একই সাথে একই মুহূর্তে সমুদ্রে নিমজ্জিত করা হয়। তাদের মধ্যে এমন একজনও বাঁচেনি যে তাদের নাম নিতে পারে। আল্লাহ পাক এসব কিছু যে করেছিলেন তা তাদের প্রতি তাঁর যুলুম ছিল না। বরং তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুলুম করেছিল। এটা ছিল তাদের কৃতকর্মেরই ফল।

فَكُلًّا اَخَذْنَا بِذَنْۢبِهٖ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ۚ وَ مِنْهُمْ مَّنْ اَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ ۚ وَ مِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْاَرْضَ ۚ وَ مِنْهُمْ مَّنْ اَغْرَقْنَا ۚ وَ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَ لٰكِنْ كَانُوْۤا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ

৪০. সুতরাং তাদের প্রত্যেককেই আমরা তার অপরাধের জন্য পাকড়াও করেছিলাম। তাদের কারো উপর আমরা পাঠিয়েছিলাম পাথরকুচিসম্পন্ন প্রচণ্ড ঝটিকা তাদের কাউকে আঘাত করেছিল মহানাদ, কাউকে আমরা প্রোথিত করেছিলাম ভূগর্ভে এবং কাউকে আমরা করেছিলাম নিমজ্জিত। আর আল্লাহ এমন নন যে, তিনি তাদের প্রতি যুলুম করবেন; বরং তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুলুম করছিল।

এই বর্ণনা এখানে ক্রমপর্যায়ে দেয়া হয়েছে। প্রথমে অবিশ্বাসকারী উম্মতদের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। তারপর তাদের প্রত্যেককে বিভিন্ন আযাব দ্বারা ধ্বংস করে দেয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে।

কারো উপর আমরা পাঠিয়েছিলাম পাথরকুচিসম্পন্ন প্রচণ্ড ঝটিকা- এ ছিল আ'দ জাতি। যাদের উপর কঠিন ঝড় আযাবরূপে এসেছিল। এ ঝড় মাটি হতে কাঁকর উড়িয়ে তাদের উপর বর্ষণ করেছিল এবং তার বেগ ও গতি ছিল এত বেশি যে, তাদেরকে আকাশের উপর উড়িয়ে নিয়ে মাটিতে আছড়ে মেরেছিল। যার ফলে তাদের মাথা ও শরীর আলাদা আলাদা হয়ে গিয়েছিল। তাদেরকে দেখে মনে হয়েছিল, যেন সারশূন্য খেজুরের কান্ড। তাদের ওপর অবিরাম সাত রাত ও আট দিন পর্যন্ত ভয়াবহ তুফান চলতে থাকে। [সূরা আল-হাক্কাহ: ৭]

কাকেও আঘাত করল মহাগর্জন- এরা ছিল সালেহ (আঃ)-এর জাতি সামূদ। তাদেরকে তাদের কথামত পাহাড়ের এক পাথর থেকে একটি উটনী বের করে দেখানো হয়। কিন্তু অনাচারীর দল ঈমান আনার পরিবর্তে উটনীকেই মেরে ফেলে। যার তিনদিন পর তাদের উপর এক কঠিন বিকট শব্দের আযাব আসে; যা তাদেরকে চিরতরের জন্য চুপ করিয়ে দেয়।

কাউকে আমরা প্রোথিত করেছিলাম ভূগর্ভে- এ ছিল কারূন, যাকে ধন-দৌলতের ভান্ডার দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সে এই গর্বের শিকার হল যে, এই ধন-দৌলত এই কথার প্রমাণ যে, সে আল্লাহর নিকট সম্মানিত ও প্রিয়পাত্র। আমার মূসার কথা শোনার কি প্রয়োজন? অতঃপর তাকে তার ধন ও প্রাসাদসহ মাটিতে ধসিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

কাউকে আমরা করেছিলাম নিমজ্জিত- এ ছিল ফিরআউন, মিসর রাজ্যের অধিপতি। কিন্তু সীমালংঘন করে সে নিজে 'রব' হওয়ার কথা দাবী করে বসে। মূসা (আঃ)-এর উপর ঈমান আনতে ও তাঁর জাতি বানী ইস্রাঈল যাদেরকে সে দাসে পরিণত করেছিল, তাদেরকে মুক্ত করতে অস্বীকার করে। শেষ পর্যন্ত এক দিন সকালে লোহিত সাগরে তার ও তার পূর্ণ সেনাবাহিনীর সলিল সমাধি ঘটানো হয়।

তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুলুম করছিল- আল্লাহর কাজ কারো উপর অত্যাচার করা নয়। এই জন্য পূর্বের যে সকল জাতির উপর আযাব এসেছিল কেবলমাত্র এই জন্যই তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছে যে, তারা কুফর ও শিরক, মিথ্যাজ্ঞান ও পাপাচার করে নিজেরা নিজেদের উপরই অত্যাচার করেছিল।

এ পর্যন্ত যেসব বক্তব্য শুনানো হলো সেগুলোর বক্তব্যের লক্ষ্য ছিল দুটি। একদিকে এগুলো মু' মিনদেরকে শোনানো হয়েছে, যাতে তারা হিম্মতহারা, ভগ্ন হৃদয় ও হতাশ না হয়ে পড়ে এবং বিপদ ও সংকটের কঠিন আবর্তেও ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও দৃঢ়তা সহকারে সত্য ন্যায়ের ঝাণ্ডা উঁচু করে রাখে যে, শেষ পর্যন্ত তাঁর সাহায্য অবশ্যই এসে যাবে, তিনি জালেমদেরকে লাঞ্ছিত করবেন এবং সত্যের ঝাণ্ডা উঁচু করে দেবেন। অন্যদিকে এগুলো এমন জালেমদেরকে শুনানো হয়েছে যারা তাদের ধারণামতে ইসলামীকে সমূলে উচ্ছেদ করে দেবার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় নিয়োজিত ছিল। তাদেরকে সতর্ক দেয়া হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর সংযম ও সহিষ্ণুতার ভুল অর্থ গ্রহণ করছো। তোমরা আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বকে একটি অরাজক রাজত্ব মনে করছো। তোমাদের যদি এখন পর্যন্ত বিদ্রোহ, সীমালংঘন, জুলুম, নিপীড়ন ও অসৎকাজের জন্য পাকড়াও না করা হয়ে থাকে এবং সংশোধিত হবার জন্য অনুগ্রহ করে দীর্ঘ অবকাশ দেয়া হয়ে থাকে, তাহলে তোমরা নিজে নিজেই একথা মনে করে বসো না যে, এখানে আদতে কোন ইনসাফকারী শক্তিই নেই এবং এ ভূখণ্ডে লাগামহীনভাবে অনন্তকাল পর্যন্ত যা ইচ্ছে তাই করে যেতে পারবে। এ বিভ্রান্তি শেষ পর্যন্ত তোমাদেরকে এমন পরিণতির সম্মুখীন করবেই ইতিপূর্বে নূহের জাতি, লূতের জাতি ও শুআইবের জাতি যার সম্মুখীন হয়েছিল, আদ ও সামূদ জাতিকে যার মুখোমুখি হতে হয়েছিল এবং কারুন ও ফেরাউন যে পরিণতি স্বচক্ষে দেখে নিয়েছিল।

مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللهِ اَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ ۚۖ اِتَّخَذَتْ بَيْتًا ۗ وَ اِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ

৪১. যারা আল্লাহ ছাড়া বহু অভিভাবক গ্রহণ করে, তাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সার ন্যায়, যে ঘর বানায়। আর ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই তো দুর্বলতম, যদি তারা জানত।

মাকড়সাকে "আনকাবূত" বলা হয়। এখানে সে মাকড়সা বোঝানো হয়েছে, যে জাল তৈরী করে এবং তাতে ঝুলতে থাকে। এই জালের সাহায্যে সে মশা-মাছি শিকার করে। বলাবাহুল্য, জন্তু জানোয়ারের যত প্রকার বাসা

ও ঘর বিদিত আছে, তন্মধ্যে মাকড়সার জাল দুর্বলতর। যা সামান্য বাতাসেও ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করে এবং অন্যের উপর ভরসা করে, তাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সার জাল, যা অত্যন্ত দুর্বল।

এমনিভাবে যারা কোন প্রতিমা অথবা কোন মানুষের উপর ভরসা করে, তাদের ভরসা এমন, যেমন মাকড়সা তার জলের উপর ভরসা করে। বিশ্ব-জাহানের প্রকৃত মালিককে বাদ দিয়ে যারা একেবারে অক্ষম বান্দা ও সম্পূর্ণ কাল্পনিক উপাস্যদের ওপর নির্ভর করে যেমন আঙ্গুলের সামান্য একটি টোকাও বরদাশত করতে পারে না, তেমনি তোমাদের আশার অট্টালিকাও আল্লাহর ব্যবস্থার সাথে প্রথম সংঘাতেই চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে। সামান্য বৃষ্টিও যার সবকিছু বিনষ্ট করে দেয়, তোমাদের সামান্যতম উপকারও তারা করতে পারে না [ফাতহুল কাদীর]

সুতরাং সত্য কেবল এই যে, একমাত্র রব্বুল আলামীন ছাড়া আর কারও উপর নির্ভর করা যায় না। আল্লাহ বলেনঃ "যে ব্যক্তি তাগুতকে (আল্লাহ বিরোধী শক্তিকে) অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে সে এমন মজবুত নির্ভরকে আঁকড়ে ধরেছে যা কখনো ছিন্ন হবার নয়। বস্তুত আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও জানেন।" [সূরা আল-বাকারাহ: ২৫৬]

ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই তো দুর্বলতম, যদি তারা জানত- এর দুটি অর্থ হয়। এক. যদি তারা জানত যে তাদের মা'বুদগুলো মাকড়শার জালের মত, তবে এ ধরনের মা'বুদের পিছনে কখনও থাকত না। দুই. যদি তাদের কোন জ্ঞান থাকত, তবে তারা জানত যে, আল্লাহ তাদের মা'বুদদের অবস্থা খুব ভাল করেই জানেন।

اِنَّ اللّٰهَ يَعۡلَمُ مَا يَدۡعُوۡنَ مِنۡ دُوۡنِهٖ مِنۡ شَىۡءٍ ؕ وَ هُوَ الۡعَزِيۡزُ الۡحَكِيۡمُ

৪২. তারা আল্লাহ ছাড়া যা কিছুকে ডাকে, আল্লাহ তো তা জানেন। আর তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

যেসব জিনিসকে এরা মা'বুদে পরিণত করেছে এবং যাদেরকে সাহায্যের জন্য আহবান করে, তাদের প্রকৃত স্বরূপ আল্লাহ ভালোভাবেই জানেন। তাদের কোন ক্ষমতাই নেই। একমাত্র আল্লাহই ক্ষমতার মালিক এবং তাঁরই বিচক্ষণ কর্মকুশলতা ও জ্ঞান এ বিশ্ব-জাহানের ব্যবস্থা পরিচালনা করছে। এ আয়াতের আর একটি অনুবাদ এও হতে পারে, আল্লাহ খুব ভালোভাবেই জানেন, তাঁকে বাদ দিয়ে এরা যাদেরকে ডাকে তারা কিছুই নয় (অর্থাৎ ভিত্তিহীন ও ক্ষমতাহীন) এবং একমাত্র তিনিই পরাক্রান্ত ও জ্ঞানের অধিকারী। সুতরাং অচিরেই তিনি তাদেরকে তাদের কর্মকাণ্ডের শাস্তি দিবেন।

وَ تِلۡكَ الۡاَمۡثَالُ نَضۡرِبُهَا لِلنَّاسِ ۚ وَ مَا يَعۡقِلُهَاۤ اِلَّا الۡعٰلِمُوۡنَ

৪৩. আর এ সকল দৃষ্টান্ত আমরা মানুষের জন্য দেই; কিন্তু শুধু জ্ঞানী ব্যক্তিরাই এটা বুঝে।

মাকড়সার জাল দ্বারা মুশরিকদের উপাস্যদের দৃষ্টান্ত দেয়ার পর এখন বলা হয়েছে যে, আমি সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত দ্বারা তাওহীদের স্বরূপ বর্ণনা করি; কিন্তু এসব দৃষ্টান্ত থেকেও কেবল আলেমগণই জ্ঞান আহরণ করে। অন্যরা চিন্তা-ভাবনাই করে না। ফলে সত্য তাদের সামনে ফোটে না। মূলতঃ কুরআন ও হাদীসের কিছু শব্দ বুঝে নিলে কেউ আল্লাহর কাছে আলেম হয় না, যে পর্যন্ত কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনার অভ্যাস গড়ে না তোলে এবং যে পর্যন্ত সে কুরআন অনুযায়ী আমল না করে। আমর ইবন আস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছ থেকে এক হাজার দৃষ্টান্ত শিক্ষা করেছি। [মুসনাদে আহমাদ: ৪/২০৩]

এটা নিঃসন্দেহে আমর ইবন আস রাদিয়াল্লাহু আনহুর একটি বিরাট শ্রেষ্ঠত্ব। কেননা, আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে তাদেরকেই আলেম বলেছেন, যারা আল্লাহ ও রাসূল বর্ণিত দৃষ্টান্তসমূহ বোঝে। আমর ইবনে মুররা বলেন, আমি যখন এমন কোন আয়াতে পৌছি, যা আমার বোধগম্য নয়, তখন মনে খুব দুঃখ পাই। কেননা, আল্লাহ বলেনঃ “এ সকল উদাহরণ আমি মানুষের জন্য দেই, কিন্তু জ্ঞানীরাই তা বোঝে”। [ইবন কাসীর]

خَلَقَ اللهُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ بِالْحَقِّ ؕ اِنَّ فِیْ ذٰلِکَ لَاٰیَۃً لِّلْمُؤْمِنِیْنَ

৪৪. আল্লাহ্ যথাযথভাবে আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন; এতে তো অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে মুমিনদের জন্য।

বিশ্ব-জাহানের এ ব্যবস্থা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত, মিথ্যার ওপর নয়। পরিষ্কার মন-মানসিকতা নিয়ে যে ব্যক্তিই এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে তার কাছে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে যাবে যে, এ পৃথিবী ও আকাশ ধারণা কল্পনার ওপর নয় বরং প্রকৃত সত্য ও বাস্তব ঘটনার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। প্রত্যেক ব্যক্তি যা কিছু বুঝবে ও উপলব্ধি করবে এবং নিজের ধারণা ও কল্পনার ভিত্তিতে যে দর্শনই তৈরি করবে তা যে এখানে যথাযথভাবে খাপ খেয়ে যাবে, তার কোন সম্ভাবনা নেই। এখানে তো একমাত্র এমন জিনিসই সফলকাম হতে এবং স্থিরতা ও প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে, যা হয় প্রকৃত সত্য ও বাস্তব ঘটনার সাথে সামঞ্জস্যশীল। বাস্তব ঘটনা বিরোধী ধারণা ও অনুমানের ভিত্তিতে যে ইমারতই দাঁড় করানো হবে তা শেষ পর্যন্ত প্রকৃত সত্যের সাথে সংঘাত বাধিয়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। বিশ্ব-জাহানের এ ব্যবস্থা পরিষ্কার সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, এক আল্লাহ হচ্ছেন এর স্রষ্টা, এক আল্লাহই এর মালিক ও পরিচালক। এ বাস্তব বিষয়টির বিরুদ্ধে যদি কোন ব্যক্তি এ ধারণা নিয়ে কাজ করতে থাকে যে, এ দুনিয়ার কোন আল্লাহ নেই অথবা এ ধারণা করে চলতে থাকে যে, এর বহু খোদা আছে, যারা মানত ও নজরানার জিনিস খেয়ে নিজেদের ভক্ত-অনুরক্তদের এখানে সবকিছু করার স্বাধীনতা এবং নিশ্চিন্তে নিরাপদে থাকার নিশ্চয়তা দিয়ে দেয়, তাহলে তার এ ধারণার কারণে প্রকৃত সত্যের মধ্যে সামান্যতম পরিবর্তন ঘটবে না বরং সে নিজেই যে কোন সময় একটি বিরাট আঘাতের সম্মুখীন হবে।

পৃথিবী ও আকাশের সৃষ্টির মধ্যে তাওহীদের সত্যতা এবং শিরক ও নাস্তিক্যবাদের মিথ্যা হবার ওপর একটি পরিষ্কার সাক্ষ্য-প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু এ সাক্ষ্য প্রমাণের সন্ধান একমাত্র তারাই পায় যারা নবীগণের শিক্ষা মেনে নেয়। নবীগণের শিক্ষা অস্বীকারকারীরা সবকিছু দেখার পরও কিছুই দেখে না।

ফুটনোট

◘ ফেরেশতাদের মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর প্রেরিত নবীদের কাছে সুসংবাদ পাঠান এবং কোনো জনপদে শাস্তি দিতেও তিনি ফেরেশতাদের ব্যবহার করেন।

◘ হযরত ইবরাহীম (আ) এ সময় ফিলিস্তিনের জাবরুন (বর্তমান আল খলীল) শহরে থাকতেন।

◘ আকাশের শাস্তি বলতে ঐ শাস্তিকে বুঝানো হয়েছে, যার দ্বারা লূত জাতিকে ধ্বংস করা হয়েছিল। জিব্রাঈল (আঃ) তাদের জনপদগুলোকে শূন্যে তুলে নিয়ে গিয়ে উল্টে দিলেন। তারপর তাদের উপর পাথর বর্ষণ করা হল এবং ঐ জায়গাটিকে একটি অতি দুর্গন্ধময় উপসাগরে পরিণত করা হল। এটি হলো মৃতসাগর। একে লুত সাগরও বলা হয়।

◘ যৌন লালসা চরিতার্থ করার ক্ষেত্রে প্রকৃতি বিরোধী পথ অবলম্বনকে ইসলামে জুলুম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই জুলুম করা হয় নিজের, পরিবার ও সমাজের বিরুদ্ধে।

◘ লুত (আঃ)-এর স্ত্রী কাফেরদের দলে যোগ দিয়েছিল; পক্ষান্তরে তার সন্তানরা ছিল মুত্তাকিদের অন্তর্ভূক্ত।

◘ শুধুমাত্র পুন্যবান ব্যক্তিদের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক ইহকালীন ও পারলৌকিক মুক্তির জন্য যথেষ্ট নয়। অনেক সময় লুত (আঃ)'র স্ত্রীর মতো আল্লাহর নবীদের স্ত্রীরাও জাহান্নামে যাবে এবং ফেরাউনের মতো জালেম শাসকদের স্ত্রীরাও জান্নাতবাসী হয়ে যেতে পারে।

◘ শুয়াইব (আঃ)-কে প্রেরণ করা হয়েছে মাদায়েনবাসীর প্রতি। আহলে মাদইয়ান-কে পবিত্র কুরআনে কোথাও কোথাও 'আছহাবুল আইকাহ' (اصحاب الأيكة) বলা হয়েছে। যার অর্থ 'জঙ্গলের বাসিন্দাগণ'। 'মাদইয়ান' হল লূত সাগরের নিকটবর্তী সিরিয়া ও হিজাযের সীমান্তবর্তী একটি জনপদের নাম।

◘ শুধুমাত্র পাপকাজের জন্য মহান আল্লাহ কোনো জাতিকে ধ্বংস করেননি। তবে উপদেশবাণী পাওয়ার পরও যারা গোনাহর কাজ ত্যাগ করেনি এবং আল্লাহর বিরোধিতা করেছে তারাই আজাবের শিকার হয়েছে।

◘ শয়তানের কাজই হলো খারাপ ও কুৎসিত বিষয়গুলোকে মানুষের চোখে চমৎকার করে তুলে ধরা। মানুষের প্রবৃত্তি এবং বিবেক যে বিষয়গুলোকে অত্যন্ত খারাপ বলে মনে করে, শয়তান নানা ধরনের প্রতারণা ও কৌশল প্রয়োগ করে সে বিষয়গুলোকে সুন্দর ও মনোরম করে মানুষের সামনে তুলে ধরে।

◘ আল্লাহর গযবে ধ্বংসপ্রাপ্ত পৃথিবীর আদি ৬টি জাতির হলো- কওমে নূহ, 'আদ, সামূদ, কওমে লূত, কওমে মাদইয়ান এবং কওমে ফেরাউন।

◘ পবিত্র কুরআন মানুষকে সহজে হেদায়েতের বাণী বোঝানোর জন্য নানা উপমা তুলে ধরে। আর সকল যুগের, সকল স্থানের ও সব শ্রেণির মানুষের জন্য বোধগম্য উপমাই হচ্ছে সেরা দৃষ্টান্ত। পবিত্র কুরআনে ব্যবহৃত উপমাগুলো অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও গভীর অর্থবোধক এবং বিজ্ঞ ও সচেতন ব্যক্তিরাই কেবল এর গভীরতা উপলব্ধি করতে পারে।

◘ মাকড়সার বাসার মতো কাঠামোবিহীন দুর্বল জিনিসের প্রতি ভরসা না করে এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে যিনি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।

◘ সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও লক্ষ্য নিয়ে এই বিশ্বজগত সৃষ্টি করা হয়েছে। কোনো দুর্ঘটনার মাধ্যমে এটি সৃষ্টি হয়নি। কাফের ও মুশরিকদের পক্ষে সৃষ্টির রহস্য উপলব্ধি করা সহজ নয়। কিন্তু ঈমানদার ব্যক্তি যেকোনো সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহকে খোঁজে; ফলে তার পক্ষে আল্লাহকে উপলব্ধি করা সহজ হয়ে যায়।

কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২৪
প্রস্তুতি সহায়ক তাফসীর নোট পর্বঃ ১৪

সূরা হাদীদ ১-১০ আয়াত

সূরা আল-হাদীদ কুরআনের ৫৭ তম সূরা, এর আয়াত ২৯ এবং রূকু সংখ্যা ৪। সূরা আল-হাদীদ মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। হাদীদ অর্থ লোহা।

নামকরণ

সূরার ২৫ আয়াতের وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ বাক্যাংশ থেকে নাম গৃহীত হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

সর্ব সম্মত মতে এটি মদীনায় অবতীর্ণ সূরা। এ সূরার বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে মনে হয় সম্ভবত উহুদ যুদ্ধ ও হুদায়বিয়ার সন্ধির মধ্যবর্তী কোন এক সময় এ সূরা নাযিল হয়েছে। এটা সে সময়ের কথা যখন কাফেররা চারদিক থেকে ক্ষুদ্র এ ইসলামী রাষ্ট্রটিকে তাদের আক্রমণের লক্ষ্যস্থল বানিয়েছিল এবং ঈমানদারদের ক্ষুদ্র একটি দল অত্যন্ত সহায় সম্বলহীন অবস্থায় সমগ্র আরবের শক্তির মোকাবিলা করে যাচ্ছিলেন। এ পরিস্থিতিতে ইসলাম তার অনুসারীদের কাছে শুধু জীবনের কুরবানীই চাচ্ছিলো না বরং সম্পদের কুরবানীর প্রয়োজনীয়তাও একান্তভাবে উপলব্ধি করেছিলো। এ ধরনের কুরবানী পেশ করার জন্য এ সূরায় অত্যন্ত জোরালো আবেদন জানানো হয়েছে। সূরার ১০ আয়াত এ অনুমানকে আরো জোরালো করছে। এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদের দলকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, যারা বিজয়ের পরে নিজেদের অর্থ সম্পদ খরচ করবে এবং আল্লাহর পথে লড়াই করবে তারা কখনো ঐসব লোকদের সমমর্যাদা সম্পন্ন হতে পারবে না যারা বিজয় লাভের পূর্বে জান ও মালের কুরবানী পেশ করবে। ইবনে মারদুইয়া কর্তৃক উদ্ধৃত হযরত আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীস একথাই সমর্থন করে। তিনি أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন: কুরআন নাযিলের শুরু থেকে ১৭ বছর পর ঈমানদারদের আলোড়নকারী এ আয়াতটি নাযিল হয়। এ হিসেব অনুসারে ৪র্থ ও পঞ্চম হিজরী সনের মধ্যবর্তী সময়ই এ সূরার নাযিল হওয়ার সময়-কাল বলে নির্ধারিত হয়।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এ সূরার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে আল্লাহর পথে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করার উপদেশ দান। যখন আরব জাহেলিয়াতের সাথে ইসলামের সিদ্ধান্তকর সংগ্রাম চলছিলো, ইসলামের ইতিহাসের সে সংকটকালে মুসলমানদেরকে বিশেষভাবে আর্থিক কুরবানীর জন্য প্রস্তুত করা এবং ঈমান যে শুধু মৌখিক স্বীকৃতি ও বাহ্যিক কিছু কাজকর্মের নাম নয় বরং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের জন্য একনিষ্ঠ হওয়াই তার মূল চেতনা ও প্রেরণা, একথা তাদের মনে বদ্ধমূল করে দেয়ার উদ্দেশ্যেই এ সূরা নাযিল করা হয়েছিল। যে ব্যক্তির মধ্যে এ চেতনা ও প্রেরণা অনুপস্থিত এবং আল্লাহ ও তাঁর দ্বীনের মোকাবিলায় নিজের প্রাণ, সম্পদ ও স্বার্থকে অধিকতর ভালবাসে তার ঈমানের দাবি অন্তসার শুন্য। আল্লাহর কাছে এ ধরনের ঈমানের কোন মূল্য ও মর্যাদা নেই।

এ উদ্দেশ্যে সর্ব প্রথম আল্লাহ তা'আলার গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে যাতে শ্রোতারা ভালভাবে উপলবদ্ধি করতে পারে যে, কোন মহান সত্তার পক্ষ থেকে তাঁকে সম্বোধন করা হচ্ছে। তারপর নিম্নের বিষয়গুলো ধারাবাহিকভাব পেশ করা হয়েছে।

ঈমানের অনিবার্য দাবী হচ্ছে, ব্যক্তি যেন আল্লাহর পথে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করতে গড়িমসি ও টালবাহানা না করে। এ ধরনের কাজ শুধু ঈমানের পরিপন্থীই নয়, বাস্তবতার বিচারেও ভুল। কেননা, এসব অর্থ-সম্পদ মূলত আল্লাহ তা'আলারই অর্থ-সম্পদ। তোমাদেরকে খলিফা হিসেবে তা ব্যবহার করার ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে। এ অর্থ-সম্পদই কাল অন্যদের হাতে ছিল, আজ তোমাদের হাতে আছে এবং ভবিষ্যতে অন্য কারো হাতে চলে যাবে। শেষ মেশ তা বিশ্ব-জাহানের প্রতিটি জিনিসের মালিক আল্লাহর কাছেই থেকে যাবে। এ সম্পদের কোন অংশ তোমাদের কাজে লাগলে কেবল সেই অংশই লাগতে পারে যা তোমাদের অধিকারে থাকা কালে তোমরা আল্লাহর কাজে ব্যয় করবে।

আল্লাহর পথে জান ও মালের কুরবানী পেশ করা যদিও সর্বাবস্থায়ই সম্মানজনক কাজ। কিন্তু এসব ত্যাগ ও কুরবানীর মূল্য ও মর্যাদা অবস্থার নাজুকতা দিয়ে নিরূপিত হয়। এমন সময়ও আসে যখন কুফরী শক্তি অত্যন্ত প্রবল হয়ে ওঠে এবং সর্বক্ষণ এমন একটা আশংকা বিদ্যমান থাকে যে, কুফরীর সাথে সংঘাতে ইসলাম হয়তো পরাভূত হয়ে পড়বে। আবার এমন একটা সময়ও আসে যখন কুফর ও ইসলামের দ্বন্দে শক্তির ভারসাম্য ইসলামের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং ন্যায় ও সত্যের দুশমনের মোকাবেলায় ঈমানের অনুসারীরা বিজয়লাভ করতে থাকে। গুরুত্বের দিক দিয়ে এ দু'টি পরিস্থিতি সমান নয়। তাই এ ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে যে ত্যাগ ও কুরবানী পেশ করা হয় মূল্যের দিক দিয়ে তাও সমান নয়। ইসলাম যখন দুর্বল তখন তাকে সমুন্নত ও বিজয়ী করার জন্য যারা প্রাণপণ চেষ্টা সাধনা ও অর্থ সম্পদ অকাতরে ব্যয় করবে তারা তাদের সমমর্যাদা লাভ করতে পারবে না।

ন্যায় ও সত্যের পথে যতটা সম্পদ ব্যয় করা হবে আল্লাহর কাছে তা ঋণ হিসেবে গণ্য হবে। আর আল্লাহ ঐ সম্পদকে কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে ফেরত দেবেন শুধু তাই নয় নিজের পক্ষ থেকে অতিরিক্ত পুরস্কারও দান করবেন।

আখেরাতে সেসব ঈমানদার কেবল নূর লাভ করবে যারা আল্লাহর পথে তাদের অর্থ-সম্পদ ব্যয় করেছে। মুনাফিকরা যারা দুনিয়াতে নিজেদের স্বার্থই কেবল রক্ষা করেছে এবং ন্যায় ও সত্য বিজয়ী হচ্ছে, না বাতিল বিজয়ী হচ্ছে তার কোন পরোয়াই করেনি। দুনিয়ার এ জীবনে তারা ঈমানদারদের সাথেই মিলে মিশে থাকলেও আখেরাতে তাদেরকে ঈমানদারদের থেকে আলাদা করে দেয়া হবে। তারা 'নূর' থেকে বঞ্চিত হবে এবং কাফেরদের সাথে তাদের হাশর হবে।

যেসব আহলে কিতাবের গোটা জীবন দুনিয়া পূজায় অতিবাহিত হয়েছে এবং যাদের মন দীর্ঘদিনের গাফলতি ও অমনোযোগিতার কারণে পাথরের ন্যায় কঠোর হয়ে গিয়েছে মুসলমানদের তাদের মত হয়ে যাওয়া ঠিক নয়। সে কেমন ঈমানদার আল্লাহর কথা শুনে যার হৃদয়-মন বিগলিত হয় না এবং তাঁর নাযিলকৃত সত্য বিধানের সামনে মাথা নত করে না।

কেবল সেই সব ঈমানদারই আল্লাহর নিকট 'সিদ্দিক' ও শহীদ বলে গণ্য যারা কোন রকম প্রদর্শনীর মনোভাব ছাড়াই একান্ত আন্তরিকতা ও সততার সাথে নিজেদের অর্থ-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে।

দুনিয়ার জীবন মাত্র কয়েক দিনের চাকচিক্য এবং ধোকার উপকরণ। এখানকার খেল তামাসা, এখানকার আনন্দ ও আকর্ষণ, এখানকার সৌন্দর্য ও সাজ-সজ্জা, এখানকার শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে গর্ব ও অহংকার এবং এখানকার ধন-সম্পদ ও ঐশ্বর্যের ব্যাপারে একে অপরকে অতিক্রম করার চেষ্টা সাধনা সব কিছুই অস্থায়ী। এর উপমা দেয়া যায়

সেই শস্য ক্ষেত্রের সাথে যা প্রথম পর্যায়ে সবুজ ও সতেজ হয়ে ওঠে। তারপর বিবর্ণ হয়ে তামাটে বর্ণ ধারণ করে এবং সর্বশেষ ভূষিতে পরিণত হয়। প্রকৃতপক্ষে আখেরাতের জীবন হচ্ছে স্থায়ী জীবন যেখানে সব কাজের বড় বড় ফলাফল পাওয়া যাবে। তোমাদের যদি প্রতিযোগিতামূলকভাবে কিছু করতে হয় তাহলে জান্নাতের দিকে দ্রুত অগ্রসর হওয়ার জন্য চেষ্টা করো। পৃথিবীতে আরাম-আয়েশ ও বিপদ-আপদ যাই আসে তা আল্লাহ তা'আলার পূর্ব লিখিত সিদ্ধান্ত অনুসারেই আসে। একজন ঈমানদারের ভূমিকা হওয়া উচিত বিপদ-আপদ আসলে সাহস না হারানো এবং আরাম-আয়েশ ও সুখ-শান্তি আসলে গর্ব প্রকাশ না করা। একজন মুনাফিক বা কাফেরের আচরণ হচ্ছে আল্লাহ যদি তাকে নিয়ামত দান করেন তাহলে সে গর্বে মেতে উঠে, অহংকার প্রকাশ করতে থাকে এবং নিয়ামত দাতা আল্লাহর কাজে ব্যয় করতে নিজেও সংকীর্ণতার পরিচয় দেয় এবং অন্যদেরকেও কার্পণ্য করতে পরামর্শ দেয়।

আল্লাহ সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ, কিতাব এবং ন্যায় বিচারের ভারসাম্যপূর্ণ মানদণ্ড সহকারে তাঁর রসূল পাঠিয়েছেন, যাতে মানুষ ইনসাফের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে আর তার সাথে লোহাও নাযিল করেছেন যাতে ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠা এবং বাতিলের মাথা অবনত করার জন্য শক্তি ব্যবহার করা যায়। এভাবে আল্লাহ দেখতে চান মানুষের মধ্যে এমন লোক কারা যারা তাঁর দ্বীনের সহায়তা ও সাহায্যের জন্য প্রস্তুত হয় এবং সেজন্য প্রাণপণে চেষ্টা করে। তোমাদের নিজেদের উন্নতি ও মর্যাদার জন্য আল্লাহ এই সুযোগসমূহ সৃষ্টি করেছেন। অন্যথায় আল্লাহ তাঁর কাজের জন্য কারো মুখাপেক্ষী নন।

আল্লাহর পক্ষ থেকে ইতিপূর্বেও একের পর এক নবী-রসূলগণ এসেছেন। তাদের আহবানে কিছু লোক সঠিক পথে ফিরে এসেছে। কিন্তু অধিকাংশ লোকই পাপাচারী রয়ে গিয়েছে। তারপর ঈসা আলাইহিস সালাম এসেছেন। তাঁর শিক্ষায় মানুষের মধ্যে বহু নৈতিক গুণাবলী সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু তাঁর 'উম্মাত' বৈরাগ্যবাদের বিদআত অবলম্বন করে।

এখন আল্লাহ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠিয়েছেন। যারা তাঁর প্রতি ঈমান আনবে এবং আল্লাহকে ভয় করে জীবন যাপন করবে আল্লাহ তাদেরকে তাঁর রহমতের দ্বিগুণ অংশ দেবেন এবং তাদেরকে এমন 'নূর' দান করবেন যার সাহায্যে তারা দুনিয়ার জীবনে পদে পদে বাঁকা পথসমূহের মধ্যে সোজা পথটি স্পষ্ট দেখে চলতে পারবে। আহলে কিতাব নিজেদেরকে যদিও আল্লাহর রহমতের ঠিকাদার মনে করে থাকে। কিন্তু আল্লাহর রহমত তাঁর নিজেরই হাত আছে। যাকে ইচ্ছা তাকে এই রহমত ও অনুগ্রহ দান করার ইখতিয়ার তাঁর আছে। এ হচ্ছে এই সূরায় সুবিন্যস্ত ও ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত বিষয়বস্তুর সার সংক্ষেপ।

খালিদ ইবনু মা'দান হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ঘুমের পূর্বে 'মুসাব্বিহাত' (যে সকল সূরা শুরু 'সাব্বাহা বা ইউসাব্বিহু' দিয়ে) পাঠ করতেন এবং তিনি বলতেন: "এগুলোর মধ্যে এমন একটি আয়াত রয়েছে, যা এক হাজার আয়াতের সমান।" [সুনান আদ-দারেমী ৩৪৬৩]

ইবনু কাসীর (রহঃ) বলেছেন : এ হাদীসে যে আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে (আল্লাহ তা 'আলাই ভাল জানেন) তা হল : (هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)

"তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনিই জাহের, তিনিই বাতেন এবং তিনি সর্ববিষয়ে অধিক অবহিত।"

নাসাঈ বলেন, 'মু'আবিয়া বলেন: কোন কোন আহলে ইলম ছয়টি সুরাহকে মুসাব্বিহাত গণ্য করতেন: সুরাহ হাদীদ, হাশর, ওয়াল হাওয়ারিঈন (আস সফ); সুরাহ জুমু'আ, তাগাবুন এবং সুরা আ'লা।

পূর্ববর্তী ও পরের সূরার সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী সূরার (সূরা ওয়াকিয়াহ) শেষে আখিরাতের আলোচনা ছিল। আর এ সূরা শুরু করা হয়েছে তাওহীদের কথা দিয়ে তাওহীদের প্রতি ঈমানের উপরই আখিরাতের সাফল্য নির্ভরশীল, তাই দু'টি বিষয়ের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর। উভয় সূরার সম্পর্ককে এভাবেও বর্ণনা করা যায় যে- পূর্ববর্তী সূরার শেষ কথা ছিল, "হে রাসূল ! আপনি আপনার প্রতিপালক আল্লাহ পাকের পবিত্র নামের তাসবীহ পাঠ করুন" ! আর এ সূরার শুরুতেই ঘোষণা করা হয়েছে, "আসমান জমিনের সবকিছু আল্লাহ পাকের তাসবীহ পাঠে রত রয়েছে।"

এ সূরায় (সূরা হাদীদ) মানবজাতির হেদায়েতের জন্য যুগে যুগে নবী রাসূল প্রেরণের উল্লেখ রয়েছে। আর পরের সূরা মুজাদালাহ এ বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে, যে আল্লাহ তা'আলা নবী (সাঃ) -এর মাধ্যমে এমন হেদায়েতনামা প্রেরণ করেন যার দ্বারা মানব জীবনের কঠিন ও জটিল সমস্যার সমাধান হয় এবং শরিয়তের বিধান প্রবর্তনের মাধ্যমে মানুষের দুঃখ-কষ্ট দূর করা হয়।

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ ۚ وَ هُوَ الۡعَزِیۡزُ الۡحَكِیۡمُ

১. আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। আর তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

বিশ্ব-জাহানের প্রত্যেকটি বস্তু সদা সর্বদা এ সত্য প্রকাশ এবং ঘোষণা করে চলেছে যে, এ বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টা ও পালনকর্তা সব রকম দোষ-ক্রটি, অপূর্ণতা, দুর্বলতা, ভুল ভ্রান্তি ও অকল্যাণ থেকে পবিত্র। তাঁর ব্যক্তি সত্তা পবিত্র, তাঁর গুণাবলী পবিত্র, তাঁর কাজকর্ম পবিত্র এবং তাঁর সমস্ত সৃষ্টিমূলক বা শরীয়াতের বিধান সম্পর্কিত নির্দেশাবলীও পবিত্র। [কুরতুবী; সা'দী]

আয়াতে وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ বলা হয়েছে। عَزِيز শব্দের অর্থ পরাক্রমশালী, শক্তিমান ও অপ্রতিরোধ ক্ষমতার অধিকারী, যাঁর সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন পৃথিবীর কোন শক্তিই রোধ করতে পারে না, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় যাঁর আনুগত্য সবাইকে করতে হয়, যাঁর অমান্যকারী কোনভাবেই তাঁর পাকড়াও থেকে রক্ষা পায় না। আর حَكِيم শব্দের অর্থ হচ্ছে, তিনি যা-ই করেন, জ্ঞান ও যুক্তি বুদ্ধির সাহায্যে করেন। তাঁর সৃষ্টি, তাঁর ব্যবস্থাপনা, তার শাসন, তার আদেশ নিষেধ, তার নির্দেশনা সব কিছুই জ্ঞান ও যুক্তি নির্ভর। তাঁর কোন কাজেই অজ্ঞতা, বোকামি ও মূর্খতার লেশমাত্র নেই।

لَهٗ مُلۡكُ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ ۚ یُحۡیٖ وَ یُمِیۡتُ ۚ وَ هُوَ عَلٰی كُلِّ شَیۡءٍ قَدِیۡرٌ

২. আসমানসমূহ ও যমীনের সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁরই; তিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান; আর তিনিই সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।

তাই তিনি যেভাবে চান এগুলোর মধ্যে কর্তৃত্ব চালান। তিনি ব্যতীত এগুলোতে অন্য কারো নির্দেশ ও কর্তৃত্ব চলে না। অথবা অর্থ হল, বৃষ্টি, উদ্ভিদ ও রুযীর সমস্ত ভান্ডার তাঁরই মালিকানাধীন।

هُوَ الۡاَوَّلُ وَ الۡاٰخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الۡبَاطِنُ ۚ وَ هُوَ بِكُلِّ شَیۡءٍ عَلِیۡمٌ

৩. তিনিই প্রথম ও শেষ; প্রকাশ্য (উপরে) ও গোপন (নিকটে) আর তিনি সবকিছু সম্পর্কে সম্যক অবগত।

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেনঃ কোন সময় তোমার অন্তরে আল্লাহ তাআলা ও ইসলাম সম্পর্কে শয়তানী কুমন্ত্রণা দেখা দিলে (هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) আয়াতখানি আস্তে পাঠ করে নাও। [আবু দাউদ: ৫১১০] এই আয়াতের তাফসীর এবং "আউয়াল", "আখের", "যাহের" ও "বাতেন" এ শব্দ চারটির অর্থ সম্পর্কে তফসীরবিদগণের বহু উক্তি বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে "আউয়াল" শব্দের অর্থ তো প্রায় নির্দিষ্ট; অর্থাৎ অস্তিত্বের দিক দিয়ে সকল সৃষ্টজগতের অগ্রে ও আদি। কারণ, তিনি ব্যতীত সবকিছু তাঁরই সৃজিত। তাই তিনি সবার আদি। "আখের" এর অর্থ কারও কারও মতে এই যে, সবকিছু বিলীন হয়ে যাওয়ার পরও তিনি বিদ্যমান থাকবেন। [সা'দী] যেমন (كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ) [সূরা আল-কাসাস: ৮৮] আয়াতে এর পরিষ্কার উল্লেখ আছে।

ইমাম বুখারী বলেন, 'যাহের' অর্থ জ্ঞানে তিনি সবকিছুর উপর, অনুরূপ তিনি 'বাতেন' অর্থাৎ জ্ঞানে সবকিছুর নিকটে। বিভিন্ন হাদীসে এ আয়াতের তাফসীর এসেছে, এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘুমানোর সময় বলতেন, "হে আল্লাহ! সাত আসমানের রব, মহান আরশের রব, আমাদের রব এবং সবকিছুর রব, তাওরাত, ইঞ্জীল ও ফুরকান নাযিলকারী, দানা ও আঁটি চিরে বৃক্ষের উদ্ভাবকারী, আপনি ব্যতীত কোন হক্ক মা'বুদ নেই, যাদের কপাল আপনার নিয়ন্ত্রণে এমন প্রত্যেক বস্তুর অনিষ্ট হতে আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি, আপনি অনাদি, আপনার আগে কিছু নেই, আপনি অনন্ত আপনার পরে কিছুই থাকবে না। আপনি সবকিছুর উপরে, আপনার উপরে কিছুই নেই, আপনি নিকটবর্তী, আপনার চেয়ে নিকটবর্তী কেউ নেই, আমার পক্ষ থেকে আপনি আমার ঋণ পরিশোধ করে দিন এবং আমাকে দারিদ্রতা থেকে মুক্তি দিন। [মুসলিম: ২৭১৩, মুসনাদে আহমাদ ২/৪০৪]

هُوَ الَّذِىۡ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضَ فِىۡ سِتَّۃِ اَیَّامٍ ثُمَّ اسۡتَوٰی عَلَی الۡعَرۡشِ ؕ یَعۡلَمُ مَا یَلِجُ فِی الۡاَرۡضِ وَ مَا یَخۡرُجُ مِنۡهَا وَ مَا یَنۡزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَ مَا یَعۡرُجُ فِیۡهَا ؕ وَ هُوَ مَعَكُمۡ اَیۡنَ مَا كُنۡتُمۡ ؕ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ بَصِیۡرٌ

৪. তিনি ছয় দিনে আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন; তারপর তিনি আরশের উপর উঠেছেন। তিনি জানেন যা কিছু যমীনে প্রবেশ করে এবং যা কিছু তা থেকে বের হয়, আর আসমান থেকে যা কিছু অবতীর্ণ হয় এবং তাতে যা কিছু উত্থিত হয়। আর তোমরা যেখানেই থাক না কেন— তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন, আর তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা।

এখানে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টি ছয় দিনে সমাপ্ত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এর ব্যাখ্যা দিয়ে সূরা ফুসসিলাতের নবম ও দশম আয়াতে বলা হয়েছে যে, দুদিনে ভূমণ্ডল, দুদিনে ভূমণ্ডলের পাহাড়, সমুদ্র, খনি, বৃক্ষ, উদ্ভিদ এবং মানুষ ও জন্তুজানোয়ারের পানাহারের বস্তু-সামগ্রী সৃষ্টি করা হয়েছে। মোট চার দিন হল। বলা হয়েছেঃ (خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ) আবার বলা হয়েছে (وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ) যে দুদিনে ভূমণ্ডল সৃষ্টি করা হয়েছে, তা ছিল রবিবার ও সোমবার। দ্বিতীয় দুদিন ছিল মঙ্গল ও বুধ, যাতে ভূমণ্ডলের সাজ-সরঞ্জাম পাহাড়, নদী ইত্যাদি সৃষ্টি করা হয়। এরপর বলা হয়েছেঃ (فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ) অর্থাৎ "অতঃপর সাত আকাশ সৃষ্টি করেন দুদিনে [সূরা ফুসসিলাতঃ ১২ বাহ্যতঃ এ দুদিন হবে বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার; অর্থাৎ এ পর্যন্ত ছয় দিন হল।

জানা কথা যে, সূর্যের পরিক্রমণের ফলে দিন ও রাত্রির সৃষ্টি। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টির পূর্বে যখন চন্দ্র-সূর্যই ছিল না, তখন ছয় দিনের সংখ্যা কি হিসাবে নিরূপিত হল? কোন কোন তাফসীরবিদ বলেছেনঃ ছয় দিন বলে জাগতিক ৬ দিন বুঝানো হয়েছে। কিন্তু পরিস্কার ও নির্মল উত্তর এই যে, সূর্যোদয় থেকে সূর্যস্ত পর্যন্ত যে দিন

এবং সূর্যস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত যে রাত এটা এ জগতের পরিভাষা। বিশ্ব সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে দিবা-রাত্রির পরিচয়ের অন্য কোন লক্ষণ নির্দিষ্ট থাকতে পারে; যেমন জান্নাতের দিবা-রাত্রি সূর্যের পরিক্রমণের অনুগামী হবেনা। সহীহ বর্ণনা অনুযায়ী যে ছয় দিনে জগত সৃষ্টি হয়েছে তা রবিবার থেকে শুরু করে শুক্রবার শেষ হয়।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র বিশ্বকে মুহুর্তের মধ্যে সৃষ্টি করতে সক্ষম। স্বয়ং কুরআনুল কারীমেও বিভিন্ন ভঙ্গিতে একথা বার বার বলা হয়েছে। কোথাও বলা হয়েছেঃ "এক নিমেষের মধ্যে আমার আদেশ কার্যকরী হয়ে যায়।" [সূরা আল-কামারঃ ৫০] আবার কোথাও বলা হয়েছেঃ "আল্লাহ তা'আলা যখন কোন বস্তু সৃষ্টি করতে চান, তখন বলে দেনঃ হয়ে যাও।" আর সঙ্গে সঙ্গে তা সৃষ্টি হয়ে যায়।" [যেমন, সূরা আল-বাকারাহঃ ১১৭] এমতাবস্থায় বিশ্ব সৃষ্টিতে ছয় দিন লাগার কারণ কি? তাফসীরবিদ সায়ীদ ইবন জুবাইর রাহিমাহুল্লাহ এ প্রশ্নের উত্তরে বলেনঃ আল্লাহ তা'আলার মহাশক্তি নিঃসন্দেহে এক নিমেষে সব কিছু সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু মানুষকে বিশ্ব ব্যবস্থা পরিচালনার ধারাবাহিকতা ও কর্মতৎপরতা শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যেই এতে ছয় দিন ব্যয় করা হয়েছে। [তাফসীরে জাকারিয়া]

'অতঃপর তিনি আরশের ওপর সমুন্নত হলেন।' আল্লাহ তা'আলার অবস্থান সম্পর্কে এরূপ আরও ৭টি আয়াত রয়েছে। সূরা ইউনুস ৩, সূরা রাদ ২, ত্বা-হা- ৫, ফুরকান ৫৯, সিজদাহর ৪-৫ এবং হাদীদের ৪ নং আয়াতে উল্লেখ রয়েছে। এ সাতটি আয়াতেই الْعَرْشُ 'আরশ' শব্দের পরে عَلَي বা উপরে অব্যয়টি ব্যবহার করা হয়েছে যার অর্থ হল আরশের ওপর।

আল্লাহ তা'আলা আরশের ওপর রয়েছেন- এ ব্যাপারে অনেক সহীহ হাদীস রয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম হল: সাহাবী মু'আবিয়াহ বিন হাকাম আস সুলামী (রাঃ) যখন রাসূল (সাঃ) এর কাছে তাঁর দাসীকে আযাদ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন তখন রাসূল (সাঃ) বললেন, তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। মু'আবিয়াহ বিন হাকাম (রাঃ) বলছেন; আমি সেই দাসীকে নিয়ে আসলাম। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সেই দাসীটিকে লক্ষ করে বললেন: আল্লাহ তা'আলা কোথায়? দাসী বলল: আকাশের উপর। তিনি (সাঃ) আবার বললেন: আমি কে? দাসী বলল: আপনি আল্লাহর রাসূল। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন: তাকে আযাদ করে দাও, সে মু'মিনা নারী। (সহীহ মুসলিম হা: ২২২৭)

এ সকল আয়াত ও হাদীসের আলোকে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের এটাই আকীদাহ, আল্লাহ তা'আলা স্বস্বত্ত্বায় আরশের ওপর আছেন; সেখান থেকে তিনি সবকিছু দেখছেন, শুনছেন, জানছেন। তিনি সর্বত্র বিরাজমান নন। তিনি তাঁর শ্রবণ, দর্শন ও জ্ঞানের দিক দিয়ে আমাদের সাথে রয়েছেন। কিন্তু আরশের ওপর কিভাবে আছেন তা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল (সাঃ) আমাদের জানাননি; তাই আমরা জানি না। এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা নিষেধ। ইমাম মালিক (রহঃ)-কে যখন জিজ্ঞাসা করা হল, আল্লাহ তা'আলা আরশে কিভাবে আছেন? তিনি জবাবে বললেন: আল্লাহ তা'আলা আরশের উপরে আছেন তা জানা কথা। কিন্তু কিভাবে আছেন তা অজ্ঞাত, এ ব্যাপারে ঈমান রাখা ওয়াজিব এবং প্রশ্ন করা বিদআত।

আল্লাহ তা'আলা আরশের ওপর রয়েছেন- এ কথা যারা মানতে পারে না তারা বিভিন্ন যুক্তি-প্রমাণ পেশ করে থাকে। সালাফগণ তাদের যথার্থ উত্তর দিয়ে আল্লাহ তা'আলার আরশের ওপর অবস্থান সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নাহ যেভাবে সংবাদ দিয়েছে সেভাবে প্রমাণিত করেছেন। আল্লাহ তা'আলার আরশের হাকীকত ও ধরন তিনি ছাড়া কেউ জানে না। [ফাতহুল মাজীদ]

আল্লাহ্ শুধু সামগ্রিক জ্ঞানের অধিকারী নন, খুঁটি নাটি বিষয়েও জ্ঞানের অধিকারী। এক একটি শস্যদানা ও বীজ যা মাটির গভীরে প্রবিষ্ট হয়, এক একটি ছোট পাতা ও অঙ্কুর যা মাটি ফুঁড়ে বের হয়, বৃষ্টির এক একটি বিন্দু যা আসমান থেকে পতিত হয় এবং সমুদ্র ও খালবিল থেকে যে বাষ্পরাশি আকাশের দিকে উত্থিত হয়, তার প্রতিটি মাত্রা তাঁর জানা আছে। কোন্ দানাটি ও বীজটি পৃথিবীর কোন্খানে কিভাবে পড়ে আছে তা তিনি জানেন বলেই সেটিকে বিদীর্ণ করে অঙ্কুরোদগম করেন এবং তাকে লালন পালন করে বড় করেন। কি পরিমাণ বাষ্প কোন্ কোন্ স্থান থেকে উত্থিত হয়েছে এবং কোথায় কোথায় পৌঁছেছে তা তিনি জানেন বলেই সেগুলো একত্রিত করে মেঘমালা সৃষ্টি করেন এবং ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন অংশের জন্য তা বণ্টন করে দিয়ে একটি হিসেব অনুসারে বৃষ্টিপাত ঘটান। আর যেসব জিনিস মাটিতে প্রবেশ করে ও তা থেকে বেরিয়ে আসে এবং যেসব জিনিস আসমানের দিকে উঠে যায় ও তা থেকে নেমে আসে তাঁর বিস্তারিত দিকও এর আলোকে অনুমান ও অনুধাবন করা যেতে পারে। আল্লাহর জ্ঞান যদি এসব বিষয়ে পরিব্যপ্ত না হতো, তাহলে প্রতিটি জিনিসই আলাদা আলাদা ব্যবস্থাপনা এবং প্রত্যেকটি জিনিসই এমন নিপুন, নিখুঁত ও বিজ্ঞোচিত পন্থায় ব্যবস্থাপনা করা কিভাবে সম্ভব হতো? [তাফহীমুল কুরআন]

لَهٗ مُلۡکُ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ ؕ وَ اِلَی اللّٰہِ تُرۡجَعُ الۡاُمُوۡرُ

৫. আসমানসমূহ ও যমীনের সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁরই এবং আল্লাহরই দিকে সব বিষয় প্রত্যাবর্তিত হবে।

আকাশ ও পৃথিবীর সমুদয় জিনিসের উপর মালিকানা রয়েছে একমাত্র তাঁরই। সারা আসমান ও যমীনের সৃষ্টজীব তাঁরই দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ, তাঁরই খাদেম এবং তাঁর সামনে অবনত। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ "আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে এমন কেউ নেই, যে দয়াময়ের নিকট উপস্থিত হবে না বান্দারূপে। তিনি তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং তিনি তাদেরকে বিশেষভাবে গণনা করেছেন, আর কিয়ামত দিবসে তাদের সকলেই তাঁর নিকট আসবে একাকী অবস্থায়।" (১৯:৯৩-৯৫)

মহান আল্লাহর উক্তিঃ "আল্লাহরই দিকে সমস্ত বিষয় প্রত্যাবর্তিত হবে।' তিনি তাঁর মাখলুকের মধ্যে যা চান হুকুম দিয়ে থাকেন। তিনি ন্যায় বিচারক, তিনি অবিচার ও যুলুম করেন না। বরং এক একটি পুণ্যকে তিনি দশগুণ করে বাড়িয়ে দেন এবং নিজের পক্ষ হতে বড় প্রতিদান প্রদান করে থাকেন। যেমন তিনি বলেনঃ"কিয়ামতের দিন আমি ন্যায়ের মানমণ্ড স্থাপন করবে, তখন কোন নফসের প্রতি বিন্দুমাত্র যুলুম করা হবে না, কোন কিছু যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয় তবুও তা আমি হাযির করবে এবং হিসাব গ্রহণের জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট।" (২১:৪৭)।

یُوۡلِجُ الَّیۡلَ فِی النَّهَارِ وَ یُوۡلِجُ النَّهَارَ فِی الَّیۡلِ ؕ وَ هُوَ عَلِیۡمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوۡرِ

৬. তিনিই রাতকে প্রবেশ করান দিনে আর দিনকে প্রবেশ করান রাতে এবং তিনি অন্তরের বিষয়াদি সম্পর্কে সম্যক অবগত।

অর্থাৎ মাখলুকের মধ্যে সবকিছুর ব্যবস্থাপনা তিনিই করেন। দিবস ও রজনীর পরিবর্তন ঘটানো তাঁরই কাজ। স্বীয় হিকমতের মাধ্যমে তিনি এ দু'টির হ্রাস-বৃদ্ধি করে থাকেন। কখনো দিন বড় করেন ও রাত্রি ছোট করেন এবং কখনো রাত্রি বড় করেন ও দিন ছোট করেন। আবার কখনো দুটোকেই সমান করে দেন। কখনো করেন শীতকাল, কখনো করেন গ্রীষ্মকাল এবং কখনো করেন বর্ষাকাল, কখনো বসন্তকাল, আর কখনো। শরকাল। এ

সব কিছুই বান্দাদের কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্যেই করে থাকেন। তিনি অন্তর্যামী। তিনি অন্তরের ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম বিষয়েরও খবর রাখেন। কোন কিছুই তাঁর কাছে গোপন থাকে না।

اٰمِنُوۡا بِاللّٰہِ وَ رَسُوۡلِہٖ وَ اَنۡفِقُوۡا مِمَّا جَعَلَکُمۡ مُّسۡتَخۡلَفِیۡنَ فِیۡہِ ؕ فَالَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا مِنۡکُمۡ وَ اَنۡفَقُوۡا لَہُمۡ اَجۡرٌ کَبِیۡرٌ

৭. তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন এবং আল্লাহ তোমাদেরকে যা কিছুর উত্তরাধিকারী করেছেন তা হতে ব্যয় কর। অতঃপর তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও ব্যয় করে, তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার।

আয়াতটি অমুসলিমদের সম্বোধন করে একথা বলা হয়নি। বরং পরবর্তী গোটা বক্তব্য থেকে একথাই প্রকাশ পাচ্ছে যে, এখানে সেই সব মুসলমানদের সম্বোধন করা হয়েছে যারা ইসলামের বাণী স্বীকার করে ঈমান গ্রহণকারীদের সাথে শামিল হয়েছিলেন। কিন্তু ঈমানের দাবী পূরণ করা এবং মু'মিনের মত জীবন পদ্ধতি গ্রহণ করা থেকে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিলেন। একথা সবারই জানা যে, অমুসলিমদেরকে ঈমানের দাওয়াত দেয়ার সাথে সাথেই একথা বলা যায় না, যে আল্লাহর পথে জিহাদের খাতে উদার মনে সাহায্য করো। কিংবা তাদেরকে একথাও বলা না যে, তোমাদের মধ্যে যারা বিজয় লাভের পূর্বে জিহাদ ও আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করবে তাদের মর্যাদা যারা বিজয় লাভের পরে এসে কাজ করবে তাদের চেয়ে অনেক বেশী হবে। অমুসলিমদের দাওয়াত দেয়ার ক্ষেত্রে প্রথমে তাদের সামনে ইসলামের প্রাথমিক দাবী পেশ করা হয়ে থাকে, চূড়ান্ত দাবী নয়। এ কারণে বক্তব্যের ধারা অনুসারে এখানে اٰمِنُوۡا بِاللّٰہِ وَرَسُوۡلِہٖ বলার অর্থ হচ্ছে, যে সেই সব লোক, যারা ঈমানের দাবী করে মুসলমানদের দলে শামিল হয়েছো---আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে সরল মনে সত্যিকার অর্থে মেনে নাও এবং এমন কর্মপন্থা গ্রহণ করো যা নিষ্ঠাবান মু'মিনদের করা উচিত।

এখানে ব্যয় করার অর্থ সাধারণ কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা নয়। বরং ১০ নম্বর আয়াতের ভাষা স্পষ্টভাবে বলছে যে, এখানে এর অর্থ ঐ সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নেতৃত্বে কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে ইসলামকে সমুন্নত করার যে সংগ্রাম চলছিলো সে উদ্দেশ্যে ব্যয় করা। বিশেষ করে সে সময় এমন দু'টি প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল যেজন্য ইসলামী সরকার চরমভাবে আর্থিক সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছিল। এর একটি ছিল সামরিক প্রয়োজন। আর অপরটি ছিল সেসব নির্যাতিত মুসলমানদের সাহায্য সহযোগিতা করা যারা কাফেরদের জুলুম নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে আরবের প্রতিটি অংশ থেকে হিজরত করে মদিনায় চলে এসেছিলো এবং আরো আসছিলো। এ ব্যয় মেটানোর জন্য সত্যিকার ম'মিনগণ তাঁদের শক্তি ও সামর্থের চেয়ে বেশী বোঝা নিজেরা বহন করেছিল। পরবর্তী ১০, ১২, ১৮ ও ১৯ আয়াতে এজন্য তাদের প্রশংসা করা হয়েছে। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে বহুসংখ্যক এমন স্বচ্ছল লোকও ছিল যারা কুফর ও ইসলামের এ সংঘাতকে নিছক দর্শক হয়ে দেখছিলো। যে জিনিসের প্রতি ঈমান পোষণের দাবী তারা করছিলো তার কিছু কর্তব্য ও দায়-দায়িত্ব যে তাদের প্রাণ ও সম্পদের ওপর বর্তায়, সে বিষয়ে কোন অনুভূতিই তাদের ছিল না। এ দ্বিতীয় প্রকারের লোকদেরকেই এ আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে। তাদের বলা হচ্ছে, খাঁটি মু'মিন হও এবং আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় কর।

তোমাদেরকে যা কিছুর উত্তরাধিকারী করেছেন- এর দু'টি অর্থ এবং দু'টি অর্থই এখানে প্রযোজ্য। একটি অর্থ হচ্ছে, তোমাদের কাছে যে সম্পদ আছে তা মূলত তোমাদের নিজের সম্পদ নয়, তা আল্লাহর দেয়া সম্পদ। তোমরা নিজেরা এর মালিক নও। আল্লাহ তাঁর নিজের প্রতিনিধি হিসেবে এ সম্পদ তোমাদের অধিকারে

দিয়েছেন। অতএব, সম্পদের মূল মালিকের কাজে তা ব্যয় করতে কুণ্ঠিত ও পিছপা হয়ো না। মালিকের সম্পদ মালিকের কাজে ব্যয় করতে টালবাহানা করা প্রতিনিধির কাজ নয়। দ্বিতীয় অর্থ হলো, এ অর্থ চিরদিন তোমাদের কাছে ছিল না এবং চিরদিন তোমাদের কাছে থাকবেও না। কাল তা অন্য কিছু লোকের কাছে ছিল, আজ আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করে তা তোমাদের হাতে সোপর্দ করেছেন। আবার এমন এক সময় আসবে যখন তা তোমাদের কাছে থাকবে না। অন্য লোকেরা তোমাদের স্থলাভিষিক্ত হবে। সাময়িক কর্তৃত্বের এ সংক্ষিপ্ত সময়ে যখন এ সম্পদ তোমাদের অধিকার ও কর্তৃত্বে থাকে তখন আল্লাহর কাজে তা খরচ করো, যাতে আখেরাতে তোমরা তার স্থায়ী প্রতিদান লাভ করতে পার।

وَ مَا لَكُمۡ لَا تُؤۡمِنُوۡنَ بِاللّٰهِ ۚ وَ الرَّسُوۡلُ یَدۡعُوۡكُمۡ لِتُؤۡمِنُوۡا بِرَبِّكُمۡ وَ قَدۡ اَخَذَ مِیۡثَاقَكُمۡ اِنۡ كُنۡتُمۡ مُّؤۡمِنِیۡنَ

৮. আর তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহর উপর ঈমান আন না? অথচ রাসূল তোমাদেরকে তোমাদের রবের প্রতি ঈমান আনার জন্য ডাকছেন অথচ আল্লাহ তোমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন, যদি তোমরা ঈমানদার হও।

কিছু সংখ্যক মুফাস্‌সির এ প্রতিশ্রুতি বলতে অর্থ করেছেন আল্লাহর দাসত্ব করার সে প্রতিশ্রুতি যা সৃষ্টির সূচনা পর্বে আদম আলাইহিস সালামের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাঁর সমস্ত সন্তানকে বের করে তাদের সবার নিকট থেকে নেয়া হয়েছিল। কিন্তু অপর কিছু সংখ্যক তাফসীরকারক এর অর্থ করেছেন ‘সে প্রতিশ্রুতি যা প্রত্যেক মানুষের প্রকৃতি ও প্রকৃতিগত বিবেক-বুদ্ধিতে আল্লাহর দাসত্বের জন্য বর্তমান। [কুরতুবী] কিন্তু সঠিক কথা হলো, এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের সচেতন প্রতিশ্রুতি, ঈমান গ্রহণ করার মাধ্যমে প্রত্যেক মুসলিম আল্লাহর সাথে যে প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হয়। কুরআন মজীদের অন্য এক স্থানে যে ভাষায় এ প্রতিশ্রুতির উল্লেখ করা হয়েছে তা হচ্ছে, “আল্লাহ তোমাদের যেসব নিয়ামত দান করেছেন সেসব নিয়ামতের কথা মনে কর এবং তোমাদের কাছ থেকে যে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছেন তার কথাও মনে কর। সে সময় তোমরা বলেছিলে, আমরা শুনলাম এবং আনুগত্য করলাম। আর আল্লাহকে ভয় কর আল্লাহ মনের কথাও জানেন।” [সূরা আল-মায়েদাহ: ৭]

উবাদা ইবনে সামেত থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের থেকে এই মর্মে বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন যে, আমরা যেন সক্রিয়তা ও নিস্ক্রিয়তা উভয় অবস্থায় শুনি ও আনুগত্য করে যাই এবং স্বচ্ছলতা ও অস্বচ্ছলতা উভয় অবস্থায় আল্লাহর পথে খরচ করি, ভাল কাজের আদেশ করি এবং মন্দ কাজে নিষেধ করি, আল্লাহ সম্পর্কে সত্য কথা বলি এবং সেজন্য কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় না করি।” [মুসলিম: ১৭০৯, মুসনাদে আহমদ: ৫/৩১৬]।

যদি তোমরা মুমিন হও। এখানে প্রশ্ন হয় যে, এ কথাটি সেই কাফেরদেরকে বলা হয়েছে, যাদেরকে মুমিন না হওয়ার কারণে ইতিপূর্বে (وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ) বলে সতর্ক করা হয়েছে। এমতাবস্থায় ‘তাদেরকে তোমরা যদি মুমিন হও’ বলা কিরূপে সঙ্গত হতে পারে? জওয়াব এই যে, কাফের ও মুশরিকরাও আল্লাহর প্রতি ঈমানের দাবি করত। প্রতিমাদের ব্যাপারে তাদের বক্তব্য ছিল এই যে, (مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ) “তাদের ইবাদত তো আমরা কেবল এজন্যই করি যে, এরা আমাদেরকে সুপারিশ করে আল্লাহর নৈকট্যের অধিকারী করে দিবে”। [সূরা আয-যুমার: ৩] অতএব, আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহর প্রতি ঈমানের দাবি যদি সত্য হয়, তবে তার বিশুদ্ধ ও ধর্তব্য পথ অবলম্বন কর।

هُوَ الَّذِیۡ یُنَزِّلُ عَلٰی عَبۡدِہٖۤ اٰیٰتٍۭ بَیِّنٰتٍ لِّیُخۡرِجَکُمۡ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَی النُّوۡرِ ؕ وَ اِنَّ اللّٰہَ بِکُمۡ لَرَءُوۡفٌ رَّحِیۡمٌ

৯. তিনিই তাঁর বান্দার প্রতি সুস্পষ্ট আয়াত নাযিল করেন, তোমাদেরকে অন্ধকার হতে আলোতে আনার জন্য। আর নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি করুণাময়, পরম দয়ালু।

وَ مَا لَکُمۡ اَلَّا تُنۡفِقُوۡا فِیۡ سَبِیۡلِ اللّٰہِ وَ لِلّٰہِ مِیۡرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ ؕ لَا یَسۡتَوِیۡ مِنۡکُمۡ مَّنۡ اَنۡفَقَ مِنۡ قَبۡلِ الۡفَتۡحِ وَ قٰتَلَ ؕ اُولٰٓئِکَ اَعۡظَمُ دَرَجَۃً مِّنَ الَّذِیۡنَ اَنۡفَقُوۡا مِنۡۢ بَعۡدُ وَ قٰتَلُوۡا ؕ وَ کُلًّا وَّعَدَ اللّٰہُ الۡحُسۡنٰی ؕ وَ اللّٰہُ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ خَبِیۡرٌ

১০. আর তোমাদের কি হলো যে, তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় করছ না? অথচ আসমানসমূহ ও যমীনের মীরাস তো আল্লাহরই। তোমাদের মধ্যে যারা বিজয়ের আগে ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ করেছে, তারা (এবং পরবর্তীরা) সমান নয়। তারা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ তাদের চেয়ে যারা পরবর্তী কালে ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ করেছে। তবে আল্লাহ্ উভয়ের জন্যই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর তোমরা যা করা আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।

میراث অভিধানে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত মালিকানাকে বলা হয়ে থাকে। এই মালিকানা বাধ্যতামূলক মৃত ব্যক্তি ইচ্ছা করুক বা না করুক, ওয়ারিশ ব্যক্তি আপনাআপনি মালিক হয়ে যায়। এখানে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের উপর আল্লাহ তা'আলার সার্বভৌম মালিকানাকে میراث শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার রহস্য এই যে, তোমরা ইচ্ছা কর বা না কর, তোমরা আজ যে যে জিনিসের মালিক বলে গণ্য হও, সেগুলো অবশেষে আল্লাহ তা'আলার বিশেষ মালিকানায় চলে যাবে। [সা'দী, কুরতুবী]

এক হাদীসে এসেছে, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বলেন, একদিন আমরা একটি ছাগল যাবাই করে তার অধিকাংশ গোশত বন্টন করে দিলাম, শুধু একটি হাত নিজেদের জন্যে রাখলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ বন্টনের পর এই ছাগলের গোশত কতটুকু রয়ে গেছে? আমি আরয করলামঃ শুধু একটি হাত রয়ে গেছে। তিনি বললেনঃ গোটা ছাগলই রয়ে গেছে। তোমার ধারণা অনুযায়ী কেবল হাতই রয়ে যায়নি। [তিরমিযী: ২৪৭০]

কেননা, গোটা ছাগলই আল্লাহর পথে ব্যয় হয়েছে। এটা আল্লাহর কাছে তোমার জন্যে থেকে যাবে। যে হাতটি নিজের খাওয়ার জন্যে রেখেছ, আখেরাতে এর কোন প্রতিদান পাবে না। কেননা, এটা এখানেই বিলীন হয়ে যাবে। আয়াতের আরেকটি অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর পথে অর্থ খরচ করতে গিয়ে তোমাদের কোন রকম দারিদ্র বা অস্বচ্ছলতার আশংকা করা উচিত নয়। কেননা, যে আল্লাহর উদ্দেশ্যে তা খরচ করবে তিনি যমীন ও ঊর্ধ্ব জগতের সমস্ত ভাণ্ডারের মালিক। আজ তিনি তোমাদেরকে যা দান করে রেখেছেন তার কাছে দেয়ার শুধু ঐ টুকুই ছিল না। কাল তিনি তোমাদেরকে তার চেয়েও অনেক বেশী দিতে পারেন। [ইবন কাসীর]

একথাটাই অন্য একটি স্থানে এভাবে বলা হয়েছে, “হে নবী, তাদের বলুন, আমার রব তার বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা অঢেল রিযিক দান করেন এবং যার জন্য ইচ্ছা তা সংকীর্ণ করে দেন। আর তোমরা যা খরচ কর তার পরিবর্তে তিনিই তোমাদেরকে আরও রিযিক দান করেন। তিনি সর্বোত্তম রিযিক দাতা।” [সূরা সাবা: ৩৯]

فَتۡحٌ (বিজয়) থেকে অধিকাংশ মুফাসসির বুঝিয়েছেন মক্কা বিজয়। কারো কারো মতে হুদাইবিয়ার সন্ধিই যেহেতু সুস্পষ্ট বিজয়, তাই এ থেকে হুদাইবিয়ার সন্ধি বুঝিয়েছেন।

আল্লাহর পথে ব্যয় করার প্রতি জোর দেয়ার পর পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর পথে যা কিছু যে কোন সময় ব্যয় করলে সওয়াব পাওয়া যাবে; কিন্তু ঈমান, আন্তরিকতা ও অগ্রগামিতার পার্থক্যবশত সওয়াবেও পার্থক্য হবে। বলা হয়েছেঃ (لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ) অর্থাৎ যারা আল্লাহর পথে ধনসম্পদ ব্যয় করে তারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। (এক) যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে বিশ্বাস স্থাপন করত আল্লাহর পথে ব্যয় করেছে। (দুই) যারা মক্কা বিজয়ের পর মুমিন হয়ে আল্লাহর পথে ব্যয় করেছে।

এই দুই শ্রেণীর লোক আল্লাহর কাছে সমান নয়; বরং মর্যাদায় একশ্রেণী অপর শ্রেণী থেকে শ্রেষ্ঠ। মক্কা বিজয়ের পূর্বে বিশ্বাস স্থাপনকারী, জেহাদকারী ও ব্যয়কারীর মর্যাদা অপর শ্রেণী অপেক্ষা বেশী। কারণ, অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতিতে তারা আল্লাহ তা'আলার জন্য এমন সব বিপদাপদের সম্মুখীন হয়েছিলো যার সম্মুখীন অন্য গোষ্ঠীকে হতে হয়নি। মুফাসসিরদের মধ্যে মুজাহিদ, কাতাদা এবং যায়েদ ইবনে আসলাম বলেনঃ এ আয়াতে বিজয় শব্দটি যে ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে সেটি হচ্ছে মক্কা বিজয়। আমের শা'বী বলেনঃ এর দ্বারা হুদায়বিয়ার সন্ধিকে বুঝানো হয়েছে। অধিকাংশ মুফাসসির প্রথম মতটি গ্রহণ করেছেন। [কুরতুবী; ইবন কাসীর]

পারস্পরিক তারতম্য সত্বেও আল্লাহ তা'আলা কল্যাণ অর্থাৎ জান্নাত ও মাগফিরাতের ওয়াদা সবার জন্যেই করেছেন। এই ওয়াদা সাহাবায়ে-কেরামের সেই শ্রেণীদ্বয়ের জন্যে, যারা মক্কাবিজয়ের পূর্বে ও পরে আল্লাহর পথে ব্যয় করেছেন এবং ইসলামের শত্রুদের মোকাবিলা করেছেন। এতে সাহাবায়ে-কেরামের প্রায় সমগ্র দলই শামিল আছে। তাই মাগফিরাত ও রহমতের এই কুরআনী ঘোষণা প্রত্যেক সাহাবীকে শামিল করেছে। [সা'দী] শুধু মাগফিরাতই নয়; (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ) [সূরা আত-তাওবাহঃ ১০০] বলে তাঁর সন্তুষ্টিরও নিশ্চিত আশ্বাস দান করেছেন।

ফুটনোট

- সকল মাখলূক আল্লাহ তা'আলার তাসবীহ ও পবিত্রতা পাঠ করে।
- জীবন ও মৃত্যুর মালিক একমাত্র আল্লাহ তা'আলা।
- যখন কিছু ছিল না তখন আল্লাহ তা'আলা ছিলেন, আর যখন কিছু থাকবে না তখন আল্লাহ তা'আলা থাকবেন।
- আল্লাহ তা'আলা আরশের ওপর থেকেই তাঁর জ্ঞান, দর্শন ও শ্রবণ দ্বারা প্রত্যেকের সাথে রয়েছেন।
- আল্লাহ তা'আলা অন্তরযামী। আকাশ ও জমিনের সার্বভৌমত্বের মালিক একমাত্র আল্লাহ তা'আলা।
- সম্পদকে নেয়ামত মনে করে তার সৎব্যবহার করা উচিত।
- ঈমানের সাথে নেকীর আশায় দান করলে আল্লাহ তা'আলা মহা পুরস্কার প্রদান করবেন।
- الْفَتْحِ বা বিজয় দ্বারা কোন্ বিজয়কে বুঝোনো হয়েছে তা নিয়ে দুটি মত পাওয়া যায়। হুদায়বিয়ার সন্ধি, মক্কা বিজয়।
- সাহাবীদের ব্যাপারে কুটক্তি করা, হিংসা বিদ্বেষ পোষণ করা সে যে কোন সাহাবীর ব্যাপারে হোক না কেন তা হারাম।
- সমস্ত সম্পদের প্রকৃত মালিক একমাত্র আল্লাহ তা'আলা, মানুষকে তা ব্যবহার করার অধিকার দিয়েছেন। আমলের তারতম্য অনুপাতে জান্নাতে মর্যাদার তারতম্য হবে।

কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২৪
প্রস্তুতি সহায়ক তাফসীর নোট পর্বঃ ১৫

সূরা হাদীদ ১১-১৯ আয়াত

مَنۡ ذَا الَّذِیۡ یُقۡرِضُ اللّٰهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَیُضٰعِفَهٗ لَهٗ وَ لَهٗۤ اَجۡرٌ کَرِیۡمٌ

১১. এমন কে আছে যে আল্লাহকে দেবে উত্তম ঋণ? তাহলে তিনি বহু গুণে এটাকে বৃদ্ধি করবেন তার জন্য। আর তার জন্য রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার।

এটা আল্লাহ তা'আলার চরম উদারতা ও দানশীলতা যে, মানুষ যদি তাঁরই দেয়া সম্পদ তাঁর পথে ব্যয় করে তাহলে তিনি তা নিজের জন্য ঋণ হিসেবে গ্রহণ করেন। অবশ্য শর্ত এই যে, তা "কর্জে হাসানা" (উত্তম ঋণ) হতে হবে। অর্থাৎ খাঁটি নিয়তে কোন ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে ছাড়াই তা দিতে হবে, তার মধ্যে কোন প্রকার প্রদর্শনীর মনোবৃত্তি, খ্যাতি ও নামধামের আকাঙ্ক্ষা থাকবে না, তা দিয়ে কাউকে খোঁটা দেয়া যাবে না, দাতা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই দেবে এবং এছাড়া অন্য কারো প্রতিদান বা সন্তুষ্টি লক্ষ্য হবে না। এ ধরনের ঋণের জন্য আল্লাহর দু'টি প্রতিশ্রুতি আছে। একটি হচ্ছে, তিনি তা কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে ফেরত দেবেন। অপরটি হচ্ছে, এজন্য তিনি নিজের পক্ষ থেকে সর্বোত্তম পুরস্কার দান করবেন। হাদীসে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, এ আয়াত যখন নাযিল হয় এবং নবীর (সা.) পবিত্র মুখ থেকে লোকজন তা শুনতে পায় তখন হযরত আবদ দাহদাহ আনসারী জিজ্ঞেস করেনঃ হে আল্লাহর রসূল, আল্লাহ কি আমাদের কাছে ঋণ চান? জবাবে নবী (সা.) বলেনঃ হে আবুদ দাহদাহ, হ্যাঁ'। তখন তিনি বললেনঃ আপনার হাত আমাকে একটু দেখান। নবী (সা.) তাঁর দিকে নিজে হাত বাড়িয়ে দিলেন। আবুদ দাহদাহ নবীর (সা.) হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বললেনঃ "আমি আমার রবকে আমার বাগান ঋণ দিলাম" হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেনঃ সেই বাগানে ৬ শত খেজুর গাছ ছিল। বাগানের মধ্যেই ছিল আবুদ দাহদাহের বাড়ী। তার ছেলে মেয়েরা সেখানেই থাকতো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এসব কথাবার্তা বলে তিনি সোজা বাড়ীতে গিয়ে হাজির হলেন এবং স্ত্রীকে ডেকে বললেনঃ "দাহদাহর মা, বেরিয়ে এসো। আমি এ বাগান আমার রবকে ঋণ হিসেবে দিয়ে দিয়েছি। স্ত্রী বললোঃ "দাহদাহর বাপ, তুমি অতিশয় লাভজনক কারবার করেছো" এবং সেই মুহূর্তেই সব আসবাবপত্র ও ছেলেমেয়েকে সাথে নিয়ে বাগান ছেড়ে চলে গেলেন" (ইবনে আবী হাতেম)। এ ঘটনা থেকে অনুমান করা যায় সে সময় প্রকৃত মু'মিনদের কর্ম পদ্ধতি কেমন ছিল। এ থেকে একথাও বুঝা যায় যে, যে কর্জে হাসানাকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে ফেরত দেয়ার এবং তাছাড়াও আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সম্মানজনক পুরস্কার দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা কেমন।

يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَـٰتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَـٰنِهِم بُشْرَىٰكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّـٰتٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ

১২. সেদিন আপনি দেখবেন মুমিন নর-নারীদেরকে তাদের সামনে ও ডানে তাদের নূর ছুটতে থাকবে। বলা হবে, আজ তোমাদের জন্য সুসংবাদ জান্নাতের, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তোমরা স্থায়ী হবে, এটাই তো মহাসাফল্য।

এ আয়াতটি এবং পরবর্তী আয়াতসমূহ থেকে জানা যায় হাশরের ময়দানে শুধুমাত্র নেককার ঈমানদারদেরই 'নূর' থাকবে। কাফের, মুনাফিক, ফাসেক ও ফাজেররা দুনিয়াতে যেমন অন্ধকারে পথ হারিয়ে হাতড়িয়ে মরেছে সেখানেও তেমনি অন্ধকারে হাতড়িয়ে মরতে থাকবে। যেখানে আলো যেটুকু হবে তা সৎ আকীদা-বিশ্বাস ও সৎ আমলের। ঈমানের সততা এবং সৎচরিত্র ও কর্মের পবিত্রতাই 'নূর' রূপান্তরিত হবে যার কারণে সৎ লোকদের ব্যক্তিত্ব ঝলমলিয়ে উঠবে। যার কর্ম যতটা উজ্জল হবে তার ব্যক্তিসত্তার আলোক রশ্মিও তত বেশী তীব্র হবে। সে যখন হাশরের ময়দান থেকে জান্নাতের দিকে যাত্রা করবে তখন তার 'নূর' বা আলো তার আগে আগে ছুটতে থাকবে। এর সর্বোত্তম ব্যাখ্যা হচ্ছে কাতাদা বর্ণিত একটি 'মুরসাল' হাদীস। উক্ত হাদীসে তিনি বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ "কারো কারো 'নূর' এত তীব্র হবে যে, মদীনা থেকে "আদন" এর সম পরিমাণ দূরত্ব পর্যন্ত পৌঁছতে থাকবে। তাছাড়া কারো 'নূর' পৌঁছবে মদীনা থেকে সান'আ পর্যন্ত কারো তার চেয়েও কম এমনকি এমন মু'মিন থাকবে যার নূর তার পায়ের তলা থেকে সামনে যাবে না (ইবনে জারীর)। অন্য কথায় যার মাধ্যমে পৃথিবীর যত বেশী কল্যাণ হবে তার 'নূর' তত বেশী উজ্জ্বল হবে এবং পৃথিবীর যেসব স্থানে তার কল্যাণ পৌঁছবে হাশরের ময়দানেও তার নূরের আলো ততটা দূরত্ব পর্যন্ত দৌড়াতে থাকবে।

ۚ يَوْمَ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَ الْمُنٰفِقٰتُ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا انْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُّوْرِكُمْ ۚ قِيْلَ ارْجِعُوْا وَرَآءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرٍ لَّهٗ بَابٌ ؕ بَاطِنُهٗ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَ ظَاهِرُهٗ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ

১৩. সেদিন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীরা যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে বলবে, 'তোমরা আমাদের জন্য একটু থাম, যাতে আমরা তোমাদের নূরের কিছু গ্রহণ করতে পারি। বলা হবে, তোমরা তোমাদের পিছনে ফিরে যাও ও নূরের সন্ধান কর। তারপর উভয়ের মাঝামাঝি স্থাপিত হবে একটি প্রাচীর যাতে একটি দরজা থাকবে, যার ভিতরে থাকবে রহমত এবং বাইরে থাকবে শাস্তি।

সেদিন স্মরণীয়, যেদিন আপনি মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে দেখবেন যে, তাদের নূর তাদের অগ্রে ও ডানদিকে ছুটোছুটি করবে। 'সেদিন' বলে কেয়ামতের দিন বোঝানো হয়েছে। নূর দেয়ার ব্যাপারটি পুলসিরাতে চলার কিছু পূর্বে ঘটবে। এ আয়াতের একটি তাফসীর আবু উমামা বাহেলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি একদিন দামেশকে এক জানাযায় শরীক হন। জানাযা শেষে উপস্থিত লোকদেরকে মৃত্যু ও আখেরাত স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্যে তিনি মৃত্যু, কবর ও হাশরের কিছু অবস্থা বর্ণনা করেন। নিম্নে তার বক্তব্যের কিছু অংশ পেশ করা হলঃ

"অতঃপর তোমরা কবর থেকে হাশরের ময়দানে স্থানান্তরিত হবে। হাশরের বিভিন্ন মনযিল ও স্থান অতিক্রম করতে হবে। এক মনযিলে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে কিছু মুখমণ্ডলকে সাদা ও উজ্জ্বল করে দেয়া হবে এবং

কিছু মুখমণ্ডলকে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ করে দেয়া হবে। অপর এক মনাযিলে সমবেত সব মুমিন ও কাফেরকে গভীর অন্ধকার আচ্ছন্ন করে ফেলবে। কিছুই দৃষ্টিগোচর হবে না। এরপর নূর বণ্টন করা হবে। প্রত্যেক মুমিনকে নূর দেয়া হবে। মুনাফিক ও কাফেরকে নূর ব্যতীত অন্ধকারেই রেখে দেয়া হবে। আর এ উদাহরণই আল্লাহ তাঁর কুরআনে পেশ করেছেন। তিনি বলেছেন, “অথবা তাদের কাজ গভীর সাগরের তলের অন্ধকারের মত, যাকে আচ্ছন্ন করে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, যার ঊর্ধ্বে মেঘপুঞ্জ, অন্ধকারপুঞ্জ স্তরের উপর স্তর, এমনকি সে হাত বের করলে তা আদৌ দেখতে পাবে না। আল্লাহ যাকে নূর দান করেন না তার জন্য কোন নূরই নেই।” [সূরা আন-নূর: ৪০]

অত:পর যেভাবে অন্ধ ব্যক্তি চক্ষুষ্মান ব্যক্তির চোখ দ্বারা দেখতে পায় না তেমনি কাফের ও মুনাফিক ঈমানদারের নুর দ্বারা আলোকিত হতে পারবে না। মুনাফিকরা ঈমানদারদের বলবে, “তোমরা আমাদের জন্য একটু থাম, যাতে আমরা তোমাদের নূরের কিছু গ্রহণ করতে পারি।” এভাবে আল্লাহ্ মুনাফিকদেরকে ধোঁকাগ্রস্থ করবেন। যেমন আল্লাহ বলেছেন, “তারা আল্লাহকে ধোঁকা দেয় আর আল্লাহ্ তাদেরকে ধোঁকা দিবেন।” [সূরা আন নিসা: ১৪২] তারপর তারা যেখানে নূর বন্টন হয়েছিল সেখানে ফিরে যাবে, কিন্তু উভয়ের মাঝামাঝি স্থাপিত হবে একটি প্রাচীর যাতে একটি দরজা থাকবে, ওটার ভিতরে থাকবে রহমত এবং বাইরে থাকবে শাস্তি। এভাবেই মুনাফিক ধোঁকাগ্রস্ত হতে থাকবে। আর মুমিনদের মাঝে নূর বন্টিত হয়ে যাবে। [ইবনে কাসীর]

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, প্রত্যেক মুমিনকে তার আমল পরিমাণে নূর দেয়া হবে। ফলে কারও নূর পর্বতসম, কারও খর্জুর বৃক্ষসম এবং কারও মানবদেহসম হবে। সর্বাপেক্ষা কম নূর সেই ব্যক্তির হবে, যার কেবল বৃদ্ধাঙ্গুলিতে নূর থাকবে; তাও আবার কখনও জ্বলে উঠবে এবং কখনও নিভে যাবে। [ইবনে কাসীর]

يُنَادُوْنَهُمْ اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ ؕ قَالُوْا بَلٰى وَ لٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ اَنْفُسَكُمْ وَ تَرَبَّصْتُمْ وَ ارْتَبْتُمْ وَ غَرَّتْكُمُ الْاَمَانِيُّ حَتّٰى جَآءَ اَمْرُ اللّٰهِ وَ غَرَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ

১৪. মুনাফিকরা মুমিনদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করবে, আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না? তারা বলবে, হ্যাঁ, কিন্তু তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে বিপদগ্রস্ত করেছ। আর তোমরা প্রতীক্ষা করেছিলে, সন্দেহ পোষণ করেছিলে এবং অলীক আকাংখা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছিল, অবশেষে আল্লাহর হুকুম আসল। আর মহাপ্রতারক তোমাদেরকে প্রতারিত করেছিল আল্লাহ সম্পর্কে।

আমরা কি তোমাদের সাথে একই মুসলিম সমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না? আমরা কি কালেমায় বিশ্বাসী ছিলাম না? তোমাদের মত আমরাও কি নামায পড়তাম না? রোযা রাখতাম না? হজ্জ ও যাকাত আদায় করতাম না? আমরা তোমাদের মজলিসে শরীক হতাম না? তোমাদের সাথে কি আমাদের বিয়ে শাদী ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল না? তাহলে আমাদের ও তোমাদের মাঝে আজ এ বিচ্ছিন্নতা আসলো কিভাবে?

মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও তোমরা খাঁটি মুসলমান হও নাই, বরং ঈমানও কুফরের মাঝে দোদুল্যমান ছিলে, কুফরী ও কাফেরদের প্রতি তোমাদের আকর্ষণ কখনো ছিন্ন হয়নি এবং তোমরা নিজেদেরকে কখনো ইসলামের সাথে পূর্ণরূপে সম্পৃক্ত করনি।

আয়াতে মূল শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে تَرَبَّصْتُمْ । আরবী ভাষায় تربص বলে অপেক্ষা করা ও সুযোগ লাভের প্রতীক্ষায় থাকাকে। কেউ যখন দু'টি পথের কোন একটিকে চলার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারে না, বরং এই ভেবে অপেক্ষা করতে থাকে যে, যেদিকে যাওয়া লাভজনক বলে মনে হবে সেদিকেই যাবে তখন বলা হয় সে تربص এ পড়ে আছে। কুফর ও ইসলামের মধ্যকার সে নাজুক যুগে মুনাফিকরা এ ভূমিকাই গ্রহণ করেছিল। তারা খোলাখুলি কুফরের পক্ষও অবলম্বন করছিল না। আবার পূর্ণ তৃপ্তি ও প্রশান্তির সাথে নিজের শক্তিকে ইসলামের সাহায্য-সহযোগিতায় কাজে লাগাচ্ছিলো না। বরং যথারীতি বসে বসে দেখছিলো, এ শক্তি পরীক্ষায় কোন দিকের পাল্লা শেষ পর্যন্ত ভারী হয়। যাতে ইসলাম বিজয়ী হচ্ছে বলে মনে হলে সে ইসলামের দিকে পুরোপুরি ঝুঁকে পড়তে পারে এবং মুসলমানদের সাথে কালেমায় বিশ্বাস করার যে সম্পর্ক আছে তা কাজে লাগে। আর যদি কুফরী শক্তি বিজয়ী হয় তাহলে তার সহযোগীদের সাথে যেয়ে শামিল হতে পারে এবং তখন ইসলামের পক্ষ থেকে যুদ্ধে কোন প্রকার অংশ গ্রহণ না করা তার জন্য কল্যাণকর প্রমাণিত হয়।

فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَّ لَا مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ مَاْوٰىكُمُ النَّارُ ؕ هِيَ مَوْلٰىكُمْ ؕ وَ بِئْسَ الْمَصِيْرُ

১৫. সুতরাং আজ তোমাদের কাছ থেকে কোন মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে না এবং যারা কুফরী করেছিল তাদের কাছ থেকেও নয়। জাহান্নামই তোমাদের আবাসস্থল, এটাই তোমাদের যোগ্য; আর কত নিকৃষ্ট এ প্রত্যাবর্তনস্থল!

এক অর্থে مولى মতোয়াল্লীকে বলা হয়, যে অপরের কাজের দায়িত্বভার গ্রহণ করে। অর্থাৎ, এখন জাহান্নামের এই দায়িত্ব যে, তাদেরকে কঠিন থেকে কঠিনতর শাস্তি আস্বাদন করাবে। কেউ বলেছেন, সর্বদা সাথে থাকে তাকেও 'মাওলা' বলা হয়। অর্থাৎ, এখন জাহান্নামের আগুনই তাদের চিরসাথী ও চিরসঙ্গী হবে। কেউ বলেছেন, মহান আল্লাহ জাহান্নামকেও জ্ঞান ও বোধশক্তি দান করবেন। তাই সে কাফেরদের উপর রাগ ও ক্রোধ প্রকাশ করবে। অর্থাৎ, সে তাদের তত্ত্বাবধায়ক হবে এবং তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিতে থাকবে।

اَلَمْ يَاْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَ مَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ ۙ وَ لَا يَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ ؕ وَ كَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ

১৬. যারা ঈমান এনেছে তাদের হৃদয় কি আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য নাযিল হয়েছে তার জন্য বিগলিত হওয়ার সময় আসেনি? আর তারা যেন তাদের মত না হয় যাদেরকে আগে কিতাব দেয়া হয়েছিল—অতঃপর বহু কাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর তাদের অন্তরসমূহ কঠিন হয়ে পড়েছিল। আর তাদের অধিকাংশই ফাসিক।

এই সম্বোধন মু'মিনদেরকে করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য তাদেরকে আল্লাহর স্মরণের দিকে আরো বেশী মনোযোগী করা এবং পবিত্র কুরআন থেকে নির্দেশনা গ্রহণের প্রেরণা দেওয়া। (تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ) এর অর্থ অন্তর নরম হওয়া, উপদেশ কবুল করা ও আনুগত্য করা। কুরআনের প্রতি অন্তর বিগলিত হওয়ার অর্থ এর বিধান তথা আদেশ ও নিষেধ পুরোপুরি পালন করার জন্যে প্রস্তুত হওয়া এবং এ ব্যাপারে কোন অলসতা বা দুর্বলতাকে প্রশ্রয় না দেয়া। এটা মুমিনদের জন্যে হুশিয়ারি। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা'আলা কোন

কোন মুমিনদের অন্তরে আমলের প্রতি অলসতা ও অনাসক্তি আঁচ করে এই আয়াত নাযিল করেন। ইমাম আমাশ বলেনঃ মদীনায় পৌঁছার পর কিছু অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য অর্জিত হওয়ায় কোন কোন সাহাবীর কর্মোদ্দীপনায় কিছুটা শৈথিল্য দেখা দেয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপরোক্ত বর্ণনায় আরও বলা হয়েছে, এই হুশিয়ারি সংকেত কুরআন অবতরণ শুরু হওয়ার তের বছর পরে নাযিল হয়। ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমাদের ইসলাম গ্রহণের চার বছর পর এই আয়াতের মাধ্যমে আমাদেরকে হুশিয়ার করা হয়। [মুসলিম: ৩০২৭] মোটকথা, এই হুশিয়ারীর সারমর্ম হচ্ছে মুসলিমদেরকে পুরোপুরি নম্রতা ও সৎ কর্মের জন্যে তৎপর থাকার শিক্ষা দেয়া এবং এ কথা ব্যক্ত করা যে, আন্তরিক নমতাই সৎকর্মের ভিত্তি। শাদ্দাদ ইবনে আউস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, মানুষের অন্তর থেকে সর্বপ্রথম নম্রতা উঠিয়ে নেয়া হবে। [তাবারী: ২৭/২২৮]

اِعۡلَمُوۡۤا اَنَّ اللّٰهَ یُحۡیِ الۡاَرۡضَ بَعۡدَ مَوۡتِهَا ؕ قَدۡ بَیَّنَّا لَکُمُ الۡاٰیٰتِ لَعَلَّکُمۡ تَعۡقِلُوۡنَ

১৭. জেনে রাখো যে, আল্লাহই যমীনকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন। আমরা নিদর্শনগুলো তোমাদের জন্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছি যাতে তোমরা বুঝতে পার।

এখানে যে প্রসঙ্গে একথাটি বলা হয়েছে তা ভালভাবে বুঝে নেয়া দরকার। কুরআন মজীদে বেশ কিছু জায়গায় নবুওয়াত ও কিতাব নাযিলকে বৃষ্টির বরকতের সাথে তুলনা করা হয়েছে। কেননা, ভু-পৃষ্ঠের ওপর বৃষ্টিপাত যে কল্যাণ বয়ে আনে নবুওয়াত এবং কিতাবও মানবজাতির জন্য সে একই রকমের কল্যাণ বয়ে আনে। মৃত ভূ-পৃষ্ঠে যেমন রহমতের বৃষ্টির এক বিন্দু পড়তেই শস্য শ্যামল হয়ে ওঠে। ঠিক তেমনি আল্লাহর রহমতে যে দেশে নবী প্রেরিত হন এবং অহী ও কিতাব নাযিল হওয়া শুরু হয় সেখানে মৃত মানবতা, অকস্মাৎ জীবন লাভ করে। তার এমন সব প্রতিভা ও গুণাবলীর বহির্প্রকাশ ঘটতে থাকে, যা জাহেলিয়াত দীর্ঘদিন থেকে মাটিতে মিশিয়ে রেখেছিলো। তার মধ্য থেকে মহত নৈতিক চরিত্রের ঝর্ণাধারা ফুটে বের হতে থাকে এবং কল্যাণ ও সৎকর্মের ফুল বাগিচা শ্যামলিমায় ভেসে উঠে। এখানে যে উদ্দেশ্যে এ সত্যটির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে তা হচ্ছে, দুর্বল ঈমান মুসলমানদের চোখ যেন খুলে যায় এবং তারা যেন নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে দেখে। নবুওয়াত ও অহীর কল্যাণময় বৃষ্টিধারা থেকে মানবতার মধ্যে যেভাবে নতুন প্রাণের সঞ্চার হচ্ছিলো এবং যেভাবে তার আঁচল কল্যাণে ভরে উঠছিলো তা তাদের জন্য সুদূর অতীতের কোন কাহিনী ছিল না। সাহাবা কিরামের (রা.) পুত পবিত্র সমাজে তারা নিজ চোখে তা দেখছিলো। এ ব্যাপারে তারা দিনরাত সর্বক্ষণ অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলো। জাহেলিয়াত ও তার সমস্ত অকল্যাণসহ তাদের সামনে বর্তমান ছিল এবং জাহেলিয়াতের মোকাবিলায় ইসলাম থেকে যে গুণাবলী ও কল্যাণ উৎসারিত হয়ে পূর্ণরূপে বিকশিত হচ্ছিলো। তাই এসব বিষয় তাদেরকে বিস্তারিত বলার কোন প্রয়োজন ছিল না। অতএব, মৃত' ভূ-পৃষ্ঠে আল্লাহ তা' আলা রহমতের বারিধারা দ্বারা কিভাবে জীবন দান করেন তোমাদেরকে সুস্পষ্টভাবে তার নিদর্শন দেখিয়ে দেয়া হয়েছে। এ কারণে সেদিকে শুধু ইঙ্গিত করাই যথেষ্ট ছিল। এখন তোমরা বুদ্ধি-বিবেক খাটিয়ে নিজেদের অবস্থা ভেবে দেখ যে, এ নিয়ামত দ্বারা তোমরা কতখানি উপকৃত হচ্ছো।

اِنَّ الۡمُصَّدِّقِیۡنَ وَ الۡمُصَّدِّقٰتِ وَ اَقۡرَضُوا اللّٰهَ قَرۡضًا حَسَنًا یُّضٰعَفُ لَهُمۡ وَ لَهُمۡ اَجۡرٌ کَرِیۡمٌ

১৮. নিশ্চয় দানশীল পুরুষগণ ও দানশীল নারীগণ এবং যারা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান করে তাদেরকে দেয়া হবে বহু গুণ বেশী এবং তাদের জন্য রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার।

একের পরিবর্তে কমপক্ষে দশগুণ এবং তার চাইতেও বেশী সাতশতগুণ বরং তার থেকেও অধিক মাত্রায়। এই বর্ধন নিয়তের ঐকান্তিকতা, প্রয়োজন এবং স্থান-কালের ভিত্তিতে হতে পারে। যেমন, পূর্বে আলোচনা হল যে, মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয়কারীদের পুণ্য ও সওয়াব তার পরে ব্যয়কারীদের তুলনায় বেশী হবে।

জান্নাত ও তার নিয়ামতসমূহ; যা কখনো শেষ ও ধ্বংস হবার নয়। আয়াতে مُصَّدِّقِيْنَ শব্দটি আসলে مُتَصَدِّقِيْنَ ছিল। 'তা' হরফটিকে স্বাদ এর মধ্যে সন্ধি ঘটানো হয়েছে।

وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللهِ وَ رُسُلِهٖٓ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصِّدِّيْقُوْنَ ۖ وَ الشُّهَدَآءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ لَهُمْ اَجْرُهُمْ وَ نُوْرُهُمْ ؕ وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ

১৯. আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনে, তারাই সিদ্দীক। আর শহীদগণ, তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের কাছে তাদের প্রাপ্য পুরস্কার ও নূর। আর যারা কুফরী করেছে এবং আমাদের নিদর্শনসমূহে মিথ্যারোপ করেছে, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী।

এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, প্রত্যেক মুমিনকে সিদ্দীক ও শহীদ বলা যায়। এই আয়াতের ভিত্তিতে কারও কারও মতে যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন করে, সেই সিদ্দীক ও শহীদ। কিন্তু পবিত্র কুরআনের অন্য একটি আয়াত থেকে বাহ্যতঃ বুঝা যায় যে, প্রত্যেক মুমিন সিদ্দীক ও শহীদ নয়; বরং মুমিনদের একটি উচ্চ শ্রেণীকে সিদ্দীক ও শহীদ বলা হয়। আয়াতটি এই, (وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا) "আর কেউ আল্লাহ্ এবং রাসুলের আনুগত্য করলে সে নবী, সত্যনিষ্ঠ, শহীদ ও সৎকর্মপরায়ণ—যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন—তাদের সংগী হবে এবং তারা কত উত্তম সংগী!" [সূরা আন-নিসা: ৬৯]

এই আয়াতে নবী-রাসূলগণের সাথে মুমিনদের তিনটি শ্রেণী বিশেষভাবে উল্লেখিত হয়েছে যথা, সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহ। বাহ্যতঃ এই তিনটি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী। নতুবা ভিন্ন ভাবে বলার প্রয়োজন ছিল না। এ কারণেই কেউ কেউ বলেনঃ সিদ্দীক ও শহীদ প্রকৃতপক্ষে মুমিনদের বিশেষ উচ্চশ্রেণীর লোকগণকে বলা হয়, যারা মহান গুণগরিমার অধিকারী। [ইবন কাসীর; কুরতুবী] তাছাড়া কোন কোন হাদীস থেকেও এ তিন শ্রেণীর পার্থক্য ফুটে উঠে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "জান্নাতীরা তাদের উপরস্থিত খাস কামরায় অবস্থানকারীদের এমনভাবে দেখবে যেমন তোমরা পূর্ব বা পশ্চিম থেকে ধ্রুব তারাকে আকাশের দেশে চলতে দেখতে পাও; দু'দলের মর্যাদাগত পার্থক্যের কারণে। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তা কি নবীদের স্থান যেখানে অন্য কেউ পৌঁছতে পারবে না? তিনি বললেন, অবশ্যই হ্যাঁ, যার হাতে আমার আত্মা, তারা এমন কিছু লোক যারা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছে এবং রাসূলদের সত্যায়ন করেছে।" [বুখারী: ৩২৫৬, মুসলিম: ২৮৩১]

তবে আলোচ্য আয়াতে সব মুমিনকে সিদ্দীক ও শহীদ বলার তাৎপর্য এই যে, প্রত্যেক মুমিনকেও কোনো না কোনো দিক দিয়ে সিদ্দীক ও শহীদ বলে গণ্য এবং তাদের কাতারভুক্ত মনে করা হবে। কোন কোন মুফাসসির বলেন, আলোচ্য আয়াতে কামেল ও ইবাদতকারী মুমিন অর্থ নেওয়া সঙ্গত। নতুবা যে সব মুমিন অসাবধান ও খেয়ালখুশীতে মগ্ন তাদেরকে সিদ্দীক ও শহীদ বলা যায় না। এক হাদিস থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন “যারা মানুষের প্রতি অভিসম্পাত করে তারা শহীদদের অন্তর্ভুক্ত হবে না।” [মুসলিম: ২৫৯৮]

ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু একবার উপস্থিত জনতাকে বললেনঃ তোমাদের কি হলো যে, তোমরা কাউকে অপরের ইযযতের উপর হামলা করতে দেখেও তাকে বাধা দাও না এবং তাকে খারাপ মনে করা না? জনতা আরয করলঃ আমরা কিছু বললে সে আমাদের ইযযতের উপরও হামলা চালাবে এই ভয়ে আমরা কিছু বলি না। ওমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেনঃ যারা এমন শিথিল, তারা সেই শহীদদের অন্তর্ভুক্ত হবে না, যারা কেয়ামতের দিন পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের উম্মতদের মোকাবেলায় সাক্ষ্য দিবে। কোন কোন মুফাসসির বলেন, আলোচ্য আয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আমলে যারা ঈমানদার হয়েছে এবং তার পবিত্র সঙ্গলাভে ধন্য হয়েছে, তাদেরকেই বোঝানো হয়েছে।

তাদের মধ্য থেকে যে যে মর্যাদার পুরষ্কার ও যে মর্যাদার ‘নূরের উপযুক্ত হবে সে তা পাবে। তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ পুরস্কার ও নূর লাভ করবে। তাদের প্রাপ্য অংশ এখন থেকেই তাদের জন্য সংরক্ষিত আছে। [ইবনে কাসীর]

ফুটনোট

◘ আল্লাহ তা’আলার চরম উদারতা ও দানশীলতা যে, মানুষ যদি তাঁরই দেয়া সম্পদ তাঁর পথে ব্যয় করে তাহলে তিনি তা নিজের জন্য “কর্জে হাসানা” (উত্তম ঋণ) হিসেবে গ্রহণ করেন।

◘ এ ধরনের ঋণের জন্য আল্লাহর দু’টি প্রতিশ্রুতি আছে। একটি হচ্ছে, তিনি তা কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে ফেরত দেবেন। অপরটি হচ্ছে, এজন্য তিনি নিজের পক্ষ থেকে সর্বোত্তম পুরস্কার দান করবেন।

◘ হাশরের ময়দানে শুধুমাত্র নেককার ঈমানদারদেরই ‘নূর’ থাকবে। কাফের, মুনাফিক, ফাসেক ও ফাজেররা দুনিয়াতে যেমন অন্ধকারে পথ হারিয়ে হাতড়িয়ে মরেছে সেখানেও তেমনি অন্ধকারে হাতড়িয়ে মরতে থাকবে।

◘ পার্থিব জীবনে মুমিন ও মুনাফিক সহাবস্থান করে এবং পরস্পরকে আলাদা করার উপায় নেই। কিন্তু কিয়ামতের দিন তাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটবে।

মু’মিনরা কিয়ামতের দিন আমলানুযায়ী নূর পাবে যা দ্বারা পুলসিরাত পার হবে। তাই আমাদের বেশি বেশি সৎআমল করা উচিত।

মুনাফিকরা সেদিন বেহাল দশায় জর্জরিত হবে। মুনাফিকরা অন্তরে সর্বদা ইসলাম ও মুসলিমদের ক্ষতি কামনা করে।

◘ কিয়ামত দিবসে কোন বিনিময় চলবে না। নারী-পুরুষ যে কোন সৎআমল করলে তার প্রতিদান পাবে তাতে কোন তারতম্য করা হবে না।

◘ দুনিয়ার ধোকায় পড়ে দুষ্প্রাপ্য আশা-আকাঙ্ক্ষার পেছনে ছুটলে আল্লাহ ও পরকাল সম্পর্কে মানুষের মনে সন্দেহ ও অহংকার সৃষ্টি হয়।

◘ যে ব্যক্তি আল্লাহর অভিভাবকত্ব বাদ দিয়ে শয়তানের নিয়ন্ত্রণে চলে যায় তার পরিণতি জাহান্নাম ছাড়া আর কিছু নয়।

◘ আল্লাহর স্মরণ ও কুরআন তেলাওয়াত মানুষের অন্তরকে বিগলিত করে এবং কঠিন হয়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে।

◘ বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ার প্রতি মানুষের আকর্ষণ বাড়ে এবং আল্লাহর শিক্ষা অন্তর থেকে দূর হতে থাকে। এ ধরনের বিপদ থেকে রক্ষা পেতে আমাদেরকে বেশি বেশি কুরআন তেলাওয়াত ও আল্লাহর জিকির করতে হবে।

◘ কেউ নিজেকে ঈমানদার দাবি করলে সে যেন অসহায়কে সাহায্য করে। দানকারীরা সেইসব সত্যবাদী বা সিদ্দিকের সমান মর্যাদা লাভ করবেন যারা তাদের ঈমানে সত্যিকার একনিষ্ঠ।

◘ অসহায়কে দান করা বা ঋণ দেয়া উভয়ই আল্লাহ তায়ালাকে ঋণ দেয়ার সমতুল্য। দান বা ঋণ প্রদান বাহ্যিক দৃষ্টিতে আর্থিক ক্ষতি মনে হলেও বাস্তবে তাতে রয়েছে বিশাল লাভ।

◘ দুনিয়ার এই জীবনই চূড়ান্ত কিছু নয়; কাজেই পার্থিব জীবনের ধন-সম্পদ দেখে কাউকে বিচার করা সমীচীন নয়। চূড়ান্ত সফলতা কিয়ামতের ময়দানে নির্ধারিত হবে। দানকারীরা সেদিন তাদের সৎকর্মের পুরস্কার পাবেন ও চিরকালীন শান্তির আবাসে প্রবেশ করবেন। পক্ষান্তরে পাপী ব্যক্তিরা জাহান্নামের ভয়াবহ শাস্তির মুখোমুখি হবে।

◘ নবী-রাসূলগণের সাথে মুমিনদের তিনটি শ্রেণী বিশেষভাবে উল্লেখিত হয়েছে যথা, সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহ।

কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২৪
প্রস্তুতি সহায়ক তাফসীর নোট পর্বঃ ১৬

সূরা হাদীদ ২০-২৯ আয়াত

اِعۡلَمُوۡۤا اَنَّمَا الۡحَیٰوۃُ الدُّنۡیَا لَعِبٌ وَّ لَهۡوٌ وَّ زِیۡنَۃٌ وَّ تَفَاخُرٌۢ بَیۡنَکُمۡ وَ تَکَاثُرٌ فِی الۡاَمۡوَالِ وَ الۡاَوۡلَادِ ؕ کَمَثَلِ غَیۡثٍ اَعۡجَبَ الۡکُفَّارَ نَبَاتُهٗ ثُمَّ یَهِیۡجُ فَتَرٰىهُ مُصۡفَرًّا ثُمَّ یَکُوۡنُ حُطَامًا ؕ وَ فِی الۡاٰخِرَۃِ عَذَابٌ شَدِیۡدٌ ۙ وَّ مَغۡفِرَۃٌ مِّنَ اللّٰهِ وَ رِضۡوَانٌ ؕ وَ مَا الۡحَیٰوۃُ الدُّنۡیَاۤ اِلَّا مَتَاعُ الۡغُرُوۡرِ

২০. তোমরা জেনে রাখ, নিশ্চয় দুনিয়ার জীবন খেল-তামাশা, ক্রীড়া-কৌতুক, জাঁকজমক, পারস্পরিক গর্ব-অহংকার, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ছাড়া আর কিছু নয়। এর উপমা হলো বৃষ্টি, যার উৎপন্ন শস্য-সম্ভার কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে, তারপর সেগুলো শুকিয়ে যায়, ফলে আপনি ওগুলো পীতবর্ণ দেখতে পান, অবশেষে সেগুলো খড়-কুটায় পরিণত হয়। আর আখেরাতে রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। আর দুনিয়ার জীবন প্রতারণার সামগ্রী ছাড়া কিছু নয়।

আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া মোটেই ভরসা করার যোগ্য নয়। পার্থিব জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যা কিছু হয় এবং যাতে দুনিয়াদার ব্যক্তি মগ্ন ও আনন্দিত থাকে, প্রথমে সেগুলো ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে পার্থিব জীবনের মোটামুটি বিষয়গুলো যথাক্রমে এইঃ প্রথমে ক্রীড়া, এরপর কৌতুক, এরপর সাজ-সজ্জা, এরপর পারস্পরিক অহমিকা, এরপর ধন ও জনের প্রাচুর্য নিয়ে পারস্পরিক গর্ববোধ। لَعِبٌ শব্দের অর্থ এমন খেলা, لَهْوٌ এমন খেলাধুলা, যার আসল লক্ষ্য চিত্তবিনোদন زِينَةٌ বা অঙ্গ-সজ্জা, পোশাক ইত্যাদির মোহ সর্বজনবিদিত। প্রত্যেক মানুষের জীবনের প্রথম অংশ ক্রীড়া অর্থাৎ لَعِبٌ এর মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। এরপর لَهْوٌ শুরু হয়। এরপর সে অঙ্গসজ্জায় ব্যাপৃত হয় এবং শেষ বয়সে সমসাময়িক ও সমবয়সীদের সাথে وَتَفَاخُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ বা প্রতিযোগিতার প্রেরণা সৃষ্টি হয়। উল্লেখিত ধারাবাহিকতায় প্রতিটি অর্থেই মানুষ নিজ অবস্থা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে। কিন্তু কুরআন পাক বলে যে, এই সবই হচ্ছে সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী। [দেখুন: সা’দী, তাবারী]

দুনিয়ায় মানুষের কর্মকাণ্ড বর্ণনার পর পবিত্র কুরআন বর্ণিত বিষয়বস্তুর একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছে, (كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا) এখানে غَيْث শব্দের অর্থ বৃষ্টি। الكفار শব্দটি মুমিনের বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হলেও এর অপর আভিধানিক অর্থ কৃষকও হয়। আলোচ্য আয়াতে কেউ কেউ এ অর্থই নিয়েছেন। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, বৃষ্টি দ্বারা ফসল ও নানা রকম উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়ে যখন সবুজ ও শ্যামল বর্ণ ধারণ করে, তখন কৃষকের আনন্দের সীমা থাকে না। কোনো কোনপ তাফসীরবিদ الكفار শব্দটিকে প্রচলিত অর্থে ধরে বলেছেন যে, এতে কাফেররা আনন্দিত হয়। [কুরতুবী] এখানে প্রশ্ন হয় যে, সবুজ, শ্যামল ফসল দেখে কাফেররাই কেবল আনন্দিত হয় না, মুসলিমরাও হয়। জওয়াব এই যে, মুমিনের আনন্দ ও কাফেরের

আনন্দের মধ্যে বিরাট ব্যবধান রয়েছে। ফলে দুনিয়ার অগাধ ধন-রত্ন পেয়েও মুমিন কাফেরের ন্যায় আনন্দিত ও মত্ত হয় না। তাই আয়াতে কাফের আনন্দিত হয় বলা হয়েছে।

এরপর এই দৃষ্টান্তের সারসংক্ষেপ এরূপ বর্ণনা করা হয়েছে যে, ফসল ও অন্যান্য উদ্ভিদ যখন সবুজ শ্যামল হয়ে যায়, তখন দর্শক মাত্রই বিশেষ করে কাফেররা খুবই আনন্দিত ও মত্ত হয়ে উঠে। কিন্তু অবশেষে তা শুষ্ক হতে থাকে। প্রথমে পীতবর্ণ হয়, এরপরে সম্পূর্ণ খড়-কুটায় পরিণত হয়। মানুষও তেমনি প্রথমে তরতাজা ও সুন্দর হয়। শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত এরূপই কাটে। অবশেষে যখন বার্ধক্য আসে, তখন দেহের সজীবতা ও সৌন্দর্য সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যায় এবং সবশেষে মরে মাটি হয়ে যায়। দুনিয়ার ক্ষণভঙ্গুরতা বর্ণনা করার পর আবার আসল উদ্দেশ্য- আখেরাতের চিন্তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য আখেরাতের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে, (وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ) অর্থাৎ আখেরাতে মানুষ এ দুটি অবস্থার মধ্যে যে কোন একটির সম্মুখীন হবে। একটি কাফেরদের অবস্থা অর্থাৎ তাদের জন্যে কঠোর আযাব রয়েছে।

অপরটি মুমিনদের অবস্থা; অর্থাৎ তাদের জন্যে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ক্ষমা ও সন্তুষ্টি রয়েছে। এরপর সংক্ষেপে দুনিয়ার স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে, (وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ) অর্থাৎ এসব বিষয় দেখা ও অনুধাবন করার পর একজন বুদ্ধিমান ও চক্ষুষ্মান ব্যক্তি এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে পারে যে, দুনিয়া একটি প্রতারণার স্থল। এখানকার সম্পদ, প্রকৃত সম্পদ নয়, যা বিপদমুহূর্তে কাজে আসতে পারে। অতঃপর আখেরাতের আযাব ও সওয়াব এবং দুনিয়ার ক্ষণভঙ্গুরতার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এরূপ হওয়া উচিত যে, মানুষ দুনিয়ার সুখ ও আনন্দে মগ্ন না হয়ে আখেরাতের চিন্তা বেশী করবে। পরবর্তী আয়াতে তাই ব্যক্ত করা হয়েছে। [ইবনে কাসীর]

سَابِقُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ ۙ اُعِدَّتْ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَ رُسُلِهٖ ؕ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ

২১. তোমরা অগ্রণী হও তোমাদের রবের ক্ষমা ও সে জান্নাত লাভের প্রয়াসে, যা প্রশস্ততায় আসমান ও যমীনের প্রশস্ততার মত, যা প্রস্তুত করা হয়েছে তাদের জন্য যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনে। এটা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছে তিনি এটা দান করেন; আর আল্লাহ্ মহাঅনুগ্রহশীল।

সারমর্ম এই যে, অক্ষমতা ও মৃত্যু আসার আগেই তুমি সৎকাজের পুঁজি সংগ্রহ করে নাও, যাতে জান্নাতে পৌছতে পার। অগ্রে ধাবিত হওয়ার দ্বিতীয় অর্থ এই যে, সৎকাজে অপরের অগ্রণী হওয়ার চেষ্টা কর। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তার উপদেশাবলীতে বলেনঃ তুমি মসজিদে সর্বপ্রথম গমণকারী এবং সর্বশেষ নির্গমণকারী হও। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, সালাতের জামাতে প্রথম তকবিরে উপস্থিত থাকার চেষ্টা কর। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর] জান্নাতের পরিধি প্রসঙ্গে বলা হয়েছেঃ এর প্রস্থ আকাশ ও পৃথিবীর সমান। সূরা আলে-ইমরানে এই বিষয়বস্তুর আয়াতে سموات বহুবচন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, সপ্ত আকাশ ও পৃথিবীর বিস্তৃতি একত্রিত করলে জান্নাতের প্রস্থ হবে। বলাবাহুল্য, প্রত্যেক বস্তুর দৈর্ঘ্য প্রস্থ অপেক্ষা বেশী হয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, জান্নাতের বিস্তৃতি সপ্ত আকাশ ও পৃথিবীর বিস্তৃতির চাইতে বেশী। তাছাড়া عرض শব্দটি কোনো সময় কেবল বিস্তৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়। তখন দৈর্ঘ্যের বিপরীত অর্থ বোঝানো উদ্দেশ্য থাকে না। উভয় অবস্থাতেই জান্নাতের বিশাল বিস্তৃতিই বোঝা যায়। [দেখুন: কুরতুবী]

আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ ও কৃপার বদৌলতেই মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ তোমাদের আমল তোমাদের কাউকে মুক্তি দিতে পারে না। সাহাবায়ে-কেরাম আরয করলেনঃ

আপনিও কি তদ্রূপ? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, আমিও আমার আমল দ্বারা জান্নাত লাভ করতে পারি না-আল্লাহ তা'আলার দয়া ও অনুকম্প হলেই লাভ করতে পারি। [বুখারী: ৫৬৭৩, মুসলিম: ২৮১৬]

তাছাড়া জান্নাত যেমন একমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহে লাভ করা যায় তেমনিভাবে আল্লাহর ইবাদত করার সৌভাগ্য ও আল্লাহর আনুগত্যে প্রতিযোগিতা করার সামর্থ কেবল তাঁরই অনুগ্রহে লাভ করা যায়। তিনি যাকে এ ব্যাপারে সুযোগ দিবেন তিনিই কেবল তা লাভ করতে পারে। সুতরাং তাঁর কাছেই এ ব্যাপারে সার্বক্ষণিক তৌফিক চাইতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুআয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সালাতের পরে এ কথাটি স্মরণ করে বলার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "হে মুআয! আমি তোমাকে ভালবাসি, সুতরাং তুমি সালাতের পরে اللَّهُمَّ أَعِنَّا عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ হে আল্লাহ্! আমাকে আপনার যিকর, শুকর এবং সুন্দর পদ্ধতিতে ইবাদত করার তৌফিক দিন। [আবু দাউদ: ১৫২২]

অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট অসচ্ছল সাহাবীগণ এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! ধনীরা উঁচু মর্যাদা ও স্থায়ী নেয়ামতের অধিকারী হয়ে গেল। রাসূল বললেন, সেটা কি করে? তারা বললেন, আমরা যেমন সালাত আদায় করি তারাও তা করে, আমরা সাওম পালন করি, তারাও করে, অধিকন্তু তারা সাদাকাহ দেয়। কিন্তু আমরা তা দিতে পারি না। তারা দাসমুক্ত করে আমরা তা পারি না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমাদেরকে কি আমি এমন বস্তু বলে দিব না যা করলে তোমরা অন্যদের প্রতিযোগিতায় অগ্রণী হয়ে যাবে? কেউ তোমাদের থেকে শ্রেষ্ঠ হতে পারবেনা। তবে যদি কেউ তোমাদের মত কাজ করে সেটা ভিন্ন কথা। তোমরা প্রতি সালাতের পরে তেত্রিশ বার করে তাসবীহ, তাকবীর ও তাহমীদ করবে। (সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার ও আলহামদুলিল্লাহ পড়বে)। পরবর্তীতে অসচ্ছল সাহাবাগণ ফিরে এসে বললেন, আমাদের পয়সাওয়ালা ভাইরা আমরা যা করছি তা শুনে ফেলেছে এবং তারাও তা করতে আরম্ভ করেছে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। [বুখারী: ৮৪৩, মুসলিম: ৫৯৫]

مَآ اَصَابَ مِنۡ مُّصِیۡبَۃٍ فِی الۡاَرۡضِ وَ لَا فِیۡۤ اَنۡفُسِکُمۡ اِلَّا فِیۡ کِتٰبٍ مِّنۡ قَبۡلِ اَنۡ نَّبۡرَاَهَا ؕ اِنَّ ذٰلِکَ عَلَی اللّٰهِ یَسِیۡرٌ

২২. যমীনে বা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে বিপর্যয়ই আসে তা সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই আমরা তা কিতাবে লিপিবদ্ধ রেখেছি নিশ্চয় আল্লাহর পক্ষে এটা খুব সহজ।

আলোচ্য আয়াতসমূহে এ সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হচ্ছে, যমীনের বুকে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে বিপদাপদ আসে, তা সবই আমি কিতাবে অর্থাৎ লওহে-মাহফুযে জগত সৃষ্টির পূর্বেই লিখে দিয়েছিলাম। যমীনের বুকে সংঘটিত বিপদাপদ বলে দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, ফসলহানি, বাণিজ্যে ঘাটতি, ধন-সম্পদ বিনষ্ট হওয়া, বন্ধু-বান্ধবের মৃত্যু ইত্যাদি এবং ব্যক্তিগত বিপদাপদ বলে সর্বপ্রকার রোগব্যাধি, ক্ষত, আঘাত ইত্যাদি বোঝানো হয়েছে।

لِّكَيۡلَا تَاۡسَوۡا عَلٰی مَا فَاتَکُمۡ وَ لَا تَفۡرَحُوۡا بِمَاۤ اٰتٰىکُمۡ ؕ وَ اللّٰہُ لَا یُحِبُّ کُلَّ مُخۡتَالٍ فَخُوۡرِ

২৩. এটা এ জন্যে যে, তোমরা যা হারিয়েছ তাতে যেন তোমরা বিমর্ষ না হও এবং যা তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন তার জন্য আনন্দিত না হও। নিশ্চয় আল্লাহ পছন্দ করেন না কোন উদ্ধত অহংকারীদেরকে—

আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়াতে মানুষ যা কিছু বিপদ অথবা সুখ, আনন্দ অথবা দুঃখের সম্মুখীন হয়, তা সবই আল্লাহ তা'আলা লাওহে-মাহফুযে মানুষের জন্মের পূর্বেই লিখে রেখেছেন। হাদীসে এসেছে, "আল্লাহ্ তা'আলা আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে যাবতীয় তাকদীর নির্ধারণ করে নিয়েছেন"। [মুসলিম: ২৬৫৩] এ বিষয়ের সংবাদ তোমাদেরকে এ জন্য দেয়া হয়েছে, যাতে তোমরা দুনিয়ার ভাল-মন্দ অবস্থা নিয়ে বেশী চিন্তা-ভাবনা না কর। দুনিয়ার কষ্ট ও বিপদাপদ তেমন আক্ষেপ ও পরিতাপের বিষয় নয় এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং অর্থসম্পদ তেমন উল্লসিত ও মত্ত হওয়ার বিষয় নয় যে, এগুলোতে মশগুল হয়ে তোমরা আল্লাহর স্মরণ ও আখেরাত সম্পর্কে গাফেল হয়ে যাবে। প্রত্যেক মানুষ স্বভাবগতভাবে কোনো কোনো বিষয়ের কারণে আনন্দিত এবং কোনো কোনো বিষয়ের কারণে দুঃখিত হয়। কিন্তু যা উচিত তা এই যে, বিপদের সম্মুখীন হলে সবর করে আখেরাতের পুরস্কার ও সওয়াব অর্জন করতে হবে এবং সুখ ও আনন্দের সম্মুখীন হলে কৃতজ্ঞ হয়ে পুরস্কার ও সওয়াব হাসিল করতে হবে।

এ আয়াতে সুখ ও ধন-সম্পদের কারণে উদ্ধত্য ও অহংকারীদের নিন্দা করা হয়েছে, বলা হয়েছে, আল্লাহ উদ্ধত্য অহংকারীকে পছন্দ করেন না। উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়ার নেয়ামত পেয়ে যারা অহংকার করে, তারা আল্লাহর কাছে ঘৃণার্হ।

الَّذِیۡنَ یَبۡخَلُوۡنَ وَ یَاۡمُرُوۡنَ النَّاسَ بِالۡبُخۡلِ ؕ وَ مَنۡ یَّتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰہَ ہُوَ الۡغَنِیُّ الۡحَمِیۡدُ

২৪. যারা কার্পণ্য করে ও মানুষকে কার্পণ্যের নির্দেশ দেয় এবং যে মুখ ফিরিয়ে নেয় সে জেনে রাখুক নিশ্চয় আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, চির প্রশংসিত।

সে সময় মুসলিম সমাজের মুনাফিকদের যে চরিত্র সবারই চোখে পড়ছিলো এখানে সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। ঈমানের বাহ্যিক স্বীকারোক্তি অনুসারে মুনাফিক ও খাঁটি মুসলমানদের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। কিন্তু নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা না থাকার কারণে খাঁটি ঈমানদারদের যে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছিলো, তারা তাতে শামিল হয়নি। তাই তাদের অবস্থা ছিল এই যে, আরবের অতি সাধারণ একটা শহরে যে নাম মাত্র স্বচ্ছলতা ও পৌরহিত্য তারা লাভ করেছিলো তাতেই তারা যেন গর্বে স্ফীত হয়ে উঠছিলো এবং ফেটে পড়ার উপক্রম হয়েছিলো। তাদের মনের সংকীর্ণতা এমন পর্যায়ের ছিল যে, তারা যে আল্লাহর ওপর ঈমান আনার, যে রসূলের অনুসারী হওয়ার এবং যে দ্বীন মানার দাবী করতো, তার জন্য নিজেরা একটি পয়সাও ব্যয় করবে কি, অন্য দাতাদেরও একথা বলে ব্যয় করা থেকে বিরত রাখতো যে, তোমরা নিজের অর্থ এভাবে অপচয় করছো কেন? স্পষ্ট কথা দুঃখ-কষ্টের উত্তপ্ত কুণ্ডে যদি জ্বালানো না হতো, তাহলে এই কৃত্রিম পদার্থগুলো---যা আল্লাহর কোনা কাজে লাগার মত ছিল না---খাঁটি সোনা থেকে পৃথক করা যেতো না। আর তাকে আলাদা করা ছাড়া দুর্বল ও খাঁটি মুসলমানদের এই সংমিশ্রিত সমাবেশকে দুনিয়ার নেতৃত্বের গুরুত্বপূর্ণ মহান পদটি অর্পণ করা যেতো না, যার বহুবিধ মহতী কল্যাণ খিলাফতে রাশেদার যুগে দুনিয়া অবলোকন করেছিলো।

উপদেশ বাণী শোনার পরও যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর দ্বীনের জন্য আন্তরিকতা, আনুগত্য এবং ত্যাগ ও কুরবানীর পন্থা অবলম্বন না করে এবং নিজের বক্রতা আঁকড়ে ধরে থাকতে চায় যা আল্লাহ অপছন্দ করেন--- তাহলে আল্লাহর তাতে কোন পরোয়া নেই। তিনি অভাব শুন্য, এসব লোকের কাছে তাঁর কোন প্রয়োজন আটকে নেই, আর তিনি অতিশয় প্রশংসিত, তাঁর কাছে উত্তম গুণাবলীর অধিকারী লোকেরাই গ্রহণযোগ্য হতে পার। দুষ্কর্মশীল লোকেরা তাঁর কৃপা দৃষ্টিলাভের উপযুক্ত হতে পারে না।

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَ اَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۚ وَ اَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَاْسٌ شَدِيْدٌ وَّ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَ لِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ وَ رُسُلَهٗ بِالْغَيْبِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ

২৫. অবশ্যই আমরা আমাদের রাসূলগনকে পাঠিয়েছি স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাদের সঙ্গে দিয়েছি কিতাব ও ন্যায়ের পাল্লা, যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে। আমরা আরও নাযিল করেছি লোহা যাতে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি এবং রয়েছে মানুষের জন্য বহুবিধা কল্যাণ। এটা এ জন্যে যে, আল্লাহ প্রকাশ করে দেন কে গায়েব অবস্থায়ও তাকে ও তাঁর রাসূলগণকে সাহায্য করে। নিশ্চয় আল্লাহ মহা শক্তিমান, পরাক্রমশালী।

بينات শব্দের আভিধানিক অর্থ সুস্পষ্ট বিষয়। উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট বিধানাবলীও হতে পারে; তাছাড়া এর উদ্দেশ্য মু'জিযা এবং রেসালতের সুস্পষ্ট প্রমাণাদিও হতে পারে; কারণ পরবর্তী বাক্যে কিতাব নাযিলের আলাদা উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং بينات বলে মু'জিযা ও প্রমাণাদি বোঝানো হয়েছে এবং বিধানাবলীর জন্যে কিতাব নাযিল করার কথা বলা হয়েছে।

আয়াতে কিতাবের ন্যায় মিযানের বেলায়ও নাযিল করার কথা বলা হয়েছে। কিতাব নাযিল হওয়া এবং ফেরেশতার মাধ্যমে নবী-রাসূলগণ পর্যন্ত পৌছা সুবিদিত। কিন্তু মিযান নাযিল করার অর্থ কি? এ সম্পর্কে বিভিন্ন তাফসীরে বিভিন্ন উক্তি এসেছে, কোন কোন মুফাসসির বলেন, মীযান নাযিল করার মানে দাঁড়িপাল্লার ব্যবহার ও ন্যায়বিচার সম্পর্কিত বিধানাবলী নাযিল করা। কারও কারও মতে, প্রকৃতপক্ষে কিতাবই নাযিল করা হয়েছে, কিন্তু এর সাথে দাঁড়িপাল্লা স্থাপন ও আবিষ্কারকে সংযুক্ত করে দেয়া হয়েছে। কাজেই আয়াতের অর্থ যেন এরূপ আমি কিতাব নাযিল করেছি ও দাড়িপাল্লা উদ্ভাবন করেছি। তাছাড়া আয়াতে কিতাব ও মিযানের পর লৌহ নাযিল করার কথা বলা হয়েছে। এখানেও নাযিল করার মানে সৃষ্টি করা হতে পারে। পবিত্র কুরআনের এক আয়াতে চতুষ্পদ জন্তুদের বেলায়ও নাযিল করা শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। [সূরা আয-যুমার: ৬] অথচ চতুষ্পদ জন্তু আসমান থেকে নাযিল হয় না-পৃথিবীতে জন্মলাভ করে। সেখানেও সৃষ্টি করার অর্থ বোঝানো হয়েছে। তবে সৃষ্টি করাকে নাযিল করা শব্দে ব্যক্ত করার মধ্যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, সৃষ্টির বহুপূর্বেই লওহে-মাহফুযে লিখিত ছিল—এ দিক দিয়ে দুনিয়ার সবকিছুই আসমান থেকে অবতীর্ণ। [কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর]

এতে আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্যে বহুবিধ কল্যাণ নিহিত রেখেছেন। দুনিয়াতে যত শিল্প-কারখানা ও কলকজা আবিস্কৃত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে হবে, সবগুলোর মধ্যে লৌহের ভূমিকা সর্বাধিক। লৌহ ব্যতীত কোনো শিল্প চলতে পারে না।

وَ لَقَدۡ اَرۡسَلۡنَا نُوۡحًا وَّ اِبۡرٰهِیۡمَ وَ جَعَلۡنَا فِیۡ ذُرِّیَّتِهِمَا النُّبُوَّۃَ وَ الۡکِتٰبَ فَمِنۡهُمۡ مُّهۡتَدٍ ۚ وَ کَثِیۡرٌ مِّنۡهُمۡ فٰسِقُوۡنَ

২৬. আর অবশ্যই আমরা নূহ এবং ইবরাহীমকে রাসূলরূপে পাঠিয়েছিলাম এবং আমরা তাদের বংশধরগণের জন্য স্থির করেছিলাম নবুওয়াত ও কিতাব, কিন্তু তাদের অল্পই সৎপথ অবলম্বন করেছিল। আর তাদের অধিকাংশই ফাসিক।

আলোচ্য আয়াতসমূহে বিশেষ বিশেষ নবী-রাসূলের আলোচনা করা হচ্ছে। প্রথমে নূহ আলাইহিস সালাম-এর এবং পরে নবী-রাসূলগণের শ্রদ্ধাভাজন ও মানবমণ্ডলীর ইমাম ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর সাথে ঘোষণা করা হয়েছে যে, ভবিষ্যতে যত নবী-রাসূল ও ঐশী কিতাব দুনিয়াতে আগমন করবে, তারা সব এদের বংশধরের মধ্য থেকে হবে। অর্থাৎ, নুহ আলাইহিস সালাম-এর সেই শাখাকে ঐ গৌরব অর্জনের জন্যে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যাতে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম জন্মগ্রহণ করেছেন। এ কারণেই পরবর্তীকালে যত নবী-রাসূল প্রেরিত হয়েছেন এবং যত কিতাব নাযিল করা হয়েছে, তারা সব ছিলেন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর বংশধর। এই বিশেষ আলোচনার পর পরবর্তী নবী-রাসূলগণের পরস্পরকে একটি সংক্ষিপ্ত বাক্যে ব্যক্ত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এরপর তাদের পশ্চাতে একের পর এক আমি আমার নবী-রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি। পরিশেষে বিশেষভাবে বনী-ইসরাঈলের সর্বশেষ রাসূল ঈসা আলাইহিস সালাম-এর উল্লেখ করেছেন যিনি শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার শরীয়ত সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বানী করে গেছেন। [ইবনে কাসীর]

ثُمَّ قَفَّیۡنَا عَلٰۤی اٰثَارِهِمۡ بِرُسُلِنَا وَ قَفَّیۡنَا بِعِیۡسَی ابۡنِ مَرۡیَمَ وَ اٰتَیۡنٰهُ الۡاِنۡجِیۡلَ ۬ۙ وَ جَعَلۡنَا فِیۡ قُلُوۡبِ الَّذِیۡنَ اتَّبَعُوۡهُ رَاۡفَۃً وَّ رَحۡمَۃً ؕ وَ رَهۡبَانِیَّۃَۨ ابۡتَدَعُوۡهَا مَا کَتَبۡنٰهَا عَلَیۡهِمۡ اِلَّا ابۡتِغَآءَ رِضۡوَانِ اللّٰهِ فَمَا رَعَوۡهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا ۚ فَاٰتَیۡنَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا مِنۡهُمۡ اَجۡرَهُمۡ ۚ وَ کَثِیۡرٌ مِّنۡهُمۡ فٰسِقُوۡنَ

২৭. তারপর আমরা তাদের পিছনে অনুগামী করেছিলাম আমাদের রাসূলগণকে এবং অনুগামী করেছিলাম মার্‌ইয়াম-তনয় ঈসাকে, আর তাকে আমরা দিয়েছিলাম ইঞ্জীল এবং তার অনুসারীদের দিয়েছিলাম করুণা ও দয়া। আর সন্ন্যাসবাদী—এটা তো তারা নিজেরাই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য প্রবর্তন করেছিল। আমরা তাদেরকে এটার বিধান দেইনি; অথচ এটাও ওরা যথাযথভাবে পালন করেনি। অতঃপর তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছিল, তাদেরকে আমরা দিয়েছিলাম তাদের পুরস্কার। আর তাদের অধিকাংশই ছিল ফাসিক।

এখানে ঈসা আলাইহিস সালাম-এর প্রতি ঈমান আনয়নকারী হাওয়ারীগণের বিশেষ গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, যারা ঈসা আলাইহিস সালাম অথবা ইঞ্জিলের অনুসরণ করেছে, আমি তাদের অন্তরে স্নেহ ও দয়া সৃষ্টি করে দিয়েছি। তারা একে অপরের প্রতি দয়া ও করুণাশীল কিংবা সমগ্র মানবমণ্ডলীর প্রতি তারা অনুগ্রহশীল। এখানে ঈসা আলাইহিস সালাম-এর সাহাবী তথা হাওয়ারিগণের দুটি বিশেষ গুণ উল্লেখ করা হয়েছে; তা হচ্ছে, দয়া ও করুণা। এরপর তাদের আরেকটি অভ্যাস বর্ণিত হয়েছে যা তারা আবিস্কার করে নিয়েছিল। আর যা আল্লাহ তাদের উপর আবশ্যিক করে দেন নি। আর সেটা হচ্ছে, সন্যাসবাদ। [কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর]

رهبانية শব্দটি رهبان এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত। এর অর্থ যে অতিশয় ভয় করে। বলা হয়ে থাকে যে, ঈসা আলাইহিস সালাম-এর পর বনী-ইসরাঈলের মধ্যে পাপাচার ব্যাপকাকারে ছড়িয়ে পড়ে বিশেষতঃ রাজন্যবর্গও শাসকশ্রেণী ইঞ্জীলের বিধানাবলীর প্রতি প্রকাশ্যে বিদ্রোহ শুরু করে দেয়। বনী-ইসরাঈলের মধ্যে কিছু সংখ্যক খাঁটি আলেম ও সৎ কর্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। তারা এই প্রবণতাকে রুখে দাড়ালে তাদেরকে হত্যা করা হয়। যে কয়েকজন প্রাণে বেঁচে গেলেন তারা দেখলেন যে, মোকাবেলার শক্তি তাদের নেই। কিন্তু এদের সাথে মিলে-মিশে থাকলে তাদের দ্বীন-ঈমান বরবাদ হয়ে যাবে। তাই তারা স্বতঃ প্রণোদিত হয়ে নিজেদের জন্যে জরুরি করে নিলেন যে, তারা এখন থেকে বৈধ আরাম-আয়েশও বিসর্জন দিবেন, বিবাহ করবেন না, খাওয়া-পরা এবং ভোগ্যবস্তু সংগ্রহ করার চিন্তা করবেন না, বসবাসের জন্য গৃহ নির্মাণে যত্নবান হবেন না, লোকালয় থেকে দূরে কোনো জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ে জীবন অতিবাহিত করবেন।

অথবা যাযাবরদের ন্যায় ভ্রমণ ও পর্যটনে জীবন কাটিয়ে দিবেন যাতে দ্বীনের বিধিবিধান স্বাধীন ও মুক্ত পরিবেশে পালন করা যায়। তারা আল্লাহর ভয়ে এই কর্ম পন্থা অবলম্বন করেছিলেন, তাই তারা رهبان তথা সন্ন্যাসী নামে অভিহিত হলো এবং তাদের উদ্ভাবিত মতবাদ رهبانية তথা সন্ন্যাসবাদ নামে খ্যাতি লাভ করে। [কুরতুবী] আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাদের এ কাজের সমালোচনা করেছে; কারণ তারা নিজেরাই নিজেদের উপর ভোগ বিলাস বিসর্জন দেয়া অপরিহার্য করে নিয়েছিল-আল্লাহর পক্ষ থেকে ফরয করা হয়নি। এভাবে তারা নিজেদেরকে শরীয়ত প্রবর্তকের ভূমিকায় অবতীর্ণ করেছিল। যা স্পষ্টত: পথভ্রষ্টতা। [ফাতহুল কাদীর]

মোটকথা: সন্যাসবাদ কখনও আল্লাহর নৈকট্যের মাধ্যম ছিল না। এটা এ শরীয়তেও জায়েয নেই। হাদীসে এসেছে, একবার উসমান ইবনে মাযউন রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর স্ত্রী খাওলা বিনতে হাকীম আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে খুব খারাপ বেশে প্রবেশ করলে তিনি বললেন, তোমার এ অবস্থা কেন? তিনি বললেন, আমার স্বামী সারা রাত দাঁড়িয়ে ইবাদত করে আর সারাদিন সাওম পালন করে, ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে প্রবেশ করলে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসূলের কাছে এ ঘটনা বিবৃত করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উসমানের সাথে সাক্ষাত করে তাকে বললেন, হে উসমান! আমাদের উপর সন্যাসবাদ লিখিত হয়নি। তুমি কি আমাকে আদর্শ মনে কর না? আল্লাহর শপথ আমি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী আল্লাহকে ভয় করি এবং তাঁর শরীয়তের সীমারেখার বেশী হেফাজতকারী। [মুসনাদে আহমাদ: ৬/২২৬]

তারা দ্বিবিধ ভ্রান্তিতে ডুবে আছে। একটি ভ্রান্তি হচ্ছে তারা নিজেদের ওপর এমন সব বাধ্যবাধকতা আরোপ করে নিয়েছিল যা করতে আল্লাহ কোন নির্দেশ দেননি। দ্বিতীয় ভ্রান্তি হচ্ছে নিজেদের ধারণা মতে যেসব বাধ্য বাধকতাকে তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির উপায় বলে মনে করে নিজেদের ওপর আরোপ করে নিয়েছিলো তাঁর হক আদায় করেনি এবং এমন সব আচরণ করেছে যার দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টির পরিবর্তে তাঁর গযব খরিদ করে নিয়েছে।

يَاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اٰمِنُوۡا بِرَسُوۡلِهٖ يُؤۡتِكُمۡ كِفۡلَيۡنِ مِنۡ رَّحۡمَتِهٖ وَ يَجۡعَلۡ لَّكُمۡ نُوۡرًا تَمۡشُوۡنَ بِهٖ وَ يَغۡفِرۡ لَكُمۡ ؕ وَ اللّٰهُ غَفُوۡرٌ رَّحِيۡمٌ

২৮. হে মুমিনগণ! আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং তার রাসূলের উপর ঈমান আন। তিনি তার অনুগ্রহে তোমাদেরকে দেবেন দ্বিগুণ পুরস্কার এবং তিনি তোমাদেরকে দেবেন নূর, যার সাহায্যে তোমরা চলবে। এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

এই আয়াতে ঈসা আলাইহিস সালাম-এর প্রতি ঈমানদার কিতাবী মুমিনগণকে সম্বোধন করা হয়েছে। যদিও (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) বলে কেবল মুসলিমগণকে সম্বোধন করাই পবিত্র কুরআনের সাধারণ রীতি। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে এই সাধারন রীতির বিপরীতে নাসারাদের জন্য (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। সম্ভবতঃ এর রহস্য এই যে, পরবর্তী বাক্যে তাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি ঈমান আনার আদেশ দেয়া হয়েছে। কারণ, এটাই ঈসা আলাইহিস সালাম-এর প্রতি বিশুদ্ধ ঈমানের দাবী। তারা যদি তা করে, তবে তারা উপরোক্ত সম্বোধনের যোগ্য হয়ে যাবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে তাদেরকে দ্বিগুণ পুরস্কার ও সওয়াব দানের ওয়াদা করা হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর; কুরতুবী]

পৃথিবীতে জ্ঞান ও দূরদৃষ্টির এমন 'নূর' দান করবেন যার আলোতে তোমরা প্রতি পদক্ষেপে স্পষ্ট দেখতে পাবে জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে জাহেলিয়াতের বাঁকা পথ -সমূহের মধ্যে ইসলামের সরল সোজা পথ কোনটি। আর আখেরাতে এমন 'নূর' দান করবেন যার মাধ্যমে পুল সিরাতের অন্ধকার রাস্তা পার হয়ে জান্নাতে যেতে পারবে।

لِّئَلَّا يَعۡلَمَ اَهۡلُ الۡكِتٰبِ اَلَّا يَقۡدِرُوۡنَ عَلٰى شَىۡءٍ مِّنۡ فَضۡلِ اللّٰهِ وَ اَنَّ الۡفَضۡلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤۡتِيۡهِ مَنۡ يَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ ذُو الۡفَضۡلِ الۡعَظِيۡمِ

২৯. এটা এজন্যে যে, কিতাবীগণ যেন জানতে পারে, আল্লাহর সামান্যতম অনুগ্রহের উপরও ওদের কোন অধিকার নেই। আর নিশ্চয় অনুগ্রহ আল্লাহরই ইখতিয়ারে, যাকে ইচ্ছে তাকে তিনি তা দান করেন। আর আল্লাহ্ মহাঅনুগ্রহশীল।

কিতাবীগণ যেন জানতে পারে, আল্লাহ তা'আলার সামান্যতম অনুগ্রহের ওপরও তাদের কোন অধিকার নেই। সকল অনুগ্রহ আল্লাহ তা'আলার হাতে, তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। সুতরাং তোমাদের ওপর উম্মাতে মুহাম্মাদীকে বেশি মর্যাদা দেওয়া হয়েছে এতে হিংসা-বিদ্বেষের কোন কারণ নেই। হাদীসে এসেছে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন : তোমাদের পূর্বে যারা বসবাস করেছে তাদের তুলনায় দুনিয়াতে তোমাদের অবস্থান হল তেমন আছরের পর থেকে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত যতটুকু সময়। তাওরাত ধারীদেরকে তাওরাত প্রদান করা হয়েছে তারা তাওরাত অনুযায়ী অর্ধদিন আমল করেছে, তারপর আমল করতে অপারগ হয়ে গেছে। ফলে তাদের আমলের বিনিময়ে এক কিরাত পারিশ্রমিক প্রদান করা হয়েছে। তারপর ইঞ্জিল ধারীদেরকে ইঞ্জিল প্রদান করা হয়েছে, তারা ইঞ্জিল অনুপাতে আছর পর্যন্ত আমল করেছে, তারপর অপারগ হয়ে গেছে। ফলে তাদের পারিশ্রমিক এক কিরাত প্রদান করা হয়েছে। তারপর তোমাদেরকে কুরআন প্রদান করা হয়েছে, তোমরা কুরআন অনুপাতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আমল করেছ। ফলে তোমাদেরকে দু কিরাত পারিশ্রমিক প্রদান করা হয়েছে। তাওরাতধারীরা বলল : হে আমাদের প্রভু! তারা কম সময় আমল করেছে, কিন্তু প্রতিদান পেয়েছে

বেশি। আল্লাহ তা'আলা বললেন : তোমাদের ওপর কি জুলুম করা হয়েছে। তারা বলল : না, আল্লাহ তা'আলা বললেন : এটা হল আমার অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা আমি তা দিয়ে থাকি। (সহীহ বুখারী হা. ৭৪৬৭)

উম্মাতে মুহাম্মাদীর মু'মিন ব্যক্তিরা কম সময় আমল করবে কিন্তু তাদের প্রতিদান পূর্ববর্তী আহলে কিতাবদের চেয়ে অনেক বেশি। সুতরাং আমাদের এ নেয়ামতের প্রশংসাসহ বেশি বেশি সৎআমল করা উচিত।

ফুটনোট

◘ অতিরিক্ত দুনিয়াপ্রীতি ও পার্থিব জীবনের প্রতি মোহ মানুষকে প্রতারিত করে। এই জীবনের মোহে একবার জড়িয়ে পড়লে তা থেকে বেরিয়ে আসা কঠিন। এমন সময় মানুষ সম্বিত ফিরে পায় যখন আর কিছু করার থাকে না।

◘ আল্লাহ ও ধর্মবিহীন জীবন শিশুকালের খেলাধুলার সমতুল্য; যদিও এই খেলার খেলোয়াড়েরা প্রাপ্তবয়স্ক।

◘ পার্থিব জীবন সবাই কমবেশি উপভোগ করে। কিন্তু একজন ঈমানদার মানুষের উপভোগ হয় আল্লাহ নির্দেশিত পথে। এই দুনিয়া কারো জন্য পরিপূর্ণতা অর্জন করে জান্নাত লাভের মাধ্যম আবার কারো জন্য প্রতারিত হয়ে জাহান্নামের অতল গহ্বরে হারিয়ে যাওয়ার উপকরণ।

◘ আখেরাতে মানুষ এ দুটি অবস্থার মধ্যে যে কোন একটির সম্মুখীন হবে। একটি কাফেরদের অবস্থা অর্থাৎ তাদের জন্যে কঠোর আযাব রয়েছে। অপরটি মুমিনদের অবস্থা; অর্থাৎ তাদের জন্যে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ক্ষমা ও সন্তুষ্টি রয়েছে।

◘ দুনিয়ার জীবনের উপমা হলো বৃষ্টি, যার উৎপন্ন শস্য-সম্ভার কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে, তারপর সেগুলো শুকিয়ে যায়, ফলে আপনি ওগুলো পীতবর্ণ দেখতে পান, অবশেষে সেগুলো খড়-কুটায় পরিণত হয়।

◘ ২০ নং আয়াতে - পার্থিব জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যা কিছু হয় এবং যাতে দুনিয়াদার ব্যক্তি মগ্ন ও আনন্দিত থাকে, প্রথমে সেগুলো ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। পার্থিব জীবনের মোটামুটি বিষয়গুলো যথাক্রমে এইঃ প্রথমে ক্রীড়া, এরপর কৌতুক, এরপর সাজ-সজ্জা, এরপর পারস্পরিক অহমিকা, এরপর ধন ও জনের প্রাচুর্য নিয়ে পারস্পরিক গর্ববোধ।

◘ দুনিয়াপূজারিরা সম্পদ ও ক্ষমতা লাভের জন্য পরস্পরে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হলেও ঈমানদার ব্যক্তিরা সৎ কাজ ও নেক আমল করার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করে।

◘ দু'টি কারণে ঈমানদার মানুষেরা জান্নাত লাভ করবেন। এর একটি হলো আল্লাহর মাগফেরাত যার কারণে তিনি মানুষকে ক্ষমা করে দেবেন এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে তাঁর অনুগ্রহ যার কারণে তিনি মানুষের নেক আমলগুলোকে বহুগুণে বৃদ্ধি করে তার প্রতিদান দেবেন।

◘ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসহীন মানুষই কেবল কঠিন পরিস্থিতিতে হতাশ এবং সুখের দিনে উল্লাস ও অহংকার করে। পক্ষান্তরে ঈমানদার মানুষ কঠিন পরিস্থিতিতে ধৈর্যধারণ এবং সুখের দিনে আল্লাহর শোকর আদায় করে।

◘ স্বাভাবিক আনন্দ প্রকাশ কিংবা দুঃখ পাওয়া দোষণীয় কিছু নয় কিন্তু অতীত নিয়ে অযথা অনুশোচনা করা অথবা যা আছে তা নিয়ে উল্লাস ও অহংকার করা গুনাহের কাজ।

◘ নিজে কৃপণ হওয়ার চেয়েও বড় অপরাধ হলো অন্যকে কার্পণ্য করতে উৎসাহিত করা। এ কারণে নবী-রাসুলগণ কৃপণ ব্যক্তিদের সঙ্গে ওঠাবসা করতে এবং তাদের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।

◘ ধন-সম্পদ অর্জন করার পর তা থেকে কতটা দ্বীনের রাস্তায় খরচ করছি সেটা গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীতে বহু সম্পদশালী মানুষ আছে যারা কৃপণ আবার অনেক দরিদ্র মানুষ আছে যারা উদারহস্ত।

◘ ২৫ নং আয়াতে কিতাব ও মিযানের পর লৌহ নাযিল করার কথা বলা হয়েছে।

◘ হাদীদ শব্দটি কুরআনে ৬ জায়গায় ব্যবহার হয়েছে। সূরা ইসরার ৫০ নম্বর, সূরা কাহফের ৯৬ নম্বর, সূরা হাজ্জের ২১ নম্বর, সূরা সাবার ১০ নম্বর, সূরা ক্বাফের ২২ নম্বর এবং সূরা হাদীদের ২৫ নং আয়াত। প্রত্যেকটিতেই লোহার উপরকরণ অর্থে ব্যবহার হয়েছে। তবে সূরা ক্বাফের আয়াতে প্রত্যক্ষ করা অর্থে ব্যবহার হয়েছে।

◘ মানুষের জীবন-যাপনে লোহার অনেক উপকারিতা রয়েছে, যেমন লোহা দ্বারা কৃষি কাজের উপকরণ তৈরি করা, দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত দা, চাকু ইত্যাদি তৈরি করা। যুদ্ধ-জিহাদের অস্ত্র তৈরি হয় এ লোহা দ্বারাই।

◘ নবী-রাসূলগণ মানুষকে গুনাহ ও জুলুম পরিহার করে নেক কাজ করার জন্য জোর-জবরদস্তি করতেন না। তাঁরা বরং সত্য ও মিথ্যার মানদণ্ডগুলো তাদের সামনে স্পষ্ট করে দিতেন যাতে মানুষ তার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দিয়ে তাদের কাঙ্ক্ষিত পথ বেছে নিতে পারে।

◘ মানুষকে সৎপথ প্রদর্শনের পাশাপাশি নবী-রাসূলদের অন্যতম দায়িত্ব ছিল সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা।

◘ নূহ (আঃ) ও ইবরাহীম (আঃ)-এর পর যত কিতাব নাযিল ও নাবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন সকলেই তাদের উভয়ের বংশধর থেকে এসেছেন। নূহ (আঃ)-এর প্লাবনের পর দুনিয়াতে মু'মিন ছাড়া কেউ ছিল না। তাই সকল মু'মিনকে নূহ (আঃ)-এর বংশধরের মধ্যে শামিল করা হয়। আর ইবরাহীম (আঃ)-এর দু' ছেলে ইসহাক ও ইসমাঈল (আঃ) উভয়ে নাবী ছিলেন। তার মধ্যে ইসহাক (আঃ) থেকে ইয়াকূব, ইয়াকূব থেকে ইউসুফ এভাবে বানী ইসরাঈলের সকল নাবীগণ আগমন করেছেন আর ইসমাঈল (আঃ) থেকে কেবল নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আগমন করেছেন।

◘ দ্বীনের ভেতরে নিজের মনগড়া কিছু তৈরি করা বিদ'আত। যদিও তা নিজের কাছে ভাল লাগে। বিদআতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি হাসিল করা যায় না।

◘ দ্বীনের ভেতর কোন বাড়াবাড়ি নেই। যারাই দীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি করবে দীন তাদের ওপর জয় লাভ করবে।

◘ ইসলামে বৈরাগ্যবাদের কোন স্থান নেই।

◘ আল্লাহ তা'আলা ও নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওপর সঠিক ঈমান এনে আল্লাহ তা'আলার আদেশ পালন ও নিষেধ বর্জন করত তাঁকে যথাযথ ভয় করে চললে দ্বিগুণ প্রতিদান, সঠিক পথে চলতে পারলে আলোকবির্তকা ও অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন।

◘ সকল নেয়ামত ও অনুগ্রহের মালিক একমাত্র আল্লাহ তা'আলা।

◘ উম্মাতে মুহাম্মাদীর অন্যতম একটি ফযীলত হল তারা সকল উম্মতের চেয়ে বেশি মর্যাদাবান, তারা কম সময় আমল করেও বেশি সময় আমলকারীদের চেয়ে অনেক বেশি প্রতিদান পাবে।

কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২৪
প্রস্তুতি সহায়ক তাফসীর নোট পর্বঃ ১৭

সূরা সফ (১-৯ আয়াত)

সূরা আস-সাফ কুরআনের ৬১ তম সূরা, এর আয়াত সংখ্যা ১৪ এবং রূকু সংখ্যা ২। সূরা আস-সাফ মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। 'সফ' মানে হচ্ছে কাতারবদ্ধ বা সারিবদ্ধতা।

নামকরণ

সূরার চতুর্থ আয়াতের يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا আয়াতাংশ থেকে এর নাম গৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ এটি সেই সূরা যাতে 'সফ' শব্দটি আছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

কোন নির্ভরযোগ্য বর্ণনা থেকে এর নাযিল হওয়ার সময়-কাল জানা যায় না। কিন্তু এর বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে অনুমান করা যায় যে, সূরাটি সম্ভবত ওহোদ যুদ্ধের সমসাময়িককালে নাযিল হয়ে থাকবে। কারণ এর মধ্যে যেসব পরিবেশ-পরিস্থিতির প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। তা সেই সময়ের সাথেই সংশ্লিষ্ট।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এ সূরার বিষয়বস্তু হলো ঈমানের ব্যাপারে মুসলমানদেরকে নিষ্ঠা ঐকান্তিকতা অবলম্বন এবং আল্লাহর পথে জীবন কুরবানী করতে উদ্ধুদ্ধ করা। এতে দুর্বল ঈমানের মুসলমানদেরও সম্বোধন করা হয়েছে। যারা ঈমানের মিথ্যা দাবি করে ইসলামে প্রবেশ করেছিল তাদেরকেও সম্বোধন করা হয়েছে আবার যারা ঈমানের ব্যাপারে একনিষ্ঠ ছিল তাদেরকেও সম্বোধন করা হয়েছে। কোন কোন আয়াতে শুধু প্রথম দুটি শ্রেণীকে সম্বোধন করা হয়েছে। কোন কোন আয়াতে শুধু মুনাফিকদের সম্বোধন করা হয়েছে। আবার কোন কোন আয়াতে নিষ্ঠাবান মু'মিনদের প্রতি লক্ষ্য করে কথা বলা হয়েছে। কোন স্থানে কাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য পেশ করা হয়েছে তা বক্তব্যের ধরণ থেকেই বুঝা যায়।

শুরুতে সমস্ত ঈমানদারদের এই মর্মে সাবধান করা হয়েছে যে, যারা বলে এক কথা কিন্তু করে অন্য রকম কাজ, তারা আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে অত্যন্ত ঘৃণিত। আর যারা ন্যায়ের পথে লড়াই করার জন্য মজবুত প্রাচীরের মত দুর্ভেদ্য হয়ে দাঁড়ায় আল্লাহ তা'আলার নিকট তারা অত্যন্ত প্রিয়।

৫ থেকে ৭ আয়াতে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মাতের লোকদেরকে সাবধান করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে বনী ইসরাঈল জাতি মূসা (আ) এবং ঈসা আলাইহিস সালামের সাথে যে আচরণ করেছে তোমাদের রসূল এবং তোমাদের দ্বীনের সাথে তোমাদের আচরণ সেই রকম হওয়া উচিত নয়। হযরত মুসা(আ) আল্লাহর রসূল একথা জানা সত্ত্বেও তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন তারা তাঁকে কষ্ট-যন্ত্রণা দিয়েছে এবং হযরত ঈসার (আ) কাছ থেকে স্পষ্ট নির্দেশনাবলী দেখতে পাওয়ার পরও তাকে অস্বীকার করা থেকে বিরত হয়নি। এর ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, ঐ জাতির লোকদের মেজাজের ধরন-প্রকৃতিই বাঁকা হয়ে গিয়েছে এবং হিদায়াত লাভের তাওফিক বা শুভবুদ্ধি থেকে তারা বঞ্চিত হয়েছে। এটা এমন কোন বাঞ্ছনীয় বা ঈর্ষনীয় অবস্থা নয় যে, অন্য কোন জাতি তা লাভের জন্য উদগ্রীব হবে।

এরপর ৮ ও ৯ আয়াতে চ্যালেঞ্জ করে ঘোষণা করা হয়েছে যে, ইহুদী ও খৃস্টান এবং তাদের সাথে ষড়যন্ত্রকারী মুনাফিকরা আল্লাহর এই নূরকে নিভিয়ে দেয়ার যতই চেষ্টা-সাধনা করুক না কেন তা পুরা শানশওকতের সাথে গোটা পৃথিবীতে অবশ্যই বিস্তার লাভ করবে। মুশরিকরা যতই অপছন্দ করুক না কেন আল্লাহর মহান রসূলের আনীত দ্বীন বা জীবনব্যবস্থা অন্য সব জীবনব্যবস্থার বিরুদ্ধে অবশ্যই বিজয়ী হবে।

অতপর ১০ থেকে ১৩ পর্যন্ত আয়াতে ঈমানদারদের বলা হয়েছে যে, দুনিয়া এবং আখেরাতে সফলতা লাভের পথ মাত্র একটি। তা হলো খাঁটি ও সরল মনে আল্লাহ তার রসূলের ওপর ঈমান আনো এবং জান-মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করো। এর ফল হিসেবে আখেরাতে পাবে আল্লাহর আযাব থেকে মুক্তি, গোনাহসমূহের মাগফিরাত এবং চিরদিনের জন্য জান্নাত। আর দুনিয়াতে পুরষ্কার হিসেবে পাবে আল্লাহর সাহায্য সহযোগিতা এবং বিজয় ও সফলতা।

সূরার শেষে ঈমানদারদের বলা হয়েছে যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে তাঁর হাওয়ারী বা সাহায্যকারীরা আল্লাহর পথে যেভাবে সহযোগিতা করেছে তারাও যেন অনুরূপভাবে 'আনসারুল্লাহ' বা আল্লাহর সাহায্যকারী হয়ে দাঁড়ায় যাতে ইতিপূর্বে ঈমান আনয়নকারি গণ যেভাবে আল্লাহর সাহায্য-সহযোগিতা লাভ করেছিলেন তারাও কাফেরদের বিরুদ্ধে তেমনি সাহায্য সহযোগিতা লাভ করতে পারে।

সূরার ফযীলত

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "আমরা একদা পরস্পর আলোচনা করছিলাম যে, আমাদের মধ্যে কেউ যদি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করতো যে, আল্লাহ তা'আলার নিকট কোন আমল সবচেয়ে প্রিয়? কিন্তু তখনো কেউ দাঁড়ায়নি, ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দূত আমাদের নিকট আসলেন এবং এক এক করে প্রত্যেককে ডেকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট নিয়ে গেলেন। আমরা সবাই একত্রিত হলে তিনি এই পূর্ণ সূরাটি আমাদেরকে পাঠ করে শুনালেন।" [এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন] [তিরমিযী হা. ৩৩০৯, সনদ সহীহ]

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الۡاَرۡضِ ۚ وَ هُوَ الۡعَزِیۡزُ الۡحَکِیۡمُ

১. আসমানসমূহে যা কিছু আছে এবং যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। আর তিনি প্রবলপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

'সৃষ্টি জগতের প্রতিটি জিনিস আল্লাহ তাআলার তাসবীহ পাঠ করে (অর্থাৎ পবিত্রতা ঘোষণা করে)' এ কথাটি পূর্বে একাধিক সূরায় উল্লেখ হয়েছে, যেমন সূরা নূর (২৪ : ৩৬, ৪১) ও সূরা হাশর (৫৯ : ২৪)। সূরা বনী ইসরাঈল (১৭ : ৪৪)-এ আল্লাহ তাআলা বলেছেন, তোমরা তাদের তাসবীহ বুঝতে পার না। পূর্বে সূরা হাদীদ (৫৭), সূরা হাশর (৫৯) এবং সামনে সূরা জুমুআ (৬২) ও সূরা তাগাবুন (৬৪)-কে আল্লাহ তাআলা এই সত্য বর্ণনার মাধ্যমেই শুরু করেছেন যে, সবকিছুই আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে।

এটা ভাষণের সংক্ষিপ্ত ভূমিকা। এ ধরনের ভূমিকা দিয়ে বক্তব্য শুরু করার কারণ হলো, পরে যা বলা হবে তা শোনা বা পড়ার আগে মানুষ যাতে একথা ভালভাবে বুঝে নেয়, যে আল্লাহ তা'আলা অভাবহীন এবং অমুখাপেক্ষী।

তাঁর প্রতি কারো ঈমান আনা, সাহায্য করা এবং ত্যাগ ও কুরবানী করার ওপর তাঁর কর্তৃত্ব নির্ভরশীল নয়। তিনি এর অনেক ঊর্ধ্বে। তিনি যখন ঈমান গ্রহণকারীদের ঈমানের ব্যাপারে একনিষ্ঠ হওয়ার শিক্ষা দেন এবং বলেন সত্যকে উন্নতির করা জন্য জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করো তখন এ সব তাদের নিজেদের কল্যাণের জন্যই বলেন। তাঁর ইচ্ছা তাঁর নিজের শক্তি ও ব্যবস্থাপনার সাহায্যেই বাস্তব রূপ লাভ করে। কোন বান্দা তাঁর ইচ্ছা বাস্তবায়নের সামান্যতম তৎপরতাও যদি না চালায় বরং গোটা পৃথিবী সে পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে বদ্ধপরিকরও হয় তবুও তার নিজের শক্তি ও ব্যবস্থাপনা দ্বারা তা বাস্তবরূপ লাভ করে।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ
২. হে ঈমানদারগণ! তোমরা যা কর না তা তোমরা কেন বল?

আল্লাহ তা'আলা ঐ লোকদের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করছেন যারা এমন কথা বলে যা নিজেরা করে না এবং ওয়াদা করার পর তা পুরো করে না। পূর্বযুগীয় কোন কোন আলেম এই আয়াতকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করে বলেন যে, ওয়াদা পূর্ণ করা সাধারণভাবেই ওয়াজিব। যার সাথে ওয়াদা করে সে তা পূর্ণ করার তাগিদ করুক আর নাই করুক। তারা তাদের দলীল হিসেবে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত এ হাদীসটিও পেশ করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "মুনাফিকের নিদর্শন হলো তিনটি। (এক) ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করবে, (দুই) কথা বললে মিথ্যা বলবে এবং (তিন) তার কাছে আমানত রাখা হলে তা খিয়ানত করবে।" অন্য সহীহ হাদীসে রয়েছেঃ "চারটি অভ্যাস যার মধ্যে আছে সে নির্ভেজাল মুনাফিক। আর যার মধ্যে এগুলোর কোন একটি অভ্যাস রয়েছে তার মধ্যে নিফাক বা কপটতার একটি অভ্যাস রয়েছে যে পর্যন্ত সে তা পরিত্যাগ করে। এগুলোর মধ্যে একটি অভ্যাস হলো ওয়াদা ভঙ্গ করা। শারহে বুখারীর শুরুতে আমরা এই হাদীসগুলো পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করেছি। সুতরাং আল্লাহর জন্যেই সমস্ত প্রশংসা।

এ জন্যেই এখানেও আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা অত্যন্ত জোর দিয়ে বলেনঃ তোমরা যা কর না তোমাদের তা বলা আল্লাহর দৃষ্টিতে অতিশয় অসন্তোষজনক।

আল্লাহ তা'আলা বলেন : (□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□)

তোমরা কি লোকদেরকে সৎকার্যে আদেশ করছ এবং নিজেদেরকে ভুলে যাচ্ছ; অথচ তোমরা কিতাব (তাওরাত) পাঠ কর। তবে কি তোমরা হৃদয়ঙ্গম করছ না?" (সূরা বাকারাহ ২: ৪৪)

আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন : মিরাজের রাতে আমাকে এমন এক জাতির পাশে নিয়ে আসা হল যাদের ঠোঁট আগুনের কাঁচি দিয়ে কাটা হচ্ছে। যখনই কাটা শেষ হয় আবার ঠোট পূর্ণ হয়ে যায়। আমি বললাম তারা কারা হে জিবরীল? তিনি বললেন : তারা হলেন আপনার উম্মতের বক্তাগণ যারা বলত কিন্তু তা করত না, তারা কিতাব পড়তো কিন্তু আমল করতো না। (সিলসিলা সহীহাহ ২৯১, আহমাদ হা. ১১৮০১)

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন : কিছু মু'মিন জিহাদ ফরয হওয়ার পূর্বে বলেছিল আমাদের আশা, আল্লাহ তা'আলা যদি প্রিয় আমলের কথা জানাতেন তাহলে আমরা তা আমল করতাম। আল্লাহ তা'আলা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জানিয়ে দিলেন যে, তাঁর কাছে প্রিয় আমল হল সন্দেহাতীত ঈমান আনা ও কাফিরদের বিরুদ্ধে আল্লাহ তা 'আলার পথে জিহাদ করা। যখন জিহাদের বিধান আসলো তখন অনেক মু'মিন তা অপছন্দ করল এবং তাদের ওপর তা কঠিন হয়ে গেল। আল্লাহ তা'আলা তখন এ কথা বললেন। [ইবনে কাসীর]

মোট কথা, কথার বিপরীত কাজ বা কাজের বিপরীত কথা কোনটিই মু'মিনের বৈশিষ্ট্য নয়, যদিও তা খেলাচ্ছলে হয়। যেমন আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন রবীআহ (রাঃ) বলেন: আমি শিশু থাকা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের নিকট আগমন করলেন। তখন আমি খেলা করার জন্য (বাড়ি থেকে) বের হতে লাগলাম। আমার মা আমাকে বলল : হে আব্দুল্লাহ শোন, আমি তোমাকে একটা জিনিস দেব। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন : তুমি তাকে কী দেওয়ার জন্য ডাকছো? তিনি বললেন : খেজুর। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন : তুমি যদি এরূপ না করতে অর্থাৎ খেজুর না দিতে তাহলে তোমার নামে একটি মিথ্যা লেখা হতো। (আবূ দাঊদ হা. ৪৯৯১, সহীহ)

তারপর আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে তাঁর রাস্তায় জিহাদ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করে বলেন : যারা তাঁর রাস্তায় সীসাঢালা প্রাচীরের মত মজবুত হয়ে সারিবদ্ধভাবে জিহাদ করে তাদেরকে তিনি ভালবাসেন। তাই কাতারবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করা যেমন ফযীলতে পূর্ণ তেমনি যুদ্ধের ময়দানে কাতার থেকে পলায়ন করা বড় ধরণের গুনাহ।

সুতরাং সাবধান! সাধারণ জনগণকে ভাল কথা বলব আর নিজেরা তা করব না-এটা উচিত নয়। এতে দুনিয়াতে যেমন অপমান তেমনি আখিরাতে কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে। [ফাতহুল মাজীদ]

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ

৩. তোমরা যা কর না তোমাদের তা বলা আল্লাহর দৃষ্টিতে খুবই অসন্তোষজনক।

একথাটির একটি সাধারণ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য আছে যা এর শব্দসমূহ থেকেই প্রতিভাত হচ্ছে। এছাড়া একটি বিশেষ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যও আছে যা পরবর্তী আয়াতের সাথে এটিকে মিলিয়ে পড়লে বুঝা যায়। প্রথম উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো, একজন খাঁটি মুসলমানের কথা ও কাজে মিল থাকা উচিত। সে যা বলবে তা করে দেখাবে। আর করার নিয়ত কিংবা সৎ সাহস না থাকলে তা মুখেও আনবে না। এক রকম কথা বলা ও অন্য রকম কাজ করা মানুষের এমন একটি জঘন্য দোষ যা আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে অত্যন্ত ঘৃণিত। যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করার দাবী করে তার পক্ষে এমন নৈতিক দোষ ও বদ স্বভাবে লিপ্ত হওয়া আদৌ সম্ভব নয়। নবী (সা.) ব্যাখ্যা করে বলেছেনঃ কোন ব্যক্তির মধ্যে এরূপ স্বভাব থাকা প্রমাণ করে যে, সে মু'মিন নয় বরং মুনাফিক। কারণ তার এই স্বভাব মুনাফিকির একটি আলামত। একটি হাদীসে নবী (সা.) বলেছেনঃ "চারটি স্বভাব এমন যা কোন ব্যক্তির মধ্যে পাওয়া গেলে সে হবে খাঁটি মুনাফিক। আর যার মধ্যে এর কোন একটি স্বভাব পাওয়া যাবে তা পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফিকীর একটি স্বভাব বিদ্যমান। স্বভাবগুলো হলো, তার কাছে আমানত

রাখা হলে সে খিয়ানত করে, কথা বললে মিথ্যা বলে ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে এবং কারো সাথে ঝগড়া-বিবাদ করলে নৈতিকতা ও দ্বীনদারীর সীমালঙ্ঘন করে। "(বুখারী ও মুসলিম)

ইসলামী ফিকাহ শাস্ত্রবিদগণ এ বিষয়ে মোটামুটি একমত যে, কোন ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সাথে যদি কোন ওয়াদা করে (যেমন কোন জিনিসের মানত করল) কিংবা মানুষের সাথে কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হয় অথবা কারো সাথে কোন বিষয়ে ওয়াদা করে আর তা যদি গোনাহের কাজের কোন প্রতিশ্রুতি বা ওয়াদা না হয় তাহলে পালন করে অবশ্য কর্তব্য। তবে যে কাজের প্রতিশ্রুতি বা ওয়াদা করা হয়েছে তা গোনাহর কাজ হলে সে কাজ করবে না ঠিকই কিন্তু তার বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য কসমের কাফফারা আদায় করতে হবে। সূরা মায়েদার ৮৯ আয়াতে একথাটিই বলা হয়েছে। (আহকামুল কুরআন-জাস্সাস ও ইবনে আরাবী)।

এটা হলো এ আয়াতগুলোর সাধারণ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। এরপর থাকে এর সেই বিশেষ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য যে জন্য এক্ষেত্রে আয়াত কয়টি পেশ করা হয়েছে। পরবর্তী আয়াতটিকে এর সাথে মিলিয়ে পড়লেই সেই বিশেষ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য জানা যায়। যারা ইসলামের জন্য জীবনপাত করার লম্বা লম্বা ওয়াদা করতো কিন্তু চরম পরীক্ষার সময় আসলে জান নিয়ে পালাতো সেই সব বাক্যবাগীশদের তিরষ্কার করাই এর উদ্দেশ্য। দুর্বল ঈমানের লোকদের এই দুর্বলতার জন্য কুরআন মজীদের কয়েকটি স্থানে তাদের সমালোচনা করা হয়েছে। যেসন সূরা নিসার ৭৭ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ তোমরা সেই সব লোকদের প্রতি কি লক্ষ্য করেছ যাদের বলা হয়েছিল, নিজেদের হাতকে সংযত রাখ, নামায কায়েম কর এবং যাকাত দাও। এখন যেই তাদেরকে লড়াই করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে অমনি তাদের একটি দল মানুষকে এমন ভয় করতে আরম্ভ করেছে যা আল্লাহকে করা উচিত, কিংবা তার চেয়েও অধিক। তারা বলেঃ হে আল্লাহ, আমাদের জন্য লড়াইয়ের নির্দেশ কেন লিপিবদ্ধ করে দিলে? আমাদেরকে আরো কিছুদিনের জন্য অবকাশ দিলে না কেন? সূরা মুহাম্মাদের ২০ আয়াতে বলেছেনঃ যারা ঈমান এনেছে তারা বলেছিল, এমন কোন সূরা কেন নাযিল হচ্ছে না (যার মধ্যে হুকুম থাকবে), কিন্তু যখন একটি সুস্পষ্ট অর্থবোধক সূরা নাযিল করা হলো যাতে যুদ্ধের উল্লেখ ছিল তখন তোমরা দেখলে যাদের মনে রোগ ছিল তারা তোমাদের দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছে যেন কাউকে মৃত্যু আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। বিশেষ করে ওহোদ যুদ্ধের সময় এসব দুর্বলতা প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছিল। সূরা আলে ইমরানের ১৩ থেকে ১৭ রুকূ পর্যন্ত একাধারে এ বিষয়ের প্রতিই ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। [তাফহীমুল কুরআন]

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ

৪. নিশ্চয় যারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে। সারিবদ্ধভাবে সুদৃঢ় প্রাচীরের মত, আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন।

এর দ্বারা প্রথমত জানা গেল যে, কেবল সেই ঈমানদারই আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনে সফল হয় যারা তাঁর পথে মরণপণ করে কাজ করতে এবং বিপদ আপদ মাথা পেতে নিতে প্রস্তুত থাকে। দ্বিতীয়ত, জানা গেল যে, আল্লাহ যে সেনাদলকে পছন্দ করেন তার মধ্যে তিনটি গুণ থাকা আবশ্যক।

এক, তারা বুঝে শুনে ভালভাবে চিন্তা-ভাবনা করে আল্লাহর পথে লড়াই করবে এবং এমন কোন পথে লড়াই করবে না যা ফী সাবীলিল্লাহ, অর্থাৎ আল্লাহর পথের সংজ্ঞায় পড়ে না।

দুই, তারা বিচ্ছিন্নতা ও শৃঙ্খলাহীনতার শিকার হবে না, বরং মজবুত সংগঠন সুসংহত অবস্থায় কাতারবন্দী বা সুশৃঙ্খল হয়ে লড়াই করবে।
তিন, শত্রুর বিরুদ্ধে তার অবস্থা হবে, "সুদৃঢ় দেয়ালের" মত।

এই শেষ গুণটি আবার অর্থের দিক থেকে অত্যন্ত ব্যাপক। যুদ্ধের ময়দানে কোন সেনাবাহিনীই ততক্ষণ পর্যন্ত সুদৃঢ় দেয়ালের মত দুর্ভেদ্য হয়ে দাঁড়াতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার মধ্যে নিম্নবর্ণিত গুণাবলী সৃষ্টি না হবেঃ

- আকীদা-বিশ্বাস এবং উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের মধ্যে পূর্ণ ঐক্য। এ গুণটিই কোন সেনাবাহিনীর প্রতিটি সৈনিক অফিসারকে পূর্ণরূপে ঐক্যবদ্ধ করে।
- পরস্পরের নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার ওপর আস্থা। প্রকৃতপক্ষে সবাই নিজ নিজ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে নিষ্ঠাবান এবং অসদুদ্দেশ্য থেকে মুক্ত না হলে এ গুণ সৃষ্টি হতে পারে না। আর এ গুণটি যদি সৃষ্টি না হয় তাহলে যুদ্ধের মত কঠিন পরীক্ষা কারো কোন দোষ-ত্রুটি গোপন থাকতে দেয় না। আর আস্থা নষ্ট হয়ে গেলে সেনাবাহিনীর প্রতিটি সদস্য পরস্পরের ওপর নির্ভর করার পরিবর্তে একে অপরকে সন্দেহ করতে শুরু করে।
- নৈতিক চরিত্রের একটি উন্নত মান থাকতে হবে। সেনাবাহিনীর অফিসার এবং সাধারণ সৈনিক যদি সেই মানের নীচে চলে যায় তাহলে তাদের মনে পরস্পরের প্রতি ভালবাসা ও সম্মানবোধ সৃষ্টি হতে পারে না। তারা পারস্পরিক কোন্দল ও দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ থেকেও রক্ষা পেতে পারে না।
- উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের প্রতি এমন অনুরাগ ও ভালবাসা এবং তা অর্জনের জন্য এমন দৃঢ় সংকল্প থাকা চাই যা গোটা বাহিনীর মধ্যে জীবনপাত করার অদম্য আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করে দেবে আর যুদ্ধের ময়দানে তা প্রকৃতই মজবুত দেয়ালের মত দাঁড়িয়ে থাকবে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নেতৃত্বের যে শক্তিশালী সামরিক সংগঠনটি গড়ে উঠেছিল, যার সাথে সংঘর্ষে বড় বড় শক্তি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী কোন শক্তি যার মোকাবিলায় দাঁড়াতে পারেনি এ সব গুণ ও বৈশিষ্ট্য ছিল তার ভিত্তি।

আল্লাহ এই সূরায় সারিবদ্ধ ভাবে লড়াই কারীদের পছন্দ করেন বলে বর্ননা করেছেন। সারিবদ্ধতা শৃঙ্খলার একটি অন্যতম উপাদান। এই সারি বদ্ধভাবে দাড়ানোর বিষয়টা নামাজেও রয়েছে। সুতরাং নামাজ আমাদের সারি বদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করার জন্য তার সৈনিক হিসাবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে। মুমিনদের পথচলার ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষ হিসাবে পাওয়া যাবে ফাসিক (আয়াত ৫), যালিম (আয়াত ৭), কাফির (আয়াত ৮), মুশরিক (আয়াত ৯) দেরকে। তাদের মোকাবেলায় আমাদের মুসলিমদের একতাবদ্ধ হওয়া ছাড়া অন্য উপায় নেই।

وَ اِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ لِمَ تُؤْذُوْنَنِیْ وَ قَدْ تَّعْلَمُوْنَ اَنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ ؕ فَلَمَّا زَاغُوْۤا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ ؕ وَ اللّٰهُ لَا يَهْدِی الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ۟

৫. আর স্মরণ করুন, যখন মূসা তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমাকে কেন কষ্ট দিচ্ছ অথচ তোমরা জান যে, আমি তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র রাসূল অতঃপর

তারা যখন বাঁকা পথ অবলম্বন করল তখন আল্লাহ্‌ তাদের হৃদয়কে বাঁকা করে দিলেন। আর আল্লাহ্‌ ফাসিক সম্প্রদায়কে হেদায়াত করেন না।

যেসব মানুষ ইচ্ছা করে বাঁকা পথে চলতে চায় অথবা তাদেরকে সোজা পথে চালান এবং যারা আল্লাহর নাফরমানী করার জন্য বদ্ধপরিকর তাদেরকে জোর করে হিদায়াত দান করা আল্লাহর নিয়ম বা রীতি নয়। এর দ্বারা একথা আপনা থেকেই স্পষ্ট হয়ে গেল যে, কোন ব্যক্তি বা জাতির গোমরাহীর সূচনা আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয় না বরং স্বয়ং সেই ব্যক্তি বা জাতির পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে। তবে এক্ষেত্রে আল্লাহর নিয়ম বা বিধান হলো, যারা গোমরাহীকে গ্রহণ করে তিনি তাদের জন্য সঠিক পথে চলার উপায়-উপকরণ নয়, বরং গোমরাহীর উপায়-উপকরণেই সরবরাহ করেন যাতে যেসব পথে তারা নিজেদেরকে নিয়ে যেতে চায় সেসব পথে যেন অবাধে যেতে পারে। আল্লাহ তো মানুষকে বাছাই করে নেয়ার স্বাধীনতা (Freeom of choice) দিয়েছেন।

এরপর এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রতিটি মানুষের বা মানুষের দলও গোষ্ঠীর নিজের কাজ যে, তারা তাদের রবের আনুগত্য করবে কি করবে না এবং সঠিক পথ গ্রহণ করবে না বাঁকা পথের কোন একটিতে চলবে। এই বাছাই ও গ্রহণ-বর্জনের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কোন জবরদস্তি নেই। কেউ যদি আনুগত্য ও হিদায়াতের পথ বেছে নেয় তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাকে জোর করে গোমরাহী ও নাফরমানীর পথে ঠেলে দেন না। আর কেউ যদি নাফরমানী করা এবং সঠিক পথ অনুসরণ না করার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে তাহলে তাকে জোর করে আনুগত্য ও হিদায়াতের পথে নিয়ে আসাও আল্লাহর নিয়ম নয়। কিন্তু এটাও একটি বাস্তব ব্যাপার যে, কেউ নিজের জন্য যে পথই বেছে নিক না কেন সে পথে চলার জন্য উপায়-উপকরণ আল্লাহ তা'আলা যতক্ষণ সরবরাহ না করেন এবং অনুকূল অবস্থা ও পরিবেশ-পরিস্থিতি সৃষ্টি না করেন ততক্ষণ পর্যন্ত সে ঐ পথে কার্যত এক পাও অগ্রসর হতে পারে না। এটাই হলো আল্লাহর দেয়া তাওফীক বা আনুকূল্য যার ওপর মানুষের প্রতিটি চেষ্টা-সাধনা ফলপ্রসূ হওয়া নির্ভর করে। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি ভাল কাজের তাওফীক আদৌ না চায় বরং উল্টা মন্দ ও পাপ কাজের তাওফীক চায় তাহলে সে তাই লাভ করবে।

আর যখন সে মন্দ ও পাপ কাজের তাওফীক লাভ করে তখন তার মন-মানসিকতার গোটা ছাঁচ এবং চেষ্টা-সাধনা ও কাজকর্মের পথও বাঁকা হয়ে যেতে থাকে। এমন কি ভাল ও কল্যাণকে গ্রহণ করার ক্ষমতা ও যোগ্যতা ধীরে ধীরে তার মধ্যে থেকে নিঃশেষ হয়ে যায়। "তারা বাঁকা পথ ধরলে আল্লাহও তাদের দিল বাঁকা করে দিল" কথাটির অর্থ এটাই। এ অবস্থায় যে ব্যক্তি নিজে গোমরাহী কামনা করে গোমরাহীর জন্য তৎপর থাকে এবং গোমরাহীতে নিমজ্জিত থেকে অধিকতর গোমরাহীর দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য সমস্ত চিন্তা-ভাবনা ও চেষ্টা-সাধনা নিয়োজিত করে তাকে জোর করে হিদায়াতের দিকে ফিরিয়ে দেয়া আল্লাহর আইন ও নিয়ম-নীতির পরিপন্থী ব্যাপার। কারণ যে পরীক্ষার জন্য মানুষকে দুনিয়ায় বাছাইয়ের স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে এরূপ কাজ সেই উদ্দেশ্য লক্ষ্যকেই নস্যাত করে দেবে।

আর এভাবে হিদায়াত লাভ করে মানুষ সঠিক পথে চললেও সেজন্য তার কোন প্রকার বিনিময় বা উত্তম প্রতিদান লাভের উপযুক্ত বিবেচিত হওয়ারও যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ নেই। এক্ষেত্রে তো বরং যে ব্যক্তি বাধ্যতামূলক হিদায়াত লাভ করেনি এবং গোমরাহীর মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে তারাও কোন প্রকার শাস্তি লাভ না করা উচিত। কারণ এমতাবস্থায় তার গোমরাহীর মধ্য থেকে যাওয়ার সমস্ত দায়-দায়িত্ব আল্লাহর উপরই বর্তায়। সে বরং আখেরাতে জবাবদিহির সময় এ যুক্তি পেশ করতে পারে যে, আপনার কাছে বাধ্যতামূলকভাবে হিদায়াত দান

করার ব্যবস্থা যখন ছিল তখন আপনি আমাকে এই কৃপা থেকে বঞ্চিত রেখেছিলেন কেন? 'আল্লাহ তা'আলা ফাসেকদের হিদায়াত দান করেন না' বাণীটির তাৎপর্য এটাই। অর্থাৎ যেসব মানুষ নিজেরাই তাদের জন্য গোনাহ ও নাফরমানীর পথ বেছে নিয়েছি তিনি তাদেরকে আনুগত্যের পথে চলার 'তাওফীক' দেন না।

মূসা (আঃ) তাঁর কওমকে বলেনঃ "হে আমার কওম! তোমরা তো আমার রিসালাতের সত্যতা সম্পর্কে পূর্ণভাবে অবহিত রয়েছে, এতদসত্ত্বেও কেন তোমরা আমার রিসালাতকে অস্বীকার করে আমাকে কষ্ট দিচ্ছ?" এর দ্বারা যেন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এক দিক দিয়ে সান্ত্বনা দেয়া হচ্ছে। দেখা যায় যে, তাঁকেও যখন মক্কার কাফিররা কষ্ট দেয় তখন তিনি বলেনঃ "আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আঃ)-এর উপর রহম করুন, তাকে তো এর চেয়েও বেশী কষ্ট দেয়া হয়েছিল, কিন্তু এর পরেও তিনি ধৈর্য ধারণ করেছিলেন।" সাথে সাথে মুমিনদেরকে ভদ্রতা শিক্ষা দেয়া হচ্ছে যে, তারা যেন নবী (সঃ)-কে কষ্ট না দেয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেনঃ "হে মুমিনগণ! মূসা (আঃ)-কে যারা ক্লেশ দিয়েছে তোমরা তাদের ন্যায় হয়ো না। তারা যা রটনা করেছিল আল্লাহ তা হতে তাকে নির্দোষ প্রমাণিত করেন এবং আল্লাহর নিকট সে মর্যাদাবান।" (৩৩:৬৯)

وَ اِذۡ قَالَ عِیۡسَی ابۡنُ مَرۡیَمَ یٰبَنِیۡۤ اِسۡرَآءِیۡلَ اِنِّیۡ رَسُوۡلُ اللّٰہِ اِلَیۡکُمۡ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَیۡنَ یَدَیَّ مِنَ التَّوۡرٰىۃِ وَ مُبَشِّرًۢا بِرَسُوۡلٍ یَّاۡتِیۡ مِنۡۢ بَعۡدِی اسۡمُہٗۤ اَحۡمَدُ ؕ فَلَمَّا جَآءَہُمۡ بِالۡبَیِّنٰتِ قَالُوۡا ہٰذَا سِحۡرٌ مُّبِیۡنٌ

৬. আর স্মরণ করুন, যখন মারইয়াম-পুত্র ঈসা বলেছিলেন, হে বনী ইসরাঈল! নিশ্চয় আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর রাসূল এবং আমার পূর্ব থেকে তোমাদের কাছে যে তাওরাত রয়েছে আমি তার সত্যায়নকারী এবং আমার পরে আহমাদ নামে যে রাসূল আসবেন আমি তার সুসংবাদদাতা। পরে তিনি যখন সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ তাদের কাছে আসলেন তখন তারা বলতে লাগল, এটা তো স্পষ্ট জাদু।

ঈসা (আঃ)-এর ঘটনা এই জন্য বর্ণনা করলেন যে, বানী ইস্রাঈলরা যেমন মূসা (আঃ)-এর অবাধ্যতা করেছিল, অনুরূপ তারা ঈসা (আঃ)-কেও অস্বীকার করেছিল। এতে নবী (সাঃ)-কে সান্ত্বনা দেওয়া হচ্ছে যে, এই ইয়াহুদীরা কেবল তোমার সাথেই এইরূপ আচরণ করেনি, বরং তাদের সম্পূর্ণ ইতিহাসই নবীদেরকে মিথ্যাজ্ঞান করাতে ভরপুর। 'তাওরাত'-এর সত্যায়ন বা সমর্থন করার অর্থ হল, আমি যে দাওয়াত দিচ্ছি, সেটা ঐ দাওয়াতই, যা তাওরাতে ছিল। আর এটা প্রমাণ করে যে, যে পয়গম্বর আমার পূর্বে তাওরাত নিয়ে এসেছিলেন এবং আমি ইঞ্জীল নিয়ে এসেছি, আমাদের উভয়েরই মূলসূত্র একটাই। কাজেই যেভাবে তোমরা মুসা, হারূন, দাউদ ও সুলাইমান (আলাইহিমুস্ সালাম) এর উপর ঈমান এনেছ, অনুরূপ আমার উপরেও ঈমান আন। কারণ, আমি তো তাওরাতের সত্যায়ন করছি, তার খন্ডন ও মিথ্যায়ন করছি না।

এখানে ঈসা আলাইহিস সালাম কর্তৃক সুসংবাদ প্রদত্ত সেই রাসূলের নাম বলা হয়েছে আহমদ। আমাদের প্রিয় শেষনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নাম মুহাম্মদ, আহমদ এবং আরও কয়েকটি নাম ছিল। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমার কয়েকটি নাম রয়েছে, আমি মুহাম্মাদ, আমি 'আহমদ, আমি মাহী' বা নিশ্চিহ্নকারী; যার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ কুফারী নিশ্চিহ্ন করে দিবেন। আর আমি 'হাশির' বা একত্রিতকারী; আমার কদমের কাছে সমস্ত মানুষ জমা হবে। আর আমি 'আকিব' বা পরিসমাপ্তিকারী । [বুখারী:

৩৫৩২, ৪৮৯৬, মুসলিম: ২৩৫৪, তিরমিযী: ২৮৪০, মুসনাদে আহমাদ: ৪/৮০, ইবনে হিব্বান: ৬৩১৩] তবে রাসূলের নাম এ কয়টিতে সীমাবদ্ধ নয়। অন্য হাদীসে আরও এসেছে, আবু মূসা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই আমাদেরকে তার নাম উল্লেখ করেছেন, তন্মধ্যে কিছু আমরা মুখস্ত করতে সক্ষম হয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন, আমি 'মুহাম্মাদ' 'আহমাদ, হাশির, মুকাফফি (সর্বশেষে আগমনকারী), নাবিইউত তাওবাহ (তাওবাহর নবী), নাবীইউল মালহামাহ, (সংগ্রামের নবী)। [মুসলিম: ২৩৫৫, মুসনাদে আহমাদ: ৪/৩৯৫, ৪০৪, ৪০৭]

ঈসা আলাইহিস সালাম এর সুসংবাদ প্রদানের কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীসেও এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ তাকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদেরকে আপনার নিজের সম্পর্কে কিছু বলুন। জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "আমি আমার পিতা (পিতৃপুরুষ) ইবরাহীম এর দোআ, ঈসা এর সুসংবাদ এবং আমার মা যখন আমাকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন তখন তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, তার থেকে একটি আলো বের হয়ে সিরিয়ার বুসরা নগরীর প্রাসাদসমূহ আলোকিত হয়ে গেছে।" [মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৬০০, অনুরূপ বর্ণনা আরও দেখুন: মুসনাদে আহমাদ: ৫/২৬২] এমনকি এ সুসংবাদের কথা হাবশার বাদশাহ নাজাসীও স্বীকার করেছিলেন। [দেখুন: মুসনাদে আহমাদ: ১/৪৬১-৪৬২]

মূল আয়াতে سحر শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে سحر শব্দটি যাদু অর্থে নয়, বরং ধোঁকা ও প্রতারণা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী ভাষায় যাদু অর্থে এ শব্দটির ব্যবহার যেমন পরিচিত তেমনি ধোঁকা ও প্রতারণা অর্থে ব্যবহারও পরিচিতি। যেমনঃ আরবীতে বলা হয় سحره اى خدعه সে অমুক ব্যক্তিকে যাদু করেছে অর্থাৎ ধোঁকা দিয়েছে। যে দৃষ্টি ও চাহনি মন কেড়ে নেয় তাকে বলা হয় عين ساحرة যাদুময় চোখ। যে প্রান্তরে চারদিকে কেবল মরীচিকা আর মরীচিকাই চোখে পড়ে তাকে ارض ساحرة যাদুর প্রান্তর বলে। রৌপ্যকে পালিশ করে স্বর্ণের মত উজ্জ্বল করা হলে তাকে বলা হয় سحرت الفضة । সুতরাং আয়াতের অর্থ হলো, যখন সেই নবী, যার আগমনের সুসংবাদ হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম দিয়েছিলেন স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিয়ে আস বলেন তখন নবী ইসরাঈল এবং হযরত ঈসার উম্মাতগণ তাঁর নবুওয়াতের দাবীকে খোলাখুলি প্রতারণা ও জালিয়াতি বলে ঘোষণা করল।

وَ مَنۡ اَظۡلَمُ مِمَّنِ افۡتَرٰی عَلَی اللّٰہِ الۡکَذِبَ وَ ہُوَ یُدۡعٰۤی اِلَی الۡاِسۡلَامِ ؕ وَ اللّٰہُ لَا یَہۡدِی الۡقَوۡمَ الظّٰلِمِیۡنَ

৭. আর সে ব্যক্তির চেয়ে বড় যালিম আর কে যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে? অথচ তাকে ইসলামের দিকে আহবান করা হয়। আর আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।

আল্লাহর প্রেরিত নবীকে নবুওয়াতের মিথ্যা দাবীদার বলে অভিহিত করা এবং নবীর ওপর আল্লাহর যে বাণী নাযিল হচ্ছে তাকে নবীর নিজের তৈরী কথা বলে ধরে নেয়া

আল্লাহর এই সত্য নবীকে নবুওয়াতের মিথ্যা দাবীদার বলাটাই কোন ছোট খাট জুলুম নয়। কিন্তু সেটা আরো বড় জুলুম হয়ে দাঁড়ায় যখন তিনি আল্লাহর দাসত্ব আনুগত্যের প্রতি আহবান জানান আর জবাবে শ্রোতা তাঁকে গালি দিতে থাকে এবং তাঁর দাওয়াত ও আন্দোলনকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য মিথ্যা কলঙ্ক লেপন ও অপবাদ আরোপের কৌশল অবলম্বন করে।

يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِئُوْا نُوْرَ اللهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَ اللهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَ لَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ

৮. তারা আল্লাহর নূর ফুৎকারে নেভাতে চায়, আর আল্লাহ্, তিনি তাঁর নূর পূর্ণতাদানকারী, যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে।

এ আয়াতটি ৩ হিজরী সনে ওহোদ যুদ্ধের পরে নাযিল হয়েছিল। সে সময় ইসলাম কেবল মদীনা শহরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, মুসলমানদের সংখ্যা কয়েক হাজারের বেশী ছিল না এবং গোটা আরবভূমি দ্বীন ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার জন্য পুরোপুরি সংকল্পবদ্ধ ছিল। ওহোদের যুদ্ধে মুসলমানদের যে ক্ষতি হয়েছিল তার কারণে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ক্ষুন্ন হয়েছিল এবং আশেপাশের গোত্রসমূহ তাদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত সাহসী হয়ে উঠেছিল। এরূপ পরিস্থিতিতে বলা হয়েছে, আল্লাহর এই 'নূর' কারো নিভিয়ে দেয়াতে নিভবে না, বরং পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত হবে এবং সারা পৃথিবী ব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে ক্ষান্ত হবে। এটা একটা স্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী, যা অক্ষরে অক্ষরে সত্যে প্রমাণিত হয়েছে। ইসলামের ভবিষ্যত কি একমাত্র আল্লাহ ছাড়া সেই সময় আর কে তা জানতো? মানুষ তো তখন দিব্যি দেখছিল, এটা একটা নিভু নিভু প্রদীপ যা নিভিয়ে ফেলার জন্য প্রচণ্ড ঝড়ো বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে।

هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَ دِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ

৯. তিনিই তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন হেদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ সকল দ্বীনের উপর তাকে বিজয়ী করার জন্য, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।

মুশরিকদের জন্য অসহনীয় হলেও। অর্থাৎ যারা আল্লাহর দাসত্বের সাথে অন্যদের দাসত্বও করে থাকে এবং আল্লাহর দ্বীনের সাথে অন্য সব দ্বীন ও বিধানকে সংমিশ্রিত করে, শুধু এক আল্লাহর আনুগত্য ও হিদায়াতের ওপর গোটা জীবনব্যবস্থা কায়েম হোক তারা তা চায় না। যারা ইচ্ছামত যে কোন প্রভু ও উপাস্যের দাসত্ব করতে সংকল্পবদ্ধ এবং যে কোন দর্শন ও মতবাদের ওপর নিজেদের আকীদা-বিশ্বাস, নৈতিকতা এবং তাহযীব তামুদ্দুনের ভিত্তিস্থাপন করতে প্রস্তুত এমনসব লোকের বিরোধিতার মুখেও বলা হচ্ছে যে, তাদের সাথে আপোষ করার জন্য আল্লাহর রসূলকে পাঠানো হয়নি। বরং তাকে পাঠানো হয়েছে এ জন্য যে, তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে যে হিদায়াত ও জীবনব্যবস্থা এনেছেন তাকে গোটা জীবনের সব দিক ও বিভাগের ওপর বিজয়ী করে দেবেন। অবস্থা যাই হোক না কেন, তাঁকে এ কাজ করতেই হবে। কাফের ও মুশরিকরা তা মেনে নিক আর না নিক এবং এ বিরোধিতায় সর্বশক্তি নিয়োগ করলেও সর্বাবস্থায় রসূলের এ মিশন সফলকাম হবে এবং পূর্ণতা লাভ করবে। ইতিপূর্বে কুরআন মজীদের আরো দু'টি স্থানে এ ঘোষণা এসেছে এক, সূরা তাওবার ৩৩ আয়াতে । দুই, সূরা ফাতহের ২৮ আয়াতে । এ স্থানে তৃতীয়বারের মত এ ঘোষণার পুনরুক্তি করা হচ্ছে।

ফুটনোট

◘ পবিত্র কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী, বিশ্বজগতের সকল সৃষ্টির উপলব্ধি ক্ষমতা আছে এবং তারা এক আল্লাহর মহীমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করার মাধ্যমে তাঁর নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ও প্রজ্ঞার সাক্ষ্য দেয়।

◘ ঈমান ও দ্বীনদারির মৌখিক দাবি যথেষ্ট নয়। আমলে বা কাজে-কর্মে তার প্রমাণ দিতে হবে।

◘ যে ব্যক্তি মুখে দ্বীনকে সহযোগিতা করার দাবি করে কিন্তু কার্যত কিছুই করে না, সে যেন একথা না ভাবে যে, তার পক্ষে আল্লাহ তায়ালাকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব হয়েছে। এ ধরনের মানুষ পার্থিব জীবন ও পরকালে আল্লাহর কঠিন শাস্তির মুখে পড়বে।

◘ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা বা চেষ্টা চালানো ছাড়া তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করা সম্ভব নয়।

◘ আল্লাহ যে সেনাদলকে/সংগঠন পছন্দ করেন তার মধ্যে তিনটি গুণ থাকা আবশ্যক।

- তারা বুঝে শুনে ভালভাবে চিন্তা-ভাবনা করে আল্লাহর পথে লড়াই করবে
- তারা বিচ্ছিন্নতা ও শৃঙ্খলাহীনতার শিকার হবে না, বরং সুশৃঙ্খল হয়ে লড়াই করবে।
- শত্রুর বিরুদ্ধে তার অবস্থা হবে, বুনিয়ানুম মারসুস "সুদৃঢ় দেয়ালের" মত।

◘ অত্যাচারী ও আগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করার সময় মুসলমানদেরকে নিজেদের মধ্যকার মাজহাবগত, জাতিগত ও ভাষাগত বিভেদ ভুলে সীসাঢালা প্রাচীরের মতো ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে যেতে হবে।

◘ পূর্ববর্তী নবীদের পাশাপাশি তাদের জাতিগুলোর ইতিহাসে আমাদের জন্য রয়েছে অনেক শিক্ষণীয় বিষয়। তাদের ইতিহাস জানা গেলে নানা ধরনের সমস্যা ও প্রতিকূলতার মোকাবিলায় বর্তমান সময়ের ঈমানদার মানুষদের ঈমান শক্তিশালী হয়।

◘ নবী-রাসূলরা কষ্ট পান এমন আচরণ করলে আল্লাহর হেদায়াত থেকে বঞ্চিত হতে হয়। এ ধরনের মানুষ কখনও ঈমানের স্বাদ গ্রহণ করবে না।

◘ সকল নবী-রাসূলের পৃথিবীতে আগমনের লক্ষ্য ছিল একটাই। এ কারণে তারা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন না। তারা তাঁদের পরবর্তী নবী বা রাসূলের আগমনের সুসংবাদও দিয়েছেন।

◘ মানবতার প্রতি সবচেয়ে বড় জুলুম হচ্ছে, আল্লাহর বাণী মানুষের কানে পৌঁছে দিতে বাধা প্রদান করা এবং মানব সমাজে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শিক্ষা বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা।

◘ পবিত্র কুরআনের ভাষায় দ্বীনে ইসলাম হচ্ছে নূর বা আলোর সমতুল্য।

◘ কাফেররা চেষ্টা করবে আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দেবে, কিন্তু আল্লাহ তাদের অপছন্দ থাকা সত্ত্বেও তার নূরকে প্রজ্বলিত রাখবেন।

◘ দ্বীনকে অন্যদের উপর বিজয়ী হওয়ার জন্য পাঠানো হয়েছিল।

কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২৪
প্রস্তুতি সহায়ক তাফসীর নোট পর্বঃ ১৮

সূরা সফ (১০-১৪ আয়াত)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا هَلۡ اَدُلُّكُمۡ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنۡجِيۡكُمۡ مِّنۡ عَذَابٍ اَلِيۡمٍ

১০. হে ঈমানদারগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যবসার সন্ধান দেব, যা তোমাদেরকে রক্ষা করবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে?

تُؤۡمِنُوۡنَ بِاللّٰهِ وَ رَسُوۡلِهٖ وَ تُجَاهِدُوۡنَ فِىۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ بِاَمۡوَالِكُمۡ وَ اَنۡفُسِكُمۡ ؕ ذٰلِكُمۡ خَيۡرٌ لَّكُمۡ اِنۡ كُنۡتُمۡ تَعۡلَمُوۡنَ

১১. তা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের উপর ঈমান আনবে এবং তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা জানতে!

এই আমল (অর্থাৎ, ঈমান ও জিহাদ)-কে বাণিজ্য বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কারণ এতেও তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের মত লাভ হবে। আর সে লাভ কি? জান্নাতে প্রবেশ এবং জাহান্নাম হতে মুক্তি লাভ। এ থেকে বড় লাভ আর কি হতে পারে? এই লাভকে আল্লাহ অন্যত্র এইভাবে বর্ণনা করেছেন, إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ "অবশ্যই আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন মু'মিনদের নিকট থেকে তাদের জান ও মালকে জান্নাতের বিনিময়ে।" (সূরা তাওবাহঃ ১১১)

আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে ঈমানের যে ব্যাপারটা স্থিরকৃত হয় তাকে ব্যবসা বা কেনাবেচা বলে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। এর মানে হচ্ছে, ঈমান শুধুমাত্র একটা অতি প্রাকৃতিক আকীদা-বিশ্বাস নয়। বরং এটা একটি চুক্তি। এ চুক্তির প্রেক্ষিতে বান্দা তার নিজের প্রাণ ও নিজের ধন-সম্পদ আল্লাহর হাতে বিক্রি করে দেয়। আর এর বিনিময়ে সে আল্লাহর পক্ষ থেকে এ ওয়াদা কবুল করে নেয় যে, মরার পর পরবর্তী জীবনে তিনি তাকে জান্নাত দান করবেন। এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তু অনুধাবন করার জন্য সর্বপ্রথম কেনা-বেচার তাৎপর্য ও স্বরূপ কি তা ভালো ভাবে বুঝে নিতে হবে।

নিরেট সত্যের আলোকে বিচার করলে বলা যায় মানুষের ধন-প্রাণের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ। কারণ তিনিই তার কাছে যা কিছু আছে সব জিনিসের স্রষ্টা। সে যা কিছু ভোগ ও ব্যবহার করেছে তাও তিনিই তাকে দিয়েছেন। কাজেই এদিক দিয়ে তো কেনাবেচার কোন প্রশ্নই ওঠে না। মানুষের এমন কিছু নেই, যা সে বিক্রি করবে। আবার কোন জিনিস আল্লাহর মালিকানার বাইরেও নেই, যা তিনি কিনবেন। কিন্তু মানুষের মধ্যে এমন একটি জিনিস আছে, যা আল্লাহ পুরোপুরি মানুষের হাতে সোর্পদ করে দিয়েছেন। সেটি হচ্ছে তার ইখতিয়ার অর্থাৎ নিজের স্বাধীন নির্বাচন ক্ষমতা ও স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি (Free will an freedom of choice)। এ ইখতিয়ারের কারণে অবশ্যই প্রকৃত সত্যের কোন পরিবর্তন হয় না। কিন্তু মানুষ এ মর্মে স্বাধীনতা লাভ করে যে, সে চাইলে প্রকৃত সত্যকে মেনে নিতে পারে এবং চাইলে তা অস্বীকার করতে পারে। অন্য কথায় এ ইখতিয়ারের মানে এ

নয় যে মানুষ প্রকৃত পক্ষে তার নিজের প্রাণের নিজের বুদ্ধিবৃত্তি ও শারীরিক শক্তির এবং দুনিয়ায় সে যে কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা লাভ করেছে, তার মালিক হয়ে গেছে। এ সঙ্গে এ জিনিসগুলো সে যেভাবে চাইবে সেভাবে ব্যবহার করার অধিকার লাভ করেছে, একথাও ঠিক নয়। বরং এর অর্থ কেবল এতটুকুই যে, তাকে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে, আল্লাহর পক্ষে থেকে কোন প্রকার জোর-জবরদস্তি ছাড়াই সে নিজেরই নিজের সত্তার ও নিজের প্রত্যেকটি জিনিসের ওপর আল্লাহর মালিকানা ইচ্ছা করলে স্বীকার করতে পারে আবার ইচ্ছা করলে নিজেই নিজের মালিক হয়ে যেতে পারে এবং নিজেই একথা মনে করতে পারে যে, সে আল্লাহ থেকে বেপরোয়া হয়ে নিজের ইখতিয়ার তথা স্বাধীন কর্মক্ষমতার সীমানার মধ্যে নিজের ইচ্ছামত কাজ করার অধিকার রাখে। এখানেই কেনা-বেচার প্রশ্নটা দেখা দেয়। আসলে এ কেনা-বেচা এ অর্থে নয় যে, মানুষের একটি জিনিস আল্লাহ কিনতে চান, বরং প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে, যে জিনিসটি আল্লাহর মালিকানাধীন যাকে তিনি আমানত হিসেবে মানুষের হাতে সোর্পদ করেছেন এবং যে ব্যাপারে বিশ্বস্ত থাকার বা অবিশ্বস্ত হবার স্বাধীনতা তিনি মানুষকে দিয়ে রেখেছেন সে ব্যাপারে তিনি মানুষের দাবী করেন, আমার জিনিসকে তুমি স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে (বাধ্য হয়ে নাও)। এ সঙ্গে খেয়ানত করার যে স্বাধীনতা তোমাকে দিয়েছি তা তুমি নিজেই প্রত্যাহার করো। এভাবে যদি তুমি দুনিয়ার বর্তমান অস্থায়ী জীবনে নিজের স্বাধীনতাকে (যা তোমার অর্জিত নয় বরং আমার দেয়া) আমার হাতে বিক্রি করে দাও তাহলে আমি পরবর্তী চিরন্তন জীবনে এর মূল্য জান্নাতের আকারে তোমাকে দান করবো। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কেনা-বেচার এ চুক্তি সম্পাদন করে সে মু'মিন। ঈমান আসলে এ কেনা-বেচার আর এক নাম। আর যে ব্যক্তি এটা অস্বীকার করবে অথবা অঙ্গীকার করার পরও এমন আচরণ করবে যা কেবলমাত্র কেনা-বেচা না করার অবস্থায় করা যেতে পারে সে কাফের। আসলে এ কেনা-বেচাকে পাস কাটিয়ে চলার পারিভাষিক নাম কুফরী।

"তোমরা আল্লাহ এবং তার রাসুলের প্রতি ঈমান আনবে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করবে তোমাদের মাল এবং জান দ্বারা"। অর্থাৎ ব্যবসার যে কথা বলা হয়েছিল তা হল ঈমান এবং জিহাদ। ঈমান বিহীন জিহাদ কবুল হবে না। কোন অমুসলিম যদি ইসলামের জিহাদে অংশগ্রহণ করে তাহলে এ জিহাদ তাকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে বাঁচাতে পারবে না। তেমনি ভাবে মুনাফেকের জিহাদও কবুল হবে না। মুনাফেক সরদার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সলুল এবং আরো অনেক মুনাফেক নবী করীম (সঃ) এর সাথে তাবুকসহ বহু জিহাদে অংশ গ্রহণ করে কিন্তু তাদের জিহাদ কোন কাজে আসেনি। তারা হবে জাহান্নামের অধিবাসী।

"জিহাদ করবে মাল এবং জান দিয়ে।" এখানে মালের কথা প্রথমে এজন্য বলা হয়েছে যে, মাল ছাড়া জিহাদ হয়না, জানের প্রয়োজন পড়তে পারে আল্লাহর ইচ্ছা হলে জানের প্রয়োজন নাও পড়তে পারে কিন্তু মাল সেতো সর্বাবস্থায় প্রয়োজন। জিহাদে জানের চেয়ে বেশী প্রয়োজন মালের। "এটাই তোমাদের জন্য উত্তম; যদি তোমরা বুঝ।" অর্থাৎ জিহাদ হচ্ছে উত্তম তোমাদের জান ও মাল হতে। কেননা এতে রয়েছে অগণিত কল্যাণ ও সওয়াব, ইহকালে ও পরকালের কল্যাণ ও মুক্তি যদি তোমরা এর মর্মকথা বুঝতে পার, এর কল্যান উপলব্ধি কর।

يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَ يُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَ مَسٰكِنَ طَیِّبَةً فِیْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِیْمُ

১২. আল্লাহ তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, এবং স্থায়ী জান্নাতের উত্তম বাসগৃহে। এটাই মহাসাফল্য।

وَ اُخْرٰی تُحِبُّوْنَهَا ؕ نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَ فَتْحٌ قَرِیْبٌ ؕ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِیْنَ

১৩. এবং (তিনি দান করবেন) আরও একটি অনুগ্রহ, যা তোমরা পছন্দ কর। আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য ও আসন্ন বিজয়; আর আপনি মুমিনদেরকে সুসংবাদ দিন।

এখান থেকে জিহাদের বিনিময়ে আল্লাহ তায়ালা আরো যা কিছু দান করবেন তার উল্লেখ করা হয়েছেঃ

(১) গুনাহ খাতা মাফ করে দিবেন, ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দিবেন।

(২) জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত আর সে জান্নাত এমন যা চিরস্থায়ী আবাসস্থল। এখানে লক্ষণীয় যে, "জান্নাতে প্রবেশ করাবেন" অর্থাৎ জিহাদ করলে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো আল্লাহর দায়িত্ব। তিনি জিহাদকারীকে অবশ্যই জান্নাতে দাখিল করবে।

(৩) আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে সাহায্য আসবে। আল্লাহ তায়ালা তার পক্ষথেকে মুজাহিদদেরকে জিহাদে সাহায্য করবেন। রসুলুল্লাহ (সঃ) থেকে শুরু করে অদ্যাবধি আল্লাহ তায়ালা জিহাদে সাহায্য করেছেন যা হাদীস কোরআন এবং ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রয়েছে।

(৪) নিকট বিজয় অর্থাৎ জিহাদে রত থাকলে আল্লাহ তায়ালা অচিরেই বিজয় দান করবেন। ইসলামের বিজয় পতাকা উড়বে।
এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, পরকালের অনুদান ও নিয়ামত গুলিকে পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে আর দুনিয়ার নেয়ামত ও অনুদানকে পরে উল্লেখ করা হয়েছে কেননা পরকালীন নিয়ামতই চিরস্থায়ী। পরকালীন সাফল্যই মুমিনের জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

আখেরাতের নেয়ামতের সাথে কিছু দুনিয়ার নেয়ামতেরও ওয়াদা করে বলা হয়েছে, (وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ) "এবং তিনি দান করবেন তোমাদের বাঞ্ছিত আরো একটি অনুগ্রহ। আল্লাহর সাহায্য ও আসন্ন বিজয়; মুমিনদেরকে সুসংবাদ দিন।" অর্থাৎ আখেরাতের নেয়ামত ও বাসগৃহ তো পাওয়া যাবেই; দুনিয়াতেও একটি নগদ নেয়ামত পাওয়া যাবে, তা হচ্ছে আল্লাহর সাহায্য ও আসন্ন বিজয়। এর অর্থ শত্রুদের উপর বিজয় লাভ। এখানে قَرِيبٌ(বা নিকট) শব্দটি আখেরাতের বিপরীতে ধরা হলে ইসলামের সকল বিজয়ই এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আর যদি প্রচলিত قَرِيبٌ(বা আসন্ন) ধরা হয়, তবে এর প্রথম অর্থ হবে খাইবার বিজয় এবং এরপর মক্কা বিজয়। تُحِبُّونَهَاঅর্থাৎ, তোমরা এই নগদ নেয়ামত খুব পছন্দ কর। কারণ মানুষ স্বভাবগতভাবে নগদকে পছন্দ করে। পবিত্র কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে,(وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا) অর্থাৎ, মানুষ তড়িঘড়ি পছন্দ করে। [সূরা আল-ইসরা: ১১] এর অর্থ এই নয় যে, আখেরাতের নেয়ামত তাদের কাছে প্রিয় নয়। বরং অর্থ এই যে, আখেরাতের নেয়ামত তো তাদের প্রিয় কাম্যই, কিন্তু স্বভাবগতভাবে কিছু নগদ নেয়ামতও তারা দুনিয়াতে চায় তাও দেয়া হবে।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْۤا اَنْصَارَ اللّٰهِ كَمَا قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيّٖنَ مَنْ اَنْصَارِيْۤ اِلَى اللّٰهِ ؕ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ فَاٰمَنَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْۢ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ وَ كَفَرَتْ طَّآئِفَةٌ ۚ فَاَيَّدْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلٰى عَدُوِّهِمْ فَاَصْبَحُوْا ظٰهِرِيْنَ

১৪. হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর সাহায্যকারী হও, যেমন মার্‌ইয়াম-পুত্র ঈসা হাওয়ারীগণকে বলেছিলেন, আল্লাহর পথে কারা আমার সাহায্যকারী হবে? হাওয়ারীগণ বলেছিলেন, আমরাই আল্লাহর পথে সাহায্যকারী। তারপর বনী ইসরাঈলের একদল ঈমান আনল এবং একদল কুফরী করল। তখন আমরা যারা ঈমান এনেছিল, তাদের শত্রুদের মুকাবিলায় তাদেরকে শক্তিশালী করলাম, ফলে তারা বিজয়ী হলো।

حَوَارِيٌّ শব্দটি حَوَرٌ ধাতু থেকে উৎপত্তি। অর্থ দেওয়ালে চুনকাম করার জন্য ধবধবে সাদা চুন। পারিভাষিক অর্থে ঈসা (আঃ)-এর খাঁটি অনুসারী শীর্ষস্থানীয় ভক্ত ও সাহায্যকারী ব্যক্তিগণকে 'হাওয়ারী' বলা হত। কোন কোন তাফসীরবিদ বলেছেন তাদের সংখ্যা ছিল ১২জন। ঈসা (আঃ)-এর অনুসারী ও সাহায্যকারীকে, সহচরদেরকে 'হাওয়ারী' বলা হয়। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অনুসারী ও সহচরদেরকে 'সাহাবী' বলা হয়। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন : প্রত্যেক নাবীর একজন বিশেষ সাহায্যকারী (হাওয়ারী) ছিল। আমার বিশেষ সাহায্যকারী হল যুবাইর (রাঃ)। (সহীহ বুখারী হা. ২৮৪৭, সহীহ মুসলিম হা. ২৪১৫)

এই আয়াতের তাফসীরে আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত, ঈসা আলাইহিস সালাম আসমানে উত্থিত হওয়ার পর নাসারারা তিন দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদল বলল, তিনি ইলাহ ছিলেন এবং আসমানে চলে গেছেন। দ্বিতীয় দল বলল, তিনি ইলাহ ছিলেন না বরং ইলাহর পুত্র ছিলেন। এখন আল্লাহ তাকে আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন এবং শত্রুদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তৃতীয় দল বিশুদ্ধ ও সত্যকথা বলল। তারা বলল, "তিনি ইলাহও ছিলেন না, ইলাহর পুত্রও ছিলেন না; বরং আল্লাহর দাস ও রাসূল ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে শত্রুদের কবল থেকে হেফাযত ও উচ্চ মর্তবা দান করার জন্যে আকাশে উঠিয়ে নিয়েছেন।" মূলত: এরাই ছিল সত্যিকার ঈমানদার।

প্রত্যেক দলের সাথে কিছু কিছু জনসাধারণও যোগদান করে এবং পারস্পরিক কলহ বাড়তে বাড়তে যুদ্ধের উপক্রম হয়। ঘটনাচক্রে উভয় কাফের দল মুমিনদের মোকাবিলায় প্রবল হয়ে ওঠে। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা সর্বশেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে প্রেরণ করেন। তিনি মুমিন দলকে সমর্থন দেন। এভাবে পরিণামে মুমিন দল যুক্তি প্রমাণের নিরীখে বিজয়ী হয়ে যায়। এই তফসীর অনুযায়ী আয়াতে উল্লেখিত (الَّذِينَ آمَنُوا) বা "যারা ঈমান এনেছে" বলে ঈসা আলাইহিস সালাম-এর উম্মতের মুমিনগণকেই বোঝানো হয়েছে, যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহায্য ও সমর্থনে বিজয়ের গৌরব অর্জন করবে। সে হিসেবে উম্মতে মুহাম্মদী যারা রাসূলের প্রকৃত অনুসারী তারা সর্বদা বিজয়ী থাকবে। [দেখুন: তাফসীরে তাবারী: ২৮/৬০, দ্বিয়া আল-মাকদেসী: আল-মুখতারাহ: ১০/৩৭৬-৩৭৮, নং ৪০২]

ফুটনোট

◘ ব্যবসা শুধুমাত্র বস্তু এবং পার্থিব জীবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। আল্লাহ এবং তাঁর প্রেরিত পুরুষদের সঙ্গে লেনদেন একটি অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসা। এই ব্যবসায় পার্থিব জীবনেও লাভবান হওয়া যায় এবং আখিরাতেও চিরস্থায়ী সুখের আবাস জান্নাত লাভ করা সম্ভব।

◘ যে ব্যবসার কথা বলা হয়েছিল তা হল ঈমান এবং জিহাদ। ঈমান বিহীন জিহাদ কবুল হবে না।

◘ মুমিন ব্যক্তিদেরকে নিজেদের ঈমান রক্ষা করার পাশাপাশি আল্লাহর দ্বীন রক্ষার্থে নিজেদের জীবন ও সম্পদ উৎসর্গ করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। এখানে প্রস্তুতিটি গুরুত্বপূর্ণ। সব সময় জীবন উৎসর্গ করার প্রয়োজন হবে না। কিন্তু প্রয়োজনের সময় জীবনের মায়া ত্যাগ করতে কুণ্ঠাবোধ করা যাবে না।

◘ জিহাদ করবে মাল এবং জান দিয়ে। মালের কথা প্রথমে এজন্য বলা হয়েছে যে, মাল ছাড়া জিহাদ হয়না, জানের প্রয়োজন পড়তে পারে আল্লাহর ইচ্ছা হলে জানের প্রয়োজন নাও পড়তে পারে কিন্তু মাল সেতো সর্বাবস্থায় প্রয়োজন।

◘ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী মুজাহিদগণ এই দুটি নেকির যেকোনো একটি লাভ করবেন। হয় তারা শহীদ হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবেন যা হচ্ছে মহা সাফল্য। অথবা আল্লাহর ইচ্ছায় জিহাদে বিজয়ী হবেন। এটিও গুরুত্বপূর্ণ অর্জন।

◘ জিহাদের বিনিময়ে আল্লাহ তায়ালা আরো যা কিছু দান করবেন তার উল্লেখ করা হয়েছেঃ

(১) গুনাহ খাতা মাফ করে দিবেন, ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দিবেন।

(২) জান্নাতে প্রবেশ করাবেন

(৩) আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে সাহায্য আসবে।

(৪) নিকট বিজয়

◘ ঈসা (আঃ)-এর অনুসারী ও সাহায্যকারীকে, সহচরদেরকে ‘হাওয়ারী’ বলা হয়। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অনুসারী ও সহচরদেরকে ‘সাহাবী’ বলা হয়।

◘ মুমিন ব্যক্তির কাছে তার জীবন ও সম্পদের চেয়ে দ্বীন রক্ষা করা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণে তিনি যেকোনো সময় জীবন ও সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাকেন।

কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২৪
প্রস্তুতি সহায়ক তাফসীর নোট পর্বঃ ১৯

সূরা মুজ্জাম্মিল

নামকরণ

সূরার প্রথম আয়াতের الْمُزَّمِّلُ (আলমুয্যাম্মিল, শব্দটিকে এ সূরার নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এটা শুধু সূরাটির নাম, এর বিষয়বস্তুর শিরোনাম নয়।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরার দুটি রুকূ দুটি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নাযিল হয়েছে।

প্রথমে রুকূর আয়াতগুলো মক্কায় নাযিল হওয়ার ব্যাপারে সবাই একমত।এর বিষয়বস্তু এবং বিভিন্ন হাদীসের বর্ণনা থেকেও তা বুঝা যায়।তবে প্রশ্ন থেকে যায় যে, মক্কী জীবনের কোন পর্যায়ে তা নাযিল হয়েছিল? হাদীসের বর্ণনাসমূহ থেকে আমরা এর কোন জবাব পাই না। তবে পুরো রুকূটির বিষয়বস্তুর আভ্যন্তরীণ প্রমাণ দ্বারা এর নাযিল হওয়ার সময়-কাল নির্ণয় করতে যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যায়।

প্রথমত, এতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রাতের বেলা উঠে আল্লাহর ইবাদত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে যাতে তাঁর মধ্যে নবুয়াতের গুরু দায়িত্ব বহনের শক্তি সৃষ্টি হয়। এ থেকে জানা গেল যে, এ নির্দেশটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়াতের প্রথম যুগে এমন এক সময় নাযিল হয়ে থাকবে যখন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এ পদমর্যাদার জন্য তাঁকে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছিল।

দ্বিতীয়ত, এর মধ্যে তাঁকে তাহজ্জুদ নামাযে অর্ধেক রাত কিংবা তার চেয়ে কম বা বেশী রাত পর্যন্ত কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। একথা থেকে প্রমাণিত হয় যে, তখন পর্যন্ত কুরআন মজীদের অন্তত এতটা পরিমাণ নাযিল হয়েছিল যা দীর্ঘক্ষণ তিলাওয়াত করা যেতো।

তৃতীয়ত, এ রুকূতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিরোধীদের অত্যাচার ও বাড়াবাড়ির ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারনের উপদেশ এবং মক্কার কাফেরদের আযাবের হুমকি দেয়া হয়েছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, এ রুকূটি যখন নাযিল হয়েছিল তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামের প্রকাশ্য তাবলীগ বা প্রচার শুরু করে দিয়েছিলেন এবং মক্কায় তাঁর বিরোধিতাও তীব্রতা লাভ করেছিল।

দ্বিতীয় রুকূ সম্পর্কে মুফাস্সিরগণ যদিও বলেছেন যে, এটিও মক্কায় নাযিল হয়েছে। কিন্তু কিছু সংখ্যক মুফাস্সির একে মদীনায় অবতীর্ণ বলে মত ব্যক্ত করেছেন। এ রুকূটির বিষয়বস্তু থেকে এ মতটিরও সমর্থন পাওয়া যায়। কারণ এর মধ্যে আল্লাহর পথে লড়াই করার উল্লেখ আছে। মক্কায় এর কোন প্রশ্নই ছিল না। এতে ফরযকৃত যাকাত আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর এটা প্রমাণিত বিষয় যে, একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের ওপর একটি নির্দিষ্ট হারে যাকাত দেয়া মদীনাতে ফরয হয়েছে।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

প্রথম সাতটি আয়াতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, যে মহান কাজের গুরু দায়িত্ব আপনাকে দেয়া হয়েছে তার দায়-দায়িত্ব ঠিকমত পালনের জন্য আপনি নিজেকে প্রস্তুত করুন। এর বাস্তব পন্থা বলা হয়েছে এই যে, আপনি রাতের বেলা উঠে অর্ধেক রাত কিংবা তার চেয়ে বেশী সময় বা কিছু কম সময় পর্যন্ত নামায পড়ুন।

৮ থেকে ১৪ নং পর্যন্ত আয়াতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, আপনি সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সমগ্র বিশ্ব-জাহানের অধিপতি আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়ে যান। নিজের সমস্ত ব্যাপার তাঁর কাছে সোর্পদ করে দিয়ে নি:শংক ও নিশ্চিন্ত হয়ে যান। বিরোধীরা আপনার বিরুদ্ধে যা বলছে সে ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করুন, তাদের কথায় ভ্রুক্ষেপ করবেন না। তাদের ব্যাপারটা আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিন। তিনিই তাদের সাথে বুঝাপড়া করবেন।

এরপর ১৫ থেকে ১৯ নম্বর পর্যন্ত আয়াতে মক্কার যে সমস্ত মানুষ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতা করেছিলো তাদের এ বলে হুশিয়ারী দেয়া হয়েছে যে, আমি যেমন ফেরাউনের কাছে রসূল পাঠিয়েছিলাম ঠিক তেমনি তোমাদের কাছে একজন রসূল পাঠিয়েছি। কিন্তু দেখো, আল্লাহর রসূলের কথা না শুনে ফেরাউন কিরূপ পরিণামের সম্মুখীন হয়েছিল। মনে করো, এ জন্য দুনিয়াতে তোমাদের কোন শাস্তি দেয়া হলো না। কিন্তু কিয়ামতের দিনের শাস্তি থেকে তোমরা কিভাবে নিষ্কৃতি লাভ করবে?

এ পর্যন্ত যা বর্ণিত হলো তা প্রথম রুকূর বিষয়বস্তু। হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়েরের বর্ণনা অনুসারে এর দশ বছর পর দ্বিতীয় রুকূটি নাযিল হয়েছিল। তাহজ্জুদ নামায সম্পর্কে প্রথম রুকূর শুরুতেই যে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল এতে তা সহজ করে দেয়া হয়েছে। এখন নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, তাহজ্জুদ নামায যতটা সহজ ও স্বাচ্ছন্দে আদায় করা সম্ভব সেভাবেই আদায় করবে। তবে মুসলমানদের যে বিষয়টির প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করতে হবে তাহলো পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায পূর্ণ নিয়মানুবর্তিতাসহ আদায় করবে। যাকাত যেহেতু ফরয তাই তা যথাযথভাবে আদায় করবে এবং আল্লাহর পথে নিজের অর্থ-সম্পদ বিশুদ্ধ নিয়তে খরচ করবে। সবশেষে মুসলমানদের উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, দুনিয়াতে তোমরা যেসব কল্যাণমূলক কাজ আঞ্জাম দেবে তা ব্যর্থ হবে না। বরং তা এমন সব সাজ-সরঞ্জামের মত যা একজন মুসাফির তার স্থায়ী বাসস্থানে আগেই পাঠিয়ে দেয়। আল্লাহর কাছে পৌছার পর তোমরা তার সবকিছুই পেয়ে যাবে যা দুনিয়া থেকে আগেই পাঠিয়ে দিয়েছিলে। আগেভাগেই পাঠিয়ে দেয়া এমন সরঞ্জাম-সমগ্রী তোমরা দুনিয়াতে যা ছেড়ে যাবে তার চেয়ে যে শুধু ভাল তাই নয়, বরং আল্লাহর কাছে তোমরা তোমাদের আসল সম্পদের চেয়ে অনেক বেশী পুরষ্কারও লাভ করবে।

ফযীলত

আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ (রহঃ) .... ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ সূরা মুযযামমিলের প্রথমাংশ অবতীর্ণ হওয়ার পর সাহাবাগণ রোযার মাসের মত রাত জেগে নামায আদায় করতেন। অতঃপর উক্ত সূরার শেষাংশ অবতীর্ণ হয় এবং সূরা মুযযামমিলের প্রথম ও শেষাংশের অবতীর্ণ হওয়ার মধ্যে সময়ের ব্যবধান ছিল এক বছরের। (আবু দাউদ ১৩০৫)

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন : আমার খালা [রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্ত্রী] মায়মূনা (রাঃ)-এর ঘরে একদা আমি রাত্রি যাপন করলাম। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাতে সালাত আদায়

করার জন্য উঠলেন। তিনি তের রাকাত সালাত আদায় করলেন, তার মধ্যে ফজরের দু' রাকাত সুন্নাত। আমি তার প্রত্যেক রাকাতের দাঁড়ানোর পরিমাণ হিসেব করলাম যে, তা ছিল يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ এ সূরার লম্বা সমপরিমাণ। (আবূ দাঊদ হা. ১৩৬৫, সহীহ)

يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ
১. হে বস্ত্রাবৃত!

مُزَّمِّلُ এবং পরবর্তী সূরায় ব্যাবহৃত مدثر শব্দদ্বয়ের অর্থ প্রায় এক অর্থাৎ বস্ত্রাবৃত। উভয় সূরায় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে একটি সাময়িক অবস্থা ও বিশেষ গুণ দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে। কারণ, তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) ভীষণ ভয় ও উদ্বেগের কারণে তীব্র শীত অনুভব করছিলেন এবং বস্ত্রাবৃত হয়েছিলেন। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে হযরত জাবের (রা)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণিত আছে, সর্বপ্রথম হেরা গিরিগুহায় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-র কাছে ফেরেশতা জিবরাঈল আগমন করে ইকরা সূরার প্রাথমিক আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনান। ফেরেশতার এই অবতরণ ও ওহীর তীব্রতা প্রথম পর্যায়ে ছিল। ফলে এর স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হযরত খাদিজা (রাঃ)-র নিকট গমন করলেন এবং তীব্র শীত অনুভব করার কারণে বললেন : زملوني زملوني অর্থাৎ 'আমাকে বস্ত্রাবৃত করে দাও, আমাকে বস্ত্রাবৃত করে দাও।' এর পর বেশ কিছু দিন পর্যন্ত ওহীর আগমন বন্ধ থাকে। বিরতির এই সময়কালকে 'ফতরাতুল-ওহী' বলা হয়। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হাদীসে এই সময়কালের উল্লেখ করে বলেন: একদিন আমি পথচলা অবস্থায় হঠাৎ একটি আওয়াজ শুনে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি, হেরা গিরিগুহার সেই ফেরেশতা আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে একস্থানে একটি ঝুলন্ত চেয়ারে উপবিষ্ট রয়েছেন। তাকে এই আকৃতিতে দেখে আমি প্রথম সাক্ষাতের ন্যায় আবার ভয়ে ও আতংকে অভিভূত হয়ে পড়লাম। আমি গ্রহে ফিরে এলাম এবং গৃহের লোকজনকে বললাম আমাকে বস্তাবৃত করে দাও। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ আয়াত নাযিল হল। এই হাদীসে কেবল এই আয়াতের কথাই বলা হয়েছে। এটা সম্ভবপর যে, একই অবস্থা বর্ণনা করার জন্য يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ বলেও সম্বোধন করা হয়েছে। তফসীরের সার-সংক্ষেপের বর্ণনানুযায়ী এই আয়াতের ঘটনা পৃথকও হতে পারে। এভাবে সম্বোধন করার মধ্যে বিশেষ এক করুণা ও অনুগ্রহ আছে। নিছক করুণা প্রকাশার্থে স্নেহ ও ভালবাসায় আপ্লুত হয়ে সাময়িক অবস্থার দ্বারাও কাউকে সম্বোধন করা হয়ে থাকে। [তাফসীরে রূহুল মা'আনী]

قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا
২. রাতে সালাতে দাঁড়ান, কিছু অংশ ছাড়া

এখানে বিশেষভঙ্গিতে সম্বোধন করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে তাহাজ্জুদের আদেশ করা হয়েছে। বিভিন্ন বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, আলোচ্য আয়াতসমূহ ইসলামের শুরুতে এবং কুরআন অবতরণের প্রাথমিক যুগে অবতীর্ণ হয়েছে। তখন পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয ছিল না। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত মে'রাজের রাত্রিতে ফরয হয়েছিল। এই আয়াতে তাহাজ্জুদের সালাত কেবল ফরযই করা হয়নি; বরং তাতে রাত্রির কমপক্ষে এক চতুর্থাংশ মশগুল থাকাও ফরয করা হয়েছে। আয়াতের মূল আদেশ হচ্ছে কিছু অংশ বাদে সমস্ত রাত্রি সালাতে মশগুল থাকা। এই আদেশ পালনার্থে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম অধিকাংশ রাত্রি তাহাজ্জুদের সালাতে ব্যয় করতেন। ফলে তাদের পদদ্বয় ফুলে যায় এবং আদেশটি বেশ কষ্টসাধ্য প্রতীয়মান হয়। পূর্ণ এক বছর পর এই সূরার শেষাংশ (فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ) অবতীর্ণ হলে দীর্ঘক্ষণ সালাতে

দন্ডায়মান থাকার বাধ্যবাধকতা রহিত করে দেয়া হয় এবং বিষয়টি ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিয়ে ব্যক্ত করা হয় যে, যতক্ষণ সালাত আদায় করা সহজ মনে হয়, ততক্ষণ সালাত আদায় করাই তাহাজ্জুদের জন্যে যথেষ্ট। [ইমাম মুসলিম এই বিষয়বস্তু আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণনা করেন, হাদীস নং: ৭৪৬

نِّصْفَهٗٓ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا

৩. আধা-রাত বা তার চেয়েও কিছু কম।

আগের আয়াতে اللَّيْلَ শব্দের সাথে আলিফ ও লাম সংযুক্ত হওয়ার অর্থ হয়েছে সমস্ত রাত্রি নামাযে মশগুল থাকুন। অর্থাৎ আপনি সমস্ত রাত্রি নামাযে মশগুল থাকুন কিছু অংশ বাদ দিয়ে অতঃপর এর ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে : نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ অর্থাৎ এখন আপনি অর্ধরাত্রি অথবা তদপেক্ষা কিছু কম অথবা কিছু বেশী নামাযে মশগুল হোন। এটা ব্যতিক্রমের বর্ণনা। তাই প্রশ্ন হয় যে, অর্ধেক রাত্রি তো কিছু অংশ হতে পারে না। জওয়াব এই যে, রাত্রির প্রাথমিক অংশ তো মাগরিব ও ইশার নামায ইত্যাদিতে অতিবাহিতই হয়ে যায়। এখন অর্ধেকের অর্থ হবে অবশিষ্ট রাত্রির অর্ধেক। সেটা সারা রাত্রির তুলনায় কিছু অংশ। আয়াতে অর্ধরাত্রির কমেরও অনুমতি আছে, বেশীরও আছে। তাই সমষ্টিগতভাবে এর সারমর্ম এই যে, কম পক্ষে এক-চতুর্থাংশ রাত্রির চেয়ে কিছু বেশী নামাযে মশগুল থাকা। [তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন]

اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَ رَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا

৪. অথবা তার চেয়েও একটু বাড়ান। আর কুরআন তিলাওয়াত করুন ধীরে ধীরে সুস্পষ্টভাবে

এখানে বলা হয়েছে যে, তারতীল সহকারে পড়তে হবে। تَرتِيل বলে উদ্দেশ্য হলো ধীরে ধীরে সঠিকভাবে বাক্য উচ্চারণ করা। অর্থাৎ কুরআনের শব্দগুলো ধীরে ধীরে মুখে উচ্চারণ করার সাথে সাথে তা উপলব্ধি করার জন্য গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনাও করতে হবে। [ইবন কাসীর]

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কুরআন পাঠের নিয়ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, শব্দগুলোকে টেনে টেনে পড়তেন। উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" পড়ে বললেন যে, তিনি আল্লাহ, রাহমান এবং রাহীম শব্দকে মদ্দ করে বা টেনে পড়তেন।" [বুখারী: ৫০৪৬]

উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু 'আনহাকে একই প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক একটি আয়াত আলাদা আলাদা করে পড়তেন এবং প্রতিটি আয়াত পড়ে থামতেন। তিনি 'আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' বলে থামতেন। তারপর 'আর-রাহমানির রাহীম' বলে থামতেন। তারপর 'মালিকি ইয়াওমিদীন' বলে থামতেন। [মুসনাদে আহমাদ: ৬/৩০২, আবু দাউদ: ১৪৬৬, তিরমিযী: ২৯২৭]

হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, একদিন রাতে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সালাত পড়তে দাঁড়ালাম। আমি দেখলাম, তিনি এমনভাবে কুরআন তেলাওয়াত করছেন যে, যেখানে তাসবীহের বিষয় আসছে সেখানে তিনি তাসবীহ পড়ছেন, যেখানে দো'আর বিষয় আসছে সেখানে দোআ, করছেন এবং যেখানে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনার বিষয় আসছে সেখানে তিনি আশ্রয় প্রার্থনা করছেন। [মুসলিম: ৭৭২]

আবু যার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণনা করেন, একবার রাতের সালাতে কুরআন তেলাওয়াত করতে করতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন এ আয়াতটির কাছে পৌছলেন "আপনি যদি তাদের শাস্তি দেন, তবে তারা আপনারই বান্দা। আর যদি আপনি তাদের ক্ষমা করে দেন, তাহলে আপনি পরাক্রমশালী ও বিজ্ঞ" তখন তিনি বার বার এ আয়াতটিই পড়তে থাকলেন এবং এভাবে ভোর হয়ে গেল। [মুসনাদে আহমাদ: ৫/১৪৯]

সাহাবী ও তাবেয়ীগণেরও এই অভ্যাস ছিল। তাছাড়া, যথাসম্ভব সুললিত স্বরে তিলাওয়াত করাও তারতীলের অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে নবী সশব্দে সুললিত স্বরে তেলাওয়াত করেন, তার কেরাআতের মত অন্য কারও কেরাআত আল্লাহ তা'আলা শুনেন না। [বুখারী: ৫০২৩, ৫০২৪] তবে পরিস্কার ও বিশুদ্ধ উচ্চারণসহ শব্দের অন্তর্নিহিত অর্থ চিন্তা করে তদ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়াই আসল তারতীল। অনুরূপভাবে সুন্দর করে পড়াও এর অংশ। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যে কুরআনকে সুন্দর স্বরে পড়ে না সে আমার দলভুক্ত নয়।" [বুখারী: ৭৫২৭]

অন্য হাদীসে এসেছে, "তোমরা কুরআনকে তোমাদের সুর দিয়ে সৌন্দর্যমণ্ডিত কর" [ইবনে মাজহঃ ১৩৪২] আবু মুসা আল-আশা'আরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু সুমিষ্ট স্বরে কুরআন পাঠ করতেন বিধায় রাসূল তার প্রশংসা করে বলেছিলেন, "তোমাকে দাউদ পরিবারের সুর দেয়া হয়েছে"। [বুখারী: ৫০৪৮, মুসলিম: ৭৯৩] তাছাড়া হাদীসে আরও এসেছে, "কিয়ামতের দিন কুরআনের অধিকারীকে বলা হবে, তুমি পড় এবং আরোহন করতে থাক। সেখানেই তোমার স্থান হবে যেখানে তোমার কুরআন পড়ার আয়াতটি শেষ হবে।" [আবু দাউদ: ১৪৬৪, তিরমিযী: ২৯১৪]

اِنَّا سَنُلۡقِیۡ عَلَیۡکَ قَوۡلًا ثَقِیۡلًا

৫. নিশ্চয় আমরা আপনার প্রতি নাযিল করছি গুরুভার বাণী।

এখানে ভারী বা গুরুতর বাণী বলে পবিত্র কুরআন বোঝানো হয়েছে। গুরুভার বাণী বলার কারণ হলো, তার নির্দেশ অনুসারে কাজ করা অনেক বেশী কঠিন ও গুরুতর কাজ। তাছাড়া এ জন্যও একে গুরুভার ও কঠিন বাণী বলা হয়েছে যে, তার অবতরণের ভার বহন করা অত্যান্ত কঠিন কাজ ছিল। যায়েদ ইবনে সাবেত রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন যে, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর অহী নাযিল হওয়ার সময় তিনি আমার উরুর ওপর তাঁর উরু, ঠেকিয়ে বসেছিলেন। আমার উরুর ওপর তখন এমন চাপ পড়ছিলো যে, মনে হচ্ছিলো তা এখনই ভেঙে যাবে। [বুখারী: ৭৭৫, ৫০৪৩]

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বর্ণনা করেন, আমি প্রচণ্ড শীতের দিনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অহী নাযিল হতে দেখেছি। সে সময়ও তাঁর কপাল থেকে ঘাম ঝরতে থাকতো। [বুখারী: ২] অন্য বর্ণনায় আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেছেন, উটনীর ওপর সওয়ার থাকা অবস্থায় যখনই তার ওপর অহী নাযিল হতো উটনী তখন তার বুক মাটিতে ঠেকিয়ে দিতো। অহী নাযিল শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে নড়াচড়া পর্যন্ত করতে পারতো না। [মুসনাদে আহমাদ: ৬/১১৮, মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৫০৫] [ইবনে কাসীর]

اِنَّ نَاشِئَۃَ الَّیۡلِ هِیَ اَشَدُّ وَطۡاً وَّ اَقۡوَمُ قِیۡلًا

৬. নিশ্চয় রাতের বেলার উঠা প্রবৃত্তি দলনে প্রবলতর এবং বাকস্ফুরাণে অধিক উপযোগী।

نَاشِئَةَ শব্দের ব্যাখ্যায় কয়েকটি মত আছে। একটি মত হলো, এর মানে রাতের বেলা শয্যা ত্যাগকারী ব্যক্তি। দ্বিতীয় মতটি হলো এর অর্থ রাত্রিকালীন সময়। [ইবনে কাসীর]

আয়াতে وطأً শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ এতো ব্যাপক যে, একটি মাত্র বাক্যে তা বুঝানো সম্ভব নয়। এর একটি অর্থ হলো, রাতের বেলা ইবাদাত-বন্দেগীর জন্য শয্যা ত্যাগ করে ওঠা এবং দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকা যেহেতু মানুষের স্বভাব-বিরুদ্ধ কাজ, মানুষের মন ও প্রবৃত্তি এ সময় আরাম কামনা করে, তাই এটি এমন একটি কাজ ও চেষ্টা-সাধনা যা প্রবৃত্তির জন্য অত্যন্ত কঠিন। দ্বিতীয় অর্থ হলো, রাত্রিবেলার সালাত দিনের সালাত অপেক্ষা অধিক স্থায়ী ও ফলপ্রসু। কেননা, দিনের বেলা মানুষের চিন্তা-চেতনা বিভিন্ন বিষয়ে ব্যস্ত থাকে, কিন্তু রাত্রিবেলা তা থেকে মুক্ত হয়। আরেকটি অর্থ হলো, ইবাদতকারী ব্যক্তিকে সক্রিয় রাখার পন্থা, কেননা রাত্রিবেলা বিভিন্ন চিন্তা-চেতনা ও কাজ থেকে মুক্ত হওয়ায় সে সময়ে ইবাদতে নিবিষ্ট হওয়া যায়। [কুরতুবী]

أقوم শব্দের অর্থ অধিক সঠিক। আর قِيلًا শব্দের অর্থ কথা। তাই এর আভিধানিক অর্থ হলো, "কথাকে আরো বেশী যথার্থ ও সঠিক বানায়।" অর্থাৎ রাত্রিবেলায় কুরআন তেলাওয়াত অধিক শুদ্ধতা ও স্থিরতা সহকারে হতে পারে। এর মূল বক্তব্য হলো, সে সময় মানুষ আরো বেশী প্রশান্তি, তৃপ্তি ও মনোযোগ সহকারে বুঝে কুরআন মাজীদ পড়তে পারে। কারণ, তখন বিভিন্ন প্রকার ধ্বনি ও হট্টগোল দ্বারা অন্তর ও মস্তিস্ক ব্যাকুল হয় না। [দেখুন: ফাতহুল কাদীর] ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা এর ব্যাখ্যা করেছেন "গভীর চিন্তা-ভাবনা ও মনোনিবেশসহ কুরআন পাঠের জন্য এটা একটা অপেক্ষাকৃত উপযুক্ত সময়।" [আবু দাউদ: ১৩০৪]

إِنَّ لَكَ فِى النَّهَارِ سَبۡحًا طَوِيلًا

৭. নিশ্চয় দিনের বেলায় আপনার জন্য রয়েছে দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা।

سَبۡحًا শব্দের অর্থ প্রবাহিত হওয়া ও ঘোরাফেরা করা। এ কারণেই সাঁতার কাটাকে سباحة বলা হয়। এখানে এর অর্থ দিনমানের কর্মব্যস্ততা ও জীবিকার জন্য ঘোরাঘুরির কারণে অন্তরের ব্যস্ততা। দিনের কর্মব্যস্ততার কারণে একাগ্রচিত্তে ইবাদতে মনোনিবেশ করা কঠিন হয়ে পড়ে। তাই রাত্রি একাজের জন্য থাকা উচিত যে, প্রয়োজন মাফিক নিদ্রা ও আরাম এবং তাহাজ্জুদের ইবাদতও হয়ে যায়।

وَاذۡكُرِ اسۡمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلۡ إِلَيۡهِ تَبۡتِيلًا

৮. আর আপনি আপনার রবের নাম স্মরণ করুন এবং তার প্রতি মগ্ন হোন একনিষ্ঠভাবে।

আপনি সমগ্র সৃষ্টি থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টিবিধানে ও ইবাদতে মগ্ন হোন। এর সাধারণ অর্থে ইবাদতে শির্ক না করাও দাখিল এবং নিজের সমস্ত কর্মকাণ্ডে তথা উঠাবসায়, চলাফেরায় দৃষ্টি ও ভরসা আল্লাহর প্রতি নিবদ্ধ রাখা এবং অপরকে লাভ-লোকসান ও বিপদাপদ থেকে উদ্ধারকারী মনে না করাও দাখিল। দুনিয়া ও দুনিয়ার সবকিছুকে পরিত্যাগ করে আল্লাহর কাছে যা আছে তৎপ্রতি মনোনিবেশ করাও এর অর্থের অন্তর্গত। কিন্তু এই تَبۡتِيل তথা দুনিয়ার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ সেই رهبانية তথা বৈরাগ্য থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন কুরআনে যার নিন্দা করা হয়েছে এবং হাদীসে তা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। কেননা, শরীয়াতের পরিভাষায় رهبانية বা বৈরাগ্য এর অর্থ দুনিয়ার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা এবং ভোগ সামগ্রী ও হালাল বস্তুসমূহকে ইবাদতের নিয়তে পরিত্যাগ করা।

পক্ষান্তরে এখানে যে সম্পর্কচ্ছেদের আদেশ করা হয়েছে, তা এই যে, বিশ্বাসগতভাবে অথবা কার্যগতভাবে আল্লাহর সম্পর্কের উপর কোন সৃষ্টির সম্পর্ককে প্রবল হতে না দেয়া। এ ধরণের সম্পর্কচ্ছেদ বিবাহ, আত্মীয়তার সম্পর্ক ইত্যাদি যাবতীয় সাংসারিক কাজ-কারবারের পরিপন্থী নয়; বরং এগুলোর সাথে জড়িত থেকেও এটা সম্ভবপর। রাসূলগণের সুন্নত; বিশেষতঃ রাসূলকুল শিরোমণি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সমগ্র জীবন ও আচারাদি এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। আয়াতে تَبْتِيل শব্দ দ্বারা যে অর্থ ব্যক্ত করা হয়েছে, মূলত তা হলো সকল ইবাদত একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর জন্য করা এবং এর মাধ্যমে একমাত্র তাঁরই মুখাপেক্ষী হওয়া।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করতেন, আবার বিবাহ করে সংসার গড়েছেন, রোযা রাখতেন আবার রোযা ছাড়তেন, রাতে সালাত আদায় করতেন আবার ঘুমাতেন। এটাই সুন্নাত তরিকা। অতএব এ তরিকা বর্জন করে অন্য তরিকা গ্রহণ করা সম্পূর্ণ শরীয়ত গর্হিত কাজ। কখনো এমন আমল আল্লাহ তা'আলার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। (সহীহ বুখারী হা. ৫০৬৩)

তাই পার্থিব কর্ম ব্যস্ততার পাশাপাশি সময়-সুযোগ করে নিয়ে একাগ্রচিত্তে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করা প্রশংসনীয়। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সালাতসহ যখন কোন আমল করতেন তখন তা নিয়মিত করার চেষ্টা করতেন। যদি রাতে ঘুমের কারণে অথবা অসুস্থতার কারণে তাহজ্জুত আদায় না করতে পারতেন তাহলে দিনে বার রাকাত আদায় করে নিতেন। তবে কখনো তিনি একরাতে কুরআন শেষ করেননি এবং সারা রাত জাগেননি, রমযান ছাড়া অন্য কোন পূর্ণমাস সিয়াম পালন করেননি। (সহীহ ইবনু খুযাইমাহ হা. ১১৭৭)

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا

৯. তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের রব, তিনি ছাড়া কোন সত্য ইলাহ নেই; অতএব তাকেই আপনি গ্রহণ করুন কর্মবিধায়করূপে।

যাকে কোন কাজ সোপর্দ করা হয়, অভিধানে তাকে وَكِيلٌ, বলা হয়। কাজেই فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا বাক্যের অর্থ এই যে, নিজের সব কাজ-কারবার ও অবস্থা আল্লাহর কাছে সোপর্দ কর। পরিভাষায় একেই তাওয়াক্কুল বলা হয়। এই সূরায় রসূলুল্লাহ (সা)-কে প্রদত্ত নির্দেশাবলীর মধ্যে এটা পঞ্চম নির্দেশ। ইমাম ইয়াকুব কারখী (র) বলেন: সূরার শুরু থেকে এই আয়াত পর্যন্ত সুলুক তথা আল্লাহর পথে চলার পাঁচটি স্তরের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে ১. রাত্রিবেলায় আল্লাহর ইবাদতের জন্য নির্জনে গমন, ২. কোরআন পাকে মশগুল হওয়া, ৩. সর্বদা আল্লাহর স্মরণ ৪. সৃষ্টির সাথে সম্পর্কচ্ছেদ এবং ৫. তাওয়াক্কুল। তাওয়াক্কুলের সর্বশেষ নির্দেশ দেওয়ার পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলার গুণ رَّبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ বর্ণনা করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যে পবিত্র সত্ত্বা পূর্ব-পশ্চিম তথা সারা জাহানের পালন করা এবং সারা জাহানের প্রয়োজনাদি আগা গোড়া পূর্ণ করার যিম্মাদার, একমাত্র তিনিই তাওয়াক্কুল ও ভরসা করার যোগ্য হতে পারেন এবং তার উপর যে ব্যক্তি ভরসা করবে, সে কখনও বঞ্চিত হবে না। কোরআনের অন্য এক আয়াতে আছে অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে, তার যাবতীয় প্রয়োজনাদি ও বিপদাপদের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

তাওয়াক্কুলের শরীয়তসম্মত অর্থ: আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করার অর্থ এরূপ নয় যে, জীবিকা উপার্জন ও আত্মরক্ষার যেসব উপকরণ ও হাতিয়ার আল্লাহ্ তা'আলা দান করেছেন, সেগুলোকে নিষ্ক্রিয় করে আল্লাহর উপর

ভরসা করতে হবে। বরং তাওয়াক্কুলের স্বরুপ এই যে, উদ্দেশ্য সাধনে আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি, সামর্থ্য ও উপকরণাদি পুরোপুরি ব্যবহার কর, কিন্তু বৈষয়িক উপকরণাদিতে অতিমাত্রায় মগ্ন হয়ে যেও না। ইচ্ছাধীন কাজকর্ম সম্পন্ন করার পর ফলাফল আল্লাহর কাছে সোপর্দ করে নিশ্চিন্ত হয়ে যাও।

তাওয়াক্কুলের এই অর্থ স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সাঃ) বর্ণনা করেছেন। ইমাম বগভীও বায়হাকী (রঃ) বর্ণিত এক হাদীসে তিনি বলেনঃ ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها ألا فاتقوا الله وأجملوا في الطلب অর্থাৎ কোন ব্যক্তি তখন পর্যন্ত মৃত্যুমুখে পতিত হবে না, যে পর্যন্ত যে তার অবধারিত ও লিখিত রিযিক পুরোপুরি হাসিল না করে। কাজেই তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং স্বীয় উদ্দেশ্য অর্জনে এতদূর মগ্ন হয়ো না যে, অন্তরের সমস্ত অভিনিবেশ বৈষয়িক উপকরণাদির মধ্যেই সীমিত থেকে যায় এবং তোমরা আল্লাহর উপর ভরসা কর। তিরমিযীতে আবূ যর গিফারী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন : দুনিয়া ত্যাগ এর নাম নয় যে, তোমরা হালালকৃত বস্তুসমূহকে নিজেদের জন্য হারাম করে নেবে অথবা নিজেদের ধন-সম্পদ অযথা উড়িয়ে দেবে। বরং দুনিয়া ত্যাগের অর্থ এই যে, তোমাদের কাছে যা আছে, তার তুলনায় আল্লাহর কাছে যা আছে তার উপর তোমাদের ভরসা বেশী হবে। [তাফসীরে মাযহারী]

وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا

১০. আর লোকে যা বলে, তাতে আপনি ধৈর্য ধারণ করুন এবং সৌজন্যের সাথে তাদেরকে পরিহার করে চলুন।

আল্লাহ তা'আলা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে রিসালাত গ্রহণের প্রস্তুতি, আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে মগ্ন হওয়া ইত্যাদি নির্দেশের পর অত্র আয়াতগুলোতে কাফির-মুশরিকদের মিথ্যা অপবাদ, অকথ্য গালিগালাজ এবং ঠাট্টা-বিদ্রুপে ধৈর্য ধারণ করার নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি তাদেরকে সৌজন্যতার সাথে পরিহার করার উপদেশ দিচ্ছেন। কারণ সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের স্বভাব হল তারা সত্য গ্রহণ করবে না, বরং সত্যাগ্রহীদের অপবাদ দেবে, গালিগালাজ করবে এবং তাদের নিয়ে ঠাট্টা-ব্যঙ্গ করবে। এটা নতুন নয়, পূর্বেও ফিরআউন সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিল, ফলে তাকে পাকড়াও করেছিলাম। তাই এসব সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী ও মিথ্যুকদেরও পাকড়াও করব এবং তাদের জন্য আখিরাতে ন্যাক্কারজনক শাস্তি প্রস্তুত করা আছে।

"আলাদা হয়ে যাও" কথাটির অর্থ এই নয় যে, তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ইসলামের তাবলীগের কাজ বন্ধ করে দাও। বরং এর অর্থ হলো, তাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করো না, তাদের অন্যায় ও অর্থহীন আচরণ উপেক্ষা করে চলো এবং তাদের কোন অভদ্র আচরণের জবাব দিও না। তবে তাদের প্রতি এ উপেক্ষা এবং নির্লিপ্ততাও যেন কোন প্রকার ক্ষোভ, ক্রোধ এবং বিরক্তিসহ না হয়। বরং তা যেন এমন উপেক্ষা হয়, যেমন একজন ভদ্র মানুষ কোন অসভ্য বাউণ্ডেলে বা বখাটে লোকের গালি শুনে যেমন তা উপেক্ষা করে এবং মনকে ভারাক্রান্ত হতে পর্যন্ত দেয় না। এ থেকে এরূপ ভুল ধারণা সৃষ্টি হওয়া ঠিক নয় যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কর্মপদ্ধতি বোধ হয় এ থেকে কিছুটা ভিন্ন ধরনের ছিল। তাই আল্লাহ তাঁকে এ আদেশ করেছেন। তিনি মূলত প্রথম থেকেই এ কর্মপদ্ধতি অনুযায়ী কাজ করেছিলেন। তবে কুরআনে এ নির্দেশ দেয়ার উদ্দেশ্য হলো কাফেরদের একথা জানিয়ে দেয়া যে, তোমরা যে আচরণ করছো তার জবাব না দেয়ার কারণ দুর্বলতা নয়। বরং এরূপ আচরণের জবাবে আল্লাহ তাঁর রসূলকে এ ধরনের ভদ্রজনোচিত পন্থা গ্রহণ করার শিক্ষা দিয়েছেন।

وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا

১১. আর ছেড়ে দিন আমাকে ও মিথ্যারোপকারীদেরকে; এবং কিছু কালের জন্য তাদেরকে অবকাশ দিন,

আয়াতে কাফিরদেরকে أُولِي النَّعْمَةِ বলা হয়েছে। نعمة শব্দের অর্থ ভোগ-বিলাস, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্য। এতে ইঙ্গিত আছে যে, দুনিয়ার ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে যাওয়া পরকাল অবিশ্বাসীরই কাজ হতে পারে। মু'মিনও মাঝে মাঝে এগুলো প্রাপ্ত হয়, কিন্তু সে তাতে মত্ত হয়ে পড়ে না। দুনিয়ার আরাম-আয়েশের মধ্যে থেকেও তার অন্তর পরকাল চিন্তা থেকে মুক্ত হয় না।

একথা থেকে এ মর্মে স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, মক্কায় যেসব লোক রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি মিথ্যা আরোপ করছিল এবং নানাভাবে ধোঁকা দিয়ে এবং নানা রকমের স্বার্থপ্রীতি সংকীর্ণতা ও বিদ্বেষ উস্কে দিয়ে তাঁর বিরোধিতায় নামছিল তারা সবাই ছিল জাতির সচ্ছল, সম্পদশালী ও বিলাসপ্রিয় মানুষ। কারণ ইসলামের এ সংস্কার আন্দোলনের আঘাত তাদের স্বার্থের ওপর সরাসরি পড়ছিল। কুরআন আমাদের বলে যে, এ আচরণ শুধু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথেই ছিল না বরং যে গোষ্ঠী চিরদিনই সংস্কার ও সংশোধনের পথ রুদ্ধ করার জন্য জগদ্দল পাথরের মত বাধা সৃষ্টি করে এসেছে।

اِنَّ لَدَيۡنَاۤ اَنۡكَالًا وَّ جَحِيۡمًا

১২. নিশ্চয় আমাদের কাছে আছে শৃংখলসমূহ ও প্রজ্বলিত আগুন,

অতঃপর আখেরাতের কঠিনতম শাস্তির বর্ণনা প্রসঙ্গে أَنْكَال শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থ আটকাবস্থা ও শিকল। জাহান্নামে পাপী ও অপরাধীদের পায়ে ভারী বেড়ী পরানো হবে। তারা যাতে পালাতে না পারে সেজন্য এ বেড়ি পরানো হবে না, বরং তা পরানো হবে এজন্য যে, তারা যেন উঠতে না পারে। এ বেড়ি পালিয়ে যাওয়ার রোধ করার জন্য নয় বরং শাস্তি বৃদ্ধি করার জন্য।

وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا

১৩. আর আছে এমন খাদ্য, যা গলায় আটকে যায় এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

এরপর জাহান্নামের উল্লেখ করে জাহান্নামীদের ভয়াবহ খাদ্যের কথা বলা হয়েছে। (وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ) এর অর্থ গলগ্রহ খাদ্য। অর্থাৎ যে খাদ্য গলায় এমনভাবে আটকে যায় যে, গলাধঃকরণও করা যায় না এবং উদগীরণও করা যায় না। জাহান্নামীদের খাদ্য ضريع, غسلين ও زقوم এর অবস্থা তাই হবে। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, তাতে আগুনের কাটা থাকবে; যা গলায় আটকে যাবে। [কুরতুবী]

শেষে বলা হয়েছে: (وَعَذَابًا أَلِيمًا) নির্দিষ্ট আযাব উল্লেখ করার পর একথা বলে এর আরও অধিক অন্যান্য শাস্তির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর]

يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا

১৪. সেদিন যমীন ও পর্বতমালা প্রকম্পিত হবে এবং পর্বতসমূহ বিক্ষিপ্ত বহমান বালুকারাশিতে পরিণত হবে।

সে সময় অতি শক্ত-মজবুত পাহাড়সমূহ দূর্বল হয়ে পড়বে, তাই প্রথমে তা মিহি বিক্ষিপ্ত বালুর স্তুপে পরিণত হবে। অতঃপর বালুর এ স্তুপ বিক্ষিপ্ত হয়ে উড়ে যাবে। এরপর গোটা ভূপৃষ্ঠ একটা বিশাল প্রান্তরে রূপান্তরিত হবে। এ অবস্থার একটি চিত্র অন্যত্র এভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে, "লোকেরা আপনাকে এসব পাহাড়ের অবস্থা কি হবে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলুন, আমার রব পাহাড়সমূহকে ধুলির মত করে ওড়াবেন এবং ভূপৃষ্ঠকে এমন সমতল বিশাল প্রান্তরে রূপান্তরিত করবেন যে, তুমি সেখানে উঁচু নীচু বা ভাঁজ দেখতে পাবে না। " [সূরা ত্বা-হা: ১০৫-১০৭]

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا

১৫. নিশ্চয় আমরা তোমাদের কাছে পাঠিয়েছি এক রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ যেমন রাসূল পাঠিয়েছিলাম ফির'আউনের কাছে

মক্কার যেসব কাফের রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অস্বীকার করেছিলো এবং তাঁর বিরোধিতায় অতি মাত্রায় তৎপর ছিল এখানে তাদের উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে।

লোকদের জন্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাক্ষী বানিয়ে পাঠানোর একটি অর্থ হলো, তিনি দুনিয়ায় তাদের সামনে নিজের কথা ও কাজের মাধ্যমে সত্যের সাক্ষ্য পেশ করবেন। আরেকটি হলো, আখেরাতে যখন আল্লাহর আদালত কায়েম হবে সে সময় তিনি সাক্ষ্য দেবেন যে, এসব লোকের কাছে আমি সত্যের আহবান পৌঁছিয়ে দিয়েছিলাম।

فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا

১৬. কিন্তু ফিরআউন সে রাসূলকে অমান্য করেছিল, ফলে আমরা তাকে অত্যন্ত শক্তভাবে পাকড়াও করেছিলাম।

فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا

১৭. অতএব যদি তোমরা কুফরী কর, তবে কি করে আত্মরক্ষা করবে সেদিন যে দিনটি কিশোরদেরকে পরিণত করবে বৃদ্ধে,

شِيْبٌ হল أَشْيَبٌ এর বহুবচন। কিয়ামতের দিন কিয়ামতের ভয়াবহতায় শিশুরা সত্যিকারেই বৃদ্ধ হয়ে যাবে। অথবা কেবল উপমাস্বরূপ এ রকম বলা হয়েছে। হাদীসেও এসেছে যে, "কিয়ামতের দিন আল্লাহ আদম (আঃ)-কে বলবেন, তোমার সন্তানদের মধ্য থেকে জাহান্নামীদেরকে বের করে নাও। তিনি বলবেন, 'হে আল্লাহ! কেমন করে?' মহান আল্লাহ বলবেন, 'প্রত্যেক হাজার থেকে ৯৯৯ জনকে।' সেই দিন গর্ভবতীর গর্ভস্থ ভ্রূণ খসে পড়বে এবং শিশুরা বৃদ্ধ হয়ে যাবে।" ব্যাপারটা সাহাবায়ে কেরামদের নিকট বড় কঠিন মনে হল এবং তাঁদের চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তা দেখে রসূল (সাঃ) বললেন, "ইয়া'জূজ-মা'জূজ সম্প্রদায় থেকে ৯৯৯ জন হবে এবং তোমাদের থেকে একজন। আল্লাহর দয়ায় আমি আশা করি, সমস্ত জান্নাতীদের মধ্যে আমরা অর্ধেক হব।" (বুখারী, তাফসীর সূরাতুল হাজ্জ)

السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا

১৮. সে-দিন আসমান হবে বিদীর্ণ তাঁর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে।

إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا

১৯. এটা এক উপদেশ। অতএব যার ইচ্ছা সে তার প্রতিপালকের পথ অবলম্বন করুক।

(إِنَّ هٰذِهٖ) অর্থাৎ এ সূরাটি একটি উপদেশ। এতে সত্য গ্রহণের পাথেয় ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করার খারাপ পরিণামের বিবরণ রয়েছে। অতএব যারা চায় প্রতিপালকের পথ অবলম্বন করতে তারা যেন এখান থেকে উপদেশ গ্রহণ করে। যে কেউ হিদায়াত প্রার্থী হবে সেই প্রতিপালকের মর্জি হিসেবে হিদায়াতের পথ পেয়ে যাবে এবং তাঁর কাছে পৌঁছে যাওয়ার ওয়াসীলা লাভ করবে। যেমন অন্য সূরায় বলেনঃ "তোমরা ইচ্ছা করবে না যদি না আল্লাহ ইচ্ছা করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।" (৭৬:৩০) ।

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

২০. নিশ্চয় আপনার রব জানেন যে, আপনি সালাতে দাঁড়ান কখনও রাতের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ, কখনও অর্ধাংশ এবং কখনও এক-তৃতীয়াংশ এবং দাঁড়ায় আপনার সঙ্গে যারা আছে তাদের একটি দলও। আর আল্লাহ্ই নির্ধারণ করেন দিন ও রাতের পরিমাণ। তিনি জানেন যে, তোমরা এটা পুরোপুরি পালন করতে পারবে না। তাই আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করলেন। কাজেই কুরআন থেকে যতটুকু সহজ ততটুকু পড়, আল্লাহ জানেন যে, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়বে, আর কেউ কেউ আল্লাহ্র অনুগ্রহ সন্ধানে দেশ ভ্রমন করবে এবং কেউ কেউ আল্লাহর পথে লড়াইয়ে লিপ্ত হবে। কাজেই তোমরা কুরআন হতে যতটুকু সহজসাধ্য ততটুকু পড়। আর তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহকে দাও উত্তম ঋণ। তোমরা তোমাদের নিজেদের জন্য ভাল যা কিছু অগ্রিম পাঠাবে তোমরা তা পাবে আল্লাহর কাছে। তা উৎকৃষ্টতর এবং পুরস্কার হিসেবে মহত্তর। আর তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর আল্লাহর কাছে; নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরার শুরুতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সকল মুসলিমের উপর তাহাজ্জুদ ফরয করা হয়েছিল এবং এই সালাত অর্ধারাত্রির কিছু বেশী এবং কমপক্ষে এক তৃতীয়াংশ রাত্রি পর্যন্ত দীর্ঘ হওয়াও ফরয ছিল। আল্লাহর জ্ঞান অনুযায়ী যখন এর উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে গেল, তখন তাহাজ্জুদের ফরয রহিত করে সে নির্দেশ শিথিল ও সহজ করে দেয়া হলো। [দেখুন: কুরতুবী]

تُحْصُوه এর মূল হলো إحصاء যার অর্থ গণনা করা। যেমন, পবিত্র কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে, (وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا) "আর তিনি (আল্লাহ) সবকিছু সংখ্যায় গণনা করে রেখেছেন।" [সূরা আল-জিন্ন: ২৮] অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা জানেন যে, তোমরা এর গণনা করতে পারবে না। তাহাজ্জুদের সালাতে আল্লাহ্ তা'আলা রাত্রির এক-তৃতীয়াংশ থেকে দুই-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত সময় নির্ধারণ করেছিলেন। কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের পক্ষে এই সালাতে মশগুল থাকা অবস্থায় রাত্র কতটুকু হয়েছে, তা জানা কঠিন ছিল। [দেখুন: কুরতুবী; সা'দী]

আবার কোন কোন তাফসীরবিদ বলেন, إحصاءঅর্থ কোন কিছু যথানিয়মে কাজে লাগানো বা সক্ষম হওয়া। সে হিসেবে এখানে (لَنْ تُحْصُوهُ) শব্দের অর্থ দীর্ঘ সময় এবং নিদ্রার সময়ে প্রত্যেকে যথারীতি সালাত পড়তে সক্ষম না হওয়া। [তাবারী] এ অর্থে শব্দটির ব্যবহার এসেছে, যেমন হাদীসে আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ সম্পর্কে বলা হয়েছে, من أحصاها دخل الجنة অর্থাৎ "যে ব্যক্তি আল্লাহর নামসমূহকে কর্মের ভিতর দিয়ে পুরোপুরি ফুটিয়ে তোলে সে জান্নাতে দাখিল হবে।" [বুখারী: ৬৪১০, মুসলিম: ২৬৭৭]।

تابশব্দের আসল অর্থ প্রত্যাবর্তন করা। গোনাহের তাওবাকেও এ কারণে তাওবা বলা হয় যে, মানুষ এতে পূর্বের গোনাহ থেকে প্রত্যাবর্তন করে। কেউ কেউ বলেন, এখানে কেবল প্রত্যাহার বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ফরয তাহাজ্জুদের আদেশ প্রত্যাহার করে নিয়েছেন।

فَاقْرَأُوْا(কুরআনের যতটুকু আবৃত্তি করা তোমাদের জন্য সহজ, ততটুকু আবৃত্তি কর) এর অর্থ হল, فَصَلُّوْا(তোমরা নামায পড়)। আর 'কুরআন' বলতে এখানে الصَّلاَةَ(নামায) বুঝানো হয়েছে। যেহেতু তাহাজ্জুদের নামাযে কিয়াম (দাঁড়ানো) অনেক লম্বা হয় এবং কুরআন খুব বেশী পড়া, তাই তাহাজ্জুদের নামাযকেই কুরআন বলে আখ্যায়িত করা হয়। যেমন, নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া একান্ত জরুরী হওয়ার কারণে মহান আল্লাহ হাদীসে ক্বুদসীতে এটা (সূরা ফাতিহা)-কে 'নামায' বলে আখ্যায়িত করেছেন, قَسَّمْتُ الصَّلاَةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي । কাজেই 'যতটুকু কুরআন পড়া সহজ হয়, ততটুকু পড়'এর অর্থ হল, রাতে যত রাকআত নামায পড়া সহজসাধ্য হয়, তত রাকআত পড়ে নাও। এর জন্য না সময় নির্ধারণের প্রয়োজন আছে, আর না রাকআতের ব্যাপারে কোন ধরাবাঁধা সংখ্যা আছে। এই আয়াতের ভিত্তিতে কেউ কেউ বলেছেন যে, নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া জরুরী নয়। যার জন্য কুরআনের যে অংশ পড়া সহজ, সে তা পড়ে নেবে। কেউ যদি কুরআনের যে কোন স্থান থেকে একটি আয়াতও পড়ে নেয়, তারও নামায হয়ে যাবে। কিন্তু প্রথমতঃ এখানে কুরআন বা 'ক্বিরাআত' অর্থ নামায যা আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি। অতএব আয়াতের সম্পর্ক এর সাথে নেই যে, নামাযে কতটা ক্বিরাআত পড়া জরুরী? দ্বিতীয়তঃ যদি মেনেও নেওয়া যায় যে, এর সম্পর্ক ক্বিরাআতের সাথে, তবুও এ দলীলের মধ্যে কোন শক্তি নেই। কেননা, مَا تَيَسَّرَ তফসীর স্বয়ং নবী করীম (সাঃ) করে দিয়েছেন। অর্থাৎ, কমসে-কম যে ক্বিরাআত ব্যতীত নামায হয় না তা হল, সূরা ফাতিহা। এই জন্যই তিনি বলেছেন, এটা (সূরা ফাতিহা) অবশ্যই পড়। যেমন সহীহ এবং অত্যধিক শক্তিশালী ও স্পষ্ট হাদীসমূহে এ নির্দেশ রয়েছে। নবী করীম (সাঃ) এর ব্যাখ্যার বিপরীত এই বলা যে, 'নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া জরুরী নয়, বরং যে কোন একটি আয়াত পড়লেই নামায হয়ে যাবে' বড়ই দুঃসাহসিকতা এবং নবী (সাঃ)-এর হাদীসকে কোন গুরুত্ব না দেওয়ারই নামান্তর। অনুরূপ এটা ইমামদের উক্তিরও বিপরীত। তাঁরা উসূলের কিতাবগুলোতে লিখেছেন যে, এই আয়াতকে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা না পড়ার দলীল হিসাবে গ্রহণ করা ঠিক নয়। কারণ, দু'টি আয়াত পরস্পর বিপরীতমুখী। তবে কেউ যদি জেহরী (মাগরেব, এশা, ফজর, জুমআহ, তারাবীহ, ঈদ প্রভৃতি) নামাযে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা না পড়ে, তাহলে ইমামদের কেউ কেউ কোন কোন হাদীসের ভিত্তিতে তা জায়েয বলেছেন। আবার কেউ তো না পড়াকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

হালাল ও বৈধ উপায়ে রুজি অর্জনের উদ্দেশে সফর করাকে কুরআন মজীদ বিভিন্ন স্থানে আল্লাহর মেহেরবাণী ও করুণা অনুসন্ধান বলে আখ্যায়িত করেছে। ব্যবসা-বাণিজ্য এবং কাজ-কর্মের জন্য সফর করবে। এক শহর থেকে অন্য শহরে অথবা এক দেশ থেকে অন্য এক দেশে যাতায়াত করবে। ফলে রাতের সালাত আদায় কষ্টকর হয়ে যাবে। তাই আল্লাহ তা'আলা এ বিধান সহজ করে নফলের পর্যায়ে রাখলেন। অনুরূপ জিহাদেও সফরের কষ্ট ও কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। আর এই তিনটি জিনিসেরই --অসুস্থতা, সফর এবং জিহাদ-- পালাক্রমে

সকলেই শিকার হয়ে থাকে। এই জন্য আল্লাহ তাআলা রাতে কিয়াম করার জরুরী নির্দেশকে শিথিল করে দেন। কেননা, এই তিনটি অবস্থাতে এ কাজ অতি কঠিন এবং বড়ই ধৈর্যসাপেক্ষ কাজ।

শিথিল ও হাল্কা করার কারণসমূহ বর্ণনার সাথে এখানে পুনরায় উক্ত নির্দেশ হাল্কা করার কথাকে তাকীদ স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে।

আর তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর- এখানে নামায কায়েম করা এবং যাকাত দেয়া বলতে পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায এবং ফরয যাকাত বুঝানো হয়েছে।

এবং আল্লাহকে দাও উত্তম ঋণ- মূলত এখানে ফরয ও নফল দান-খয়রাত ও কার্যাদি বোঝানো হয়েছে। আল্লাহর পথে ব্যয় করাকে এমনভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যেন ব্যয়কারী আল্লাহকে ঋণ দিচ্ছে। কেউ কেউ এর অর্থ এই নিয়েছেন যে, যাকাত ছাড়াও অনেক আর্থিক ওয়াজিব পাওনা মানুষের উপর বর্তে; যেমন: স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির ভরণ-পোষণ ইত্যাদি। আল্লাহর রাস্তায় প্রয়োজন ও সাধ্যমত ব্যয় কর। এটাকে 'ক্বারযে হাসানা' (উত্তম ঋণ) নামে এই জন্য আখ্যায়িত করা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ এর পরিবর্তে সাতশ গুণ বরং তার থেকেও বেশী সওয়াব দান করবেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "কে সে, যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান করবে? তিনি তার জন্যে এটা বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন।" (২:২৪৫)

তোমরা তোমাদের নিজেদের জন্য ভাল যা কিছু অগ্রিম পাঠাবে তোমরা তা পাবে আল্লাহর কাছে- এর অর্থ হলো, আখেরাতের জন্য যা কিছু তোমরা আগেই পাঠিয়ে দিয়েছে তা তোমাদের ঐ সব জিনিসের চেয়ে অনেক বেশী উপকারী যা তোমরা দুনিয়াতেই রেখে দিয়েছে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের নিমিত্ত কোন কল্যাণকর কাজে ব্যয় করোনি। হাদীসে উল্লেখ আছে, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, "তোমাদের এমন কেউ আছে যার নিজের অর্থ-সম্পদ তার উত্তরাধিকারীর অর্থ-সম্পদের চেয়ে তার কাছে বেশী প্রিয়? জবাবে লোকেরা বললো, হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের মধ্যে কেউ-ই এমন নেই যার নিজের অর্থ-সম্পদ তাঁর কাছে তার উত্তরাধিকারীর অর্থ-সম্পদ থেকে বেশী প্রিয় নয়। তখন তিনি বললেনঃ তোমরা কি বলছে তা ভেবে দেখো। লোকেরা বললো, হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের অবস্থা আসলেই এরূপ। একথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমাদের নিজের অর্থ-সম্পদ তো সেইগুলো যা তোমরা আখেরাতের জন্য অগ্রিম পাঠিয়ে দিয়েছে। আর যা তোমরা রেখে দিয়েছে সেগুলো ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারীদের অর্থ-সম্পদ। [বুখারী: ৬৪৪২] [ইবন কাসীর]

ফুটনোট

▣ তাহাজ্জুদ করা অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ এবং এতে কুরআন তিলাওয়াত করাও অত্যন্ত ফজিলতপূর্ণ।

▣ তারতীলের সাথে অর্থাৎ ধীরে সুস্পষ্টভাবে কুরআন তেলাওয়াতের কথা বলা হয়েছে।

▣ প্রত্যকে দিনে এমন কিছু সময় আলাদা করে রাখা উচিত যাতে মনোযোগ শুধুমাত্র আল্লাহর দিকে থাকে, কোনো রকম বিভ্রান্তি ছাড়াই।

▣ আল্লাহর একটি পরিচয় এ সূরায় বলা হয়েছে যে, তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের রব।

▣ সকল ইবাদত একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর জন্য করা এবং এর মাধ্যমে একমাত্র তাঁরই মুখাপেক্ষী হওয়া।

▣ আল্লাহর পথে চলার পাঁচটি স্তরের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে ১. রাত্রিবেলায় আল্লাহর ইবাদতের জন্য নির্জনে গমন, ২. কোরআন পাকে মশগুল হওয়া, ৩. সর্বদা আল্লাহর স্মরণ ৪. সৃষ্টির সাথে সম্পর্কছেদ এবং ৫. তাওয়াক্কুল।

▣ তাওয়াক্কুলের স্বরুপ এই যে, উদ্দেশ্য সাধনে আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি, সামর্থ্য ও উপকরণাদি পুরোপুরি ব্যবহার কর, কিন্তু বৈষয়িক উপকরণাদিতে অতিমাত্রায় মগ্ন হয়ে যেও না। ইচ্ছাধীন কাজকর্ম সম্পন্ন করার পর ফলাফল আল্লাহর কাছে সোপর্দ করে নিশ্চিন্ত হয়ে যাও।

▣ কুরআন একটি উপদেশবানী; যে কেউ এটি থেকে উপকৃত হতে পারে এবং সর্বশক্তিমানের কাছে পৌঁছাতে পারে।

▣ কাফির-মুশরিকদের মিথ্যা অপবাদ, অকথ্য গালিগালাজ এবং ঠাট্টা-বিদ্রুপে ধৈর্য ধারণ করার নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি তাদেরকে সৌজন্যতার সাথে পরিহার করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

▣ হালাল ও বৈধ উপায়ে রুজি অর্জনের উদ্দেশে সফর করাকে কুরআন মজীদ বিভিন্ন স্থানে আল্লাহর মেহেরবাণী ও করুণা অনুসন্ধান বলে আখ্যায়িত করেছে।

▣ তিনটি অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা সকল ফরয বিধান সহজ করে নফলের পর্যায়ে রাখলেন। এই তিনটি হলো- অসুস্থতা, সফর এবং জিহাদ- পালাক্রমে সকলেই শিকার হয়ে থাকে।

▣ আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা, কারণ আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

▣ আল্লাহর রাস্তায় প্রয়োজন ও সাধ্যমত ব্যয় কর। এটাকে 'ক্বারযে হাসানা' (উত্তম ঋণ) নামে এই জন্য আখ্যায়িত করা হয়েছে।

কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২৪
প্রস্তুতি সহায়ক তাফসীর নোট পর্বঃ ২০

সূরা কিয়ামাহ

সূরা আল-ক্বিয়ামাহ কুরআনের ৭৫ তম সূরা; এর আয়াত সংখ্যা ৪০ এবং রূকু সংখ্যা ২। সূরা আল-ক্বিয়ামাহ মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে।

নামকরণ

সূরার প্রথম আয়াতের ٱلْقِيَٰمَةِ আলকিয়ামহ শব্দটিকে এ সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এটি শুধু সূরাটির নামই নয়, বরং বিষয়ভিত্তিক শিরোনামও। কারণ এ সূরায় শুধু কিয়ামত সম্পর্কে আলোচন করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

কোন হাদীস থেকে যদিও এ সূরার নাযিল হওয়ার সময়-কাল জানা যায় না। কিন্তু এর বিষয়বস্তুর মধ্যেই এমন একটি প্রমাণ বিদ্যমান যা থেকে বুঝা যায়, এটি নবুয়াতের একেবারে প্রথম দিকে অবতীর্ণ সূরাসমূহের অন্যতম। সূরার ১৫ আয়াতের পর হঠাৎ ধারাবাহিকতা ক্ষুন্ন করে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে: এ অহীকে দ্রুত মুখস্ত করার জন্য তুমি জিহবা নাড়বে না। এ বাণীকে স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং পড়িয়ে দেয়া আমার দায়িত্ব। অতএব আমি যখন তা পড়ি তখন তুমি তা মনোযোগ দিয়ে শুনতে থাকো। এর অর্থ বুঝিয়ে দেয়াও আমার দায়িত্ব। এরপর ২০ নম্বর আয়াত থেকে আবার সে পূর্বের বিষয়ে আলোচনা শুরু হচ্ছে যা প্রথম থেকে ১৫ নম্বর আয়াত পর্যন্ত চলছিল। সে সময় হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম এ সূরাটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শুনাচ্ছিলেন পরে ভুলে যেতে পারেন এ আশংকায় তিনি এর কথাগুলো বার বার মুখে আওড়াচ্ছিলেন। এ কারণে পূর্বাপর সম্পর্কহীন এ বাক্যটি পরিবেশ ও পরিস্থিতি এবং হাদীসের বর্ণনা উভয় দিক থেকেই বক্তব্যের মাঝখানে সন্নিবেশিত হওয়া যথার্থ হয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, এ ঘটনা সে সময়ের যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবে মাত্র অহী নাযিলের নতুন নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করছেন এবং অহী গ্রহণের পাকাপোক্ত অভ্যাস তাঁর তখনো ও গড়ে ওঠেনি। কুরআন মজীদে এর আরো দু’টি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। একটি সূরা ত্বা-হা যেখানে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাল্লাহকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে:وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ "আর দেখো, কুরআন পড়তে তাড়াহুড়া করো না, যতক্ষণ না তোমাকে অহী পূর্ণরূপে পৌঁছিয়ে দেয়া হয়। (আয়াত ১১৪)। দ্বিতীয়টি সূরা আলায়। এখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়ে বলা হয়েছে: سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى "আমি অচিরেই তোমাকে পড়িয়ে দেব তারপর তুমি আর ভুলে যাবে না।" (আয়াত ৬) পরবর্তী সময়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অহী গ্রহনে ভালভাবে অভ্যস্ত হয়ে গেলে এ ধরনের নির্দেশনা দেয়ার আর প্রয়োজন থাকেনি। তাই কুরআনের এ তিনটি স্থান ছাড়া এর আর কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এ সূরা থেকে কুরআন মজীদের শেষ পর্যন্ত যতগুলো সূরা আছে তার অধিকাংশের বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভঙ্গী থেকে বুঝা যায় যে, সূরা মুদ্দাস্সিরের প্রথম সাতটি আয়াত নাযিল হওয়ার পর যখন অবিশ্রান্ত ধারায় বৃষ্টি বর্ষণের মত কুরআন নাযিলের সিলসিলা শুরু হলো, এ সূরাটিও তখনকার অবতীর্ণ বলে মনে হয়। পর পর নাযিল হওয়া এসব সূরায় জোরালো এবং মর্মস্পর্শী ভাষায় অত্যন্ত ব্যাপক কিন্তু সংক্ষিপ্ত বাক্যে ইসলাম এবং তার মৌলিক আকীদা-বিশ্বাস ও নৈতিক শিক্ষাসমূহ পেশ করা হয়েছে এবং মক্কাবাসীদেরকে তাদের গোমরাহী সম্পর্কে সাবধান করা হয়েছে। এ কারণে কুরাইশ নেতারা অস্থির হয়ে যায় এবং প্রথম হজ্বের মওসুম আসার আগেই তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পরাভুত বা ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য নানা রকম ফন্দি-ফিকির ও কৌশল উদ্ভাবনের জন্য একটি সম্মেলনের আয়োজন করে। সূরা মুদ্দাস্সিরের ভূমিকায় আমরা এ বিষয়ের উল্লেখ করেছি।

এ সূরায় আখেরাত অবিশ্বাসীদের সম্বোধন করে তাদের এককেটি সন্দেহ ও একেকটি আপত্তি ও অভিযোগের জওয়াব দেয়া হয়েছে। অত্যন্ত মজবুত প্রমাণাদি পেশ করে কিয়ামত ও আখেরাতের সম্ভাব্যতা, সংঘটন ও অনিবার্যতা প্রমাণ করা হয়েছে। আর একথাও স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে যে, যে ব্যক্তিই আখেরাতকে অস্বীকার করে, তার অস্বীকৃতির মূল কারণ এটা নয় যে, তার জ্ঞানবুদ্ধি তা অসম্ভব বলে মনে করে। বরং তার মূল কারণ ও উৎস হলো, তার প্রবৃত্তি তা মেনে নিতে চায় না। সাথে সাথে মানুষকে এ বলে সাবধান করে দেয়া হয়েছে যে, যে সময়টির আগমনকে তোমরা অস্বীকার করছো তা অবশ্যই আসবে। তোমাদের সমস্ত কৃতকর্ম তোমাদের সামনে পেশ করা হবে। প্রকৃতপক্ষে আমলনামা দেখার পূর্বেই তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই জানতে পারবে যে, সে পৃথিবীতে কি কি কাজ করে এসেছে। কেননা কোন মানুষই নিজের ব্যাপারে অজ্ঞ বা অনবহিত নয়। দুনিয়াকে প্রতারিত করার জন্য এবং নিজের বিবেককে ভুলানোর জন্য নিজের কাজকর্মও আচরণের পক্ষে যত যুক্তি, বাহানা ও ওযর সে পেশ করুক না কেন।

لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ

১. আমি শপথ করছি কিয়ামতের দিনের

কারও বিরোধী মনোভাব খন্ডন করার জন্যে শপথ করা হলে শপথের পূর্বে لا ব্যবহৃত হয়। আরবী বাক-পদ্ধতিতে এই ব্যবহার প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। এ শব্দ দ্বারা বক্তব্য শুরু করাই প্রমাণ করে যে, আগে থেকে কোন বিষয়ে আলোচনা চলছিল যার প্রতিবাদ করার জন্য এ সূরা নাযিল হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা যা বলছে তা ঠিক নয়। আমি কসম করে বলছি, প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এটি। অর্থাৎ কেয়ামত অবশ্যম্ভাবী। রবর্তী বক্তব্য স্বতঃই স্পষ্ট করে দেয় যে, আলোচনার বিষয় ছিল কিয়ামত ও আখেরাতের জীবন। আর মক্কার লোকেরা এটি শুধু অস্বীকারই করে আসছিলো না বরং অস্বীকৃতির সাথে সাথে তা নিয়ে ঠাট্রা-বিদ্রুপও করে আসছিলো। একটি উদাহরণ দ্বারা এ বর্ণনাভঙ্গী ভাল করে বুঝা যেতে পারে। আপনি যদি শুধু রসূলের সত্যতা অস্বীকার করতে চান তাহলে বলবেনঃ আল্লাহর কসম রসূল সত্য। “কিন্তু কিছু লোক যদি রসূলকে অস্বীকার করতে থাকে তবে তার উত্তরে আপনি কথা বলতে শুরু করবেন এভাবেঃ না, আল্লাহর কসম, রসূল সত্য। এর অর্থ হবে, তোমরা যা বলছো তা ঠিক নয়। আমি কসম করে বলছি, প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এটি।

وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ

২. আমি আরও শপথ করছি ভর্ৎসনাকারী আত্মার।

لوامة শব্দটি لوم থেকে উদ্ভুত। অর্থ তিরস্কার ও ধিক্কার দেয়া। 'নাফসে লাওয়ামা' বলে এমন নফস বোঝানো হয়েছে, যে নিজের কাজকর্মের হিসাব নিয়ে নিজেকে ধিক্কার দেয়। অর্থাৎ কৃত গোনাহ অথবা ওয়াজিব কর্মে ক্রটির কারণে নিজেকে ভর্ৎসনা করে বলে যে, তুই এমন করলি কেন? সৎকর্ম সম্পর্কেও নিজেকে এই বলে তিরস্কার করে যে, আরও বেশী সৎকাজ সম্পাদন করে উচ্চমর্যাদা লাভ করলে না কেন? সারকথা, কামেল মুমিন ব্যক্তি সর্বদাই তার প্রত্যেক সৎ ও অসৎ কাজের জন্যে নিজেকে তিরস্কারই করে। গোনাহ অথবা ওয়াজিব কর্মে ক্রটির কারণে তিরস্কার করার হেতু স্পষ্ট। সৎকাজে তিরস্কার করার কারণ এই যে, নফস ইচ্ছা করলে আরও বেশী সৎকাজ করতে পারত। সে বেশী সৎকাজ করল না কেন?

এই অর্থের ভিত্তিতেই হাসান বাসরী রাহেমাহুল্লাহ নফসে-লাওয়ামার তফসীর করেছেন নফসে মুমিনাহ। তিনি বলেছেনঃ আল্লাহর কসম, মুমিন তো সর্বদা সর্বাবস্থায় নিজেকে ধিক্কারই দেয়। সৎকর্মসমুহেও সে আল্লাহর শানের মোকাবেলায় আপন কর্মে অভাব ও ক্রটি অনুভব করে। [কুরতুবী] কেননা, আল্লাহর শানের হক পুরোপুরি আদায় করা সাধ্যাতীত ব্যাপার। ফলে তার দৃষ্টিতে ক্রটি থাকে এবং তজ্জন্যে নিজেকে ধিক্কার দেয়। পক্ষান্তরে অসৎ কাজ হলে মুমিনের কাছে এটা অত্যন্ত কঠোর হয়ে দেখা দেয় ফলে সে নিজেকে ধিক্কার দেয়। [বাগভী]

মূলতঃ নফস তিনটি গুণে গুণান্বিত হয়। নফসে আম্মারা, লাওয়ামা ও মুতমায়িন্নাহ। সাধারণত নাফসে আম্মারা বা খারাপ কাজে উদগ্রীবকারী আত্মা প্রতিটি মানুষেরই মজ্জগত ও স্বভাবগত। সে মানুষকে মন্দ কাজে লিপ্ত হতে জোরদার আদেশ করে। কিন্তু ঈমান, সৎকর্ম ও সাধনার বলে সে নফসে-লাওয়ামা হয়ে যায় এবং মন্দ কাজ ও ক্রটির কারণে অনুতপ্ত হতে শুরু করে। এটাকেই অনেকে বিবেক বলে। কিন্তু মন্দ কাজ থেকে সে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয় না। অতঃপর সৎকর্মে উন্নতি ও আল্লাহর নৈকট্যলাভে চেষ্টা করতে করতে যখন শরীয়তের আদেশ-নিষেধ প্রতিপালন তার মজ্জাগত ব্যাপার হয়ে যায় এবং শরীয়তবিরোধী কাজের প্রতি স্বভাবগত ঘৃণা অনুভব করতে থাকে, তখন এই নফসই মুতমায়িন্নাহ বা সন্তুষ্টচিত্ত উপাধি প্রাপ্ত হয়।

এ ধরনের নাফস যাদের অর্জিত হয় তারা দ্বীনী ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহ বা প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে মুক্ত হয়ে 'কালবে সালীম' বা সুস্থ হৃদয়ের অধিকারী হয়। আর এ সমস্ত লোকদের প্রশংসায় আল্লাহ্ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেছেন, "যে দিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসবে না; সে দিন উপকৃত হবে শুধু সে, যে আল্লাহর কাছে আসবে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ নিয়ে।" [সূরা আশ-শু'আরা: ৮৮–৮৯]

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ

৩. মানুষ কি মনে করে যে, আমরা কখনোই তার অস্থিসমূহ একত্র করতে পারব না?

কসম আকারে ওপরে বর্ণিত দু'টি দলীল শুধু দু'টি বিষয় প্রমাণ করে। এক, এ দুনিয়ার পরিসমাপ্তি (অর্থাৎ কিয়ামদের প্রথম পর্যায়) একটি নিশ্চিত ও অনিবার্য ব্যাপার। দুই, মৃত্যুর পরে আরেকটি জীবন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কারণ তা ছাড়া মানুষের একটি নৈতিক সত্তা হওয়ার যৌক্তিক ও প্রকৃতিগত দাবী পুরণ হতে পারে না। আর এ ব্যাপারটি অবশ্যই সংঘটিত হবে। মানুষের মধ্যে বিবেক থাকাটাই তা প্রমাণ করে। মৃত্যুর পরের জীবন যে সম্ভব একথা প্রমাণ করার জন্যই এ তৃতীয় দলীলটি পেশ করা হয়েছে। মক্কার যেসব লোক মৃত্যুর পরের জীবনকে

অস্বীকার করতো তারা বার বার একথা বলতো যে, যেসব লোকেরা মৃত্যুর পর হাজার হাজার বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে, যাদের দেহের প্রতিটি অণূ-পরমাণু মাটিতে মিশে বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে, যাদের হাড়গোড় পচে গলে পৃথিবীর কত জায়গায় যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে তার কোন হদিস নেই, যাদের কেউ মরেছে আগুনে পুড়ে, কেউ হিংস্র জন্তুর আহারে পরিণত হয়েছে। আবার কেউ সমুদ্রে ডুবে মাছের খোরাক হয়েছে। তাদের সবার দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আবার একত্র হবে এবং প্রতিটি মানুষ আবার হুবহু সে মানুষটি হয়ে জীবনলাভ করবে, যে মানুষটি দশ-বিশ হাজার কোন এক সময় ছিল, এটা কি করে সম্ভব? মক্কার লোকদের এসব কথার জবাব আল্লাহ তা'আলা একটি ছোট প্রশ্নের আকারে অত্যন্ত যুক্তিগ্রাহ্য ও বলিষ্ঠভাবে দিয়েছেন। তিনি বলছেনঃ "মানুষ কি মনে করেছে যে, আমি তার হাড়গোড় আদৌ একত্রিত করতে পারবো ন"? অর্থাৎ যদি তোমাদেরকে বলা হতো, তোমাদের দেহের বিক্ষিপ্ত এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কোন এক সময় আপনা থেকেই একত্রিত হয়ে যাবে এবং তোমরাও আপনি থেকেই হুবুহু এই দেহ নিয়েই জীবিত হয়ে যাবে তাহলে এরূপ হওয়াটিকে অসম্ভব মনে করা তোমাদের নিঃসন্দেহে যুক্তিসঙ্গত হতো। কিন্তু তোমাদের তো বলা হয়েছে এ কাজটি আপনা থেকেই হবে না। বরং তা করবেন আল্লাহ তা'আলা নিজে। তাহলে কি তোমরা প্রকৃতপক্ষেই মনে করো যে, সারা বিশ্ব-জাহানের সৃষ্টিকর্তা-যাকে তোমরা নিজেরাও সৃষ্টিকর্তা বলে স্বীকার করে থাকো-এ কাজ করতে অক্ষম? এটা এমন একটি প্রশ্ন যে, যারা আল্লাহ তা'আলাকে বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টা বলে স্বীকার করে, সে যুগেও তারা বলতে পারতো না এবং বর্তমান যুগেও বলতে পারে না। যে, আল্লাহ তা'আলা নিজেও এ কাজ করতে চাইলে করতে পারবেন না। আর কোন নির্বোধ যদি এমন কথা বলেও ফেলে তাহলে তাকে জিজ্ঞেস করা যেতে পারে যে, তুমি আজ যে দেহের অধিকারী তার অসংখ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বাতাস, পানি, মাটি এবং অজ্ঞাত আরো কত জায়গা থেকে এনে একত্রিত করে সে আল্লাহ এ দেহটি কিভাবে তৈরী করলেন যার সম্পর্কে তুমি বলছো যে, তিনি পুনরায় এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একত্রিত করতে সক্ষম নন? [তাফহীমুল কুরআন]

بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ
৪. অবশ্যই হ্যাঁ, আমরা তার আঙ্গুলের আগা পর্যন্ত পুনর্বিন্যস্ত করতে সক্ষম

অর্থাৎ বড় বড় হাড়গুলো একত্রিত করে পুনরায় তোমার দেহের কাঠামো প্রস্তুত করা এমন কিছুই নয়। আমি তো তোমার দেহের সূক্ষ্মতম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এমনকি তোমার আঙ্গুলের জোড়গুলোও পুনরায় ঠিক তেমন করে বানাতে সক্ষম। যেমন তা এর আগে ছিল, তবে তোমাদের পুনরুত্থিত করতে অসক্ষম হওয়ার কোন কারণ নেই।

بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ
৫. বরং মানুষ তার ভবিষ্যতেও পাপাচার করতে চায়।

এ ছোট বাক্যটিতে আখেরাত অবিশ্বাসকারীদের আসল রোগ কি তা স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করে দেয়া হয়েছে। যেসব জিনিস এসব লোককে আখেরাত অস্বীকার করতে উদ্বুদ্ধ করতো তা মূলত এ নয় যে, প্রকৃতই তারা কিয়ামত ও আখেরাতকে অসম্ভব মনে করতো। বরং তারা যে কিয়ামত ও আখেরাতকে অস্বীকার করে তার মূল কারণ হলো, আখেরাতকে মেনে নিলে তাদের ওপর অনিবার্যভাবে কিছু নৈতিক বাধ্যবাধকতা আরোপিত হয়। সে বাধ্যবাধকতা মেনে নেয়া তাদের কাছে মোটেই মনঃপূত নয়। তারা চায় আজ পর্যন্ত তারা পৃথিবীতে যেরূপ লাগামহীন জীবন যাপন করে এসেছে ভবিষ্যতেও ঠিক তেমনি করতে পারে। আজ পর্যন্ত তারা যে ধরনের জুলুম-আত্যাচার, বেঈমানী, পাপাচার ও দুষ্কর্ম করে এসেছে ভবিষ্যতেও তা করার অবাধ স্বাধীনতা যেন তাদের থাকে। একদিন

তাদেরকে আল্লাহর বিচারালয়ে দাঁড়িয়ে এসব কাজের জবাবদিহি করতে হবে এ বিশ্বাস যেন তাদের অবৈধ লাগামহীন স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারিতার পথ রোধ করতে না পারে। তাই প্রকৃতপক্ষে তাদের বিবেক-বুদ্ধি তাদেরকে আখেরাতের প্রতি ঈমান আনতে বাধা দিচ্ছে না। বরং তাদের প্রবৃত্তির কামনা বাসনাই এ পথের প্রতিবন্ধক।

يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ

৬. সে প্রশ্ন করে, কখন কিয়ামতের দিন আসবে?

তারা এ প্রশ্ন এই জন্য করে না যে, কৃতপাপ হতে তওবা করবে। বরং কিয়ামত সংঘটিত হওয়াকে তারা অসম্ভব মনে করে। আর এই কারণেই তারা অন্যায়-অনাচার থেকে ফিরে আসে না। পরের আয়াতে মহান আল্লাহ কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময় বর্ণনা করছেন।

فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ

৭. যখন চোখ স্থির হয়ে যাবে

برق এর আভিধানিক অর্থ হলো বিদ্যুতের ঝলকে চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়া। কিন্তু প্রচলিত আরবী বাকরীতিতে কথাটি শুধু এ একটি অর্থ জ্ঞাপকই নয় বরং ভীতি-বিহবলতা, বিস্ময় অথবা কোন দুর্ঘটনার আকস্মিকতায় যদি কেউ হতবুদ্ধি হয়ে যায় এবং সে ভীতিকর দৃশ্যের প্রতি তার চক্ষু স্থির-নিবদ্ধ হয়ে যায় যা সে দেখতে পাচ্ছে তাহলে এ অবস্থা বুঝাতেও একথাটি বলা হয়ে থাকে। [ইবনে কাসীর] একথাটিই কুরআন মাজীদের আরেক জায়গায় এভাবে বলা হয়েছে, "আল্লাহ্ তো তাদের অবকাশ দিচ্ছেন সেদিন পর্যন্ত যেদিন চক্ষুসমূহ স্থির হয়ে যাবে।"

وَخَسَفَ الْقَمَرُ

৮. এবং চাঁদ হয়ে পড়বে কিরণহীন

وَ جُمِعَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ

৯. আর যখন সূর্য ও চাঁদকে একত্র করা হবে

এখানে কেয়ামতের পরিস্থিতি বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ যখন চক্ষুতে ধাঁধা লেগে গেল— কেয়ামতের দিন সবার দৃষ্টিতে ধাঁধা লেগে যাবে। ফলে চক্ষু স্থির কোন বস্ত দেখতে পারবে না এবং চন্দ্র জ্যোতিহীন হয়ে যাবে। [ইবন কাসীর] তাছাড়া আরেকটি অনুবাদ হচ্ছে, চন্দ্র গায়েব হয়ে যাবে, চন্দ্র বলতে কিছু আর থাকবে না। [কুরতুবী] চাঁদের আলোহীন হয়ে যাওয়া এবং চাঁদ ও সূর্যের পরস্পর একাকার হয়ে যাওয়ার অর্থ, মুজাহিদ বলেন, দু'টিকে একত্রে পেচানো হবে। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ

১০. সে-দিন মানুষ বলবে, আজ পালাবার স্থান কোথায়?

كَلَّا لَا وَزَرَ

১১. কখনোই নয়, কোন আশ্রয়স্থল নেই।

إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ

১২. সেদিন ঠাঁই হবে আপনার রবেরই কাছে।

يُنَبَّأُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ

১৩. সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে সে কী আগে পাঠিয়েছে ও কী পিছনে রেখে গেছে।

মূল বাক্যটি হলো (بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ) অর্থাৎ মানুষকে সেদিন অবহিত করা হবে যা সে অগ্রে প্রেরণ করেছে ও পশ্চাতে ছেড়ে এসেছে। এটা একটা ব্যাপক অর্থব্যঞ্জক বাক্য। এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে এবং সম্ভবত সবগুলোই এখানে প্রযোজ্য। এর একটি অর্থ হলো, দুনিয়ার জীবনে মানুষ মৃত্যুর পূর্বে কি কি নেক কাজ বা বাদ কাজ করে আখেরাতের জন্য আগ্রিম পাঠিয়ে দিয়েছিল সেদিন তাকে তা জানিয়ে দেয়া হবে। আর দুনিয়াতে সে নিজের ভাল এবং মন্দ কাজের কি ধরনের প্রভাব সৃষ্টি করে এসেছিল যা তার দুনিয়া ছেড়ে চলে আসার পরও পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে দীর্ঘদিন পর্যন্ত চলেছিল সে হিসেবও তার সামনে পেশ করা হবে। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুম বলেন, মানুষ মৃত্যুর পূর্বে যে সৎকাজ করে নেয়, তা সে অগ্রে প্রেরণ করে এবং যে সৎ অথবা অসৎ উপকারী অথবা অপকারী কাজ ও প্রথা এমন ছেড়ে যায়, যা তার মৃত্যুর পর মানুষ বাস্তবায়িত করে, তা সে পশ্চাতে রেখে আসে। (এর সওয়াব অথবা শাস্তি সে পেতে থাকবে।) [দেখুন: বাগাভী; কুরতুবী]

দ্বিতীয় অর্থ হলো, যেসব কাজ সে আগে করেছে এবং যেসব কাজ সে পরে করেছে দিন তারিখ সহ তার পুরো হিসেব তার সামনে পেশ করা হবে। কাতাদা রাহেমাহুল্লাহ বলেন, قَدَّمَ বলে এমন সৎকাজ বোঝানো হয়েছে, যা মানুষ জীবদ্দশায় করে নেয় এবং أَخَّرَ বলে এমন সৎকাজ বোঝানো হয়েছে, যা সে করতে পারত, কিন্তু করেনি এবং সুযোগ নষ্ট করে দিয়েছে। [কুরতুবী]

بَلِ الۡاِنۡسَانُ عَلٰی نَفۡسِهٖ بَصِیۡرَۃٌ

১৪. বরং মানুষ নিজের সম্পর্কে সম্যক অবগত

আয়াতে بَصِيرَةٌশব্দটির অর্থ যদি 'চক্ষুস্মান' ধরা হয়, তখন আয়াতের অর্থ এই যে, যদিও ন্যায়বিচারের বিধি অনুযায়ী মানুষকে তার প্রত্যেকটি কর্ম সম্পর্কে হাশরের মাঠে অবহিত করা হবে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর প্রয়োজন নেই। কেননা, মানুষ তার কর্ম সম্পর্কে খুব জ্ঞাত। সে কি করেছে, তা সে নিজেই জানে। তাই আখেরাতের আদালতে হাজির করার সময় প্রত্যেক কাফের, মুনাফিক, পাপী ও অপরাধী নিজেই বুঝতে পারবে যে, সে কি কাজ করে এসেছে এবং কোন অবস্থায় নিজ প্রভুর সামনে দাঁড়িয়ে আছে; সে যতই অস্বীকার করুক বা ওযর পেশ করুক। [ইবন কাসীর] এছাড়া হাশরের মাঠে প্রত্যেকে তার সৎ কর্ম স্বচক্ষে দেখতেও পাবে। অন্য আয়াতে আছে, (وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا) অর্থাৎ "দুনিয়াতে মানুষ যা করেছে, হাশরের মাঠে তাকে উপস্থিত পাবে" [সূরা আল-কাহাফ: ৪৯] সুতরাং তারা তা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করবে। এখানে মানুষকে নিজের সম্পর্কে চক্ষুষ্মান বলার অর্থ তাই।

পক্ষান্তরে যদি بَصِيرَةٌশব্দের অর্থ 'প্রমাণ' হয় তখন আয়াতের অর্থ হবে এই যে, মানুষ নিজেই নিজের সম্পর্কে প্রমাণস্বরূপ হবে। সে অস্বীকার করলেও তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বীকার করবে। [কুরতুবী]

وَّ لَوۡ اَلۡقٰی مَعَاذِیۡرَہٗ

১৫. যদিও সে নানা অজুহাতের অবতারণা করে।

মানুষের সামনে তারা আমলনামা পেশ করার উদ্দেশ্য আসলে অপরাধীকে তার অপরাধ সম্পর্কে অবহিত করা নয়। বরং এরূপ করা জরুরী এই কারণে যে, প্রকাশ্য আদালতে অপরাধের প্রমাণ পেশ করা ছাড়া ইনসাফের দাবী পূরণ হয় না। প্রত্যেক মানুষই জানে, সে নিজে কি? সে কি, একথা তাকে অন্য কারো বলে দিতে হয় না। একজন মিথ্যাবাদী গোটা দুনিয়াকে ধোঁকা দিতে পারে। কিন্তু সে নিজে একথা জানে যে, সে যা বলছে ত মিথ্যা। একজন চোর তার চৌর্যবৃত্তিকে ঢাকার জন্য অসংখ্য কৌশল অবলম্বন করতে পারে। কিন্তু সে যে চোর তা তার নিজের কাছে গোপন থাকে না। একজন পথভ্রষ্ট লোক হাজারো প্রমাণ পেশ করে মানুষকে একথা বিশ্বাস করাতে পারে যে, সে যে কুফরী, নাস্তিকতা ও শিরকের সামর্থ্যক তা তার মনের বিশ্বাসভিত্তিক সিদ্ধান্ত। কিন্তু তার নিজের বিবেক একথা ভাল করেই জানে যে, সে ঐসব আকীদা-বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে আছে কেন এবং মধ্যকার ভুল বুঝতে ও মেনে নিতে কিসে তাকে বাধা দিচ্ছে? জালেম, অসচ্চরিত্র, দুষ্কর্মশীল এবং হারামখোর মানুষ নিজের অপকর্মের পক্ষে নানা রকম ওজর-আপত্তি ও কৌশল পেশ করে নিজের বিবেকের মুখ পর্যন্ত বন্ধ করার চেষ্টা চালাতে পারে যাতে বিবেক তাকে তিরস্কার করা থেকে বিরত থাকে এবং স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে, সত্যিকারভাবেই কিছু বাধ্যবাধকতা, কিছু বৃহত্তর কল্যাণ এবং কিছু অনিবার্য প্রয়োজনে সে এসব করছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সর্বাবস্থায় তার এটা জানা থাকে যে, সে কার প্রতি কতটা জুলুম করেছে, কার হক মেরে খেয়েছে, কার সতীত্ব নষ্ট করেছে, কাকে প্রতারণা করেছে এবং কোন অবৈধ পন্থায় কি কি স্বার্থ উদ্ধার করেছে। তাই আখেরাতের আদালতে হাজির করার সময় প্রত্যেক কাফের, মুনাফিক, পাপী ও অপরাধী নিজেই বুঝতে পারবে যে, সে কি কাজ করে এসেছে এবং কোন অবস্থায় নিজ প্রভুর সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

لَا تُحَرِّكۡ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعۡجَلَ بِهٖ

১৬. তাড়াতাড়ি ওহী আয়ত্ত করার জন্য আপনি তা নিয়ে আপনার জিহ্বাকে দ্রুত সঞ্চালন করবেন না।

اِنَّ عَلَيۡنَا جَمۡعَهٗ وَ قُرۡاٰنَهٗ

১৭. নিশ্চয় এর সংরক্ষণ ও পাঠ করাবার দায়িত্ব আমাদেরই।

فَاِذَا قَرَاۡنٰهُ فَاتَّبِعۡ قُرۡاٰنَهٗ

১৮. কাজেই যখন আমরা তা পাঠ করি আপনি সে পাঠের অনুসরণ করুন,

ثُمَّ اِنَّ عَلَيۡنَا بَيَانَهٗ

১৯. তারপর তার বর্ণনার দায়িত্ব নিশ্চিতভাবে আমাদেরই।

এ আয়াতসমূহে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে একটি বিশেষ নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যা ওহী নাযিল হওয়ার সময় অবতীর্ণ আয়াতগুলো সম্পর্কিত। নির্দেশ এই যে, যখন জিবরীল আলাইহিস সালাম কুরআনের কিছু আয়াত নিয়ে আগমন করতেন, তখন তা পাঠ করার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বিবিধ চিন্তায় জড়িত হয়ে পড়তেন যেন কোথায়ও এর শ্রবণ ও তদনুযায়ী পাঠে কোন পার্থক্য না হয়ে যায় বা কোথাও এর কোন অংশ, কোন বাক্য স্মৃতি থেকে উধাও না হয়ে যায়। এই চিন্তার কারণে যখন জিবরীল আলাইহিস সালাম কোন আয়াত শোনাতেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাথে সাথে পাঠ করতেন এবং জিহবা নেড়ে দ্রুত আবৃত্তি করতেন, যাতে বার বার পড়ে তা মুখস্থ করে নেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এই পরিশ্রম ও কষ্ট দূর করার উদ্দেশ্যে এ আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা কুরআন পাঠ করানো,

মুখস্থ করানো ও মুসলিমদের কাছে হুবহু পেশ করানোর দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলে দিয়েছেন যে, আপনি এই উদ্দেশ্যে জিহবাকে দ্রুত নাড়া দেয়ার কষ্ট করবেন না।

আয়াতসমুহকে আপনার অন্তরে সংরক্ষণ করা এবং হুবহু আপনার দ্বারা পাঠ করিয়ে দেয়া আমার দায়িত্ব। কাজেই আপনি এ চিন্তা পরিত্যাগ করুন। সুতরাং যখন আমি অর্থাৎ আমার পক্ষ থেকে জিবরীল আলাইহিস সালাম কুরআন পাঠ করে, তখন আপনি সাথে সাথে পাঠ করবেন না; বরং চুপ করে শুনবেন এবং আমার পাঠের পর পাঠ করবেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাই করতেন। তিনি জিবরীল থেকে শুনতেন তারপর জিবরীল চলে গেলে তা অনুরূপ পড়তেন যেমন জিবরীল পড়েছেন। [বুখারী: ৫, মুসলিম, ৪৪৮] এখানে কুরআন অনুসরণ করান মানে চুপ করে জিবরীলের পাঠ শ্রবণ করা। অবশেষে বলা হয়েছে আপনি এ চিন্তাও করবেন না যে, অবতীর্ণ আয়াতসমূহের সঠিক মর্ম ও উদ্দেশ্য কি? এটা বুঝিয়ে দেয়াও আমার দায়িত্ব। আমি কুরআনের প্রতিটি শব্দ ও তার উদ্দেশ্য আপনার কাছে ফুটিয়ে তুলব। [ইবনে কাসীর]

كَلَّا بَلۡ تُحِبُّوۡنَ الۡعَاجِلَةَ

২০. কখনো না, বরং তোমরা দুনিয়ার জীবনকে ভালবাস;

মাঝখানে চার আয়াতে রসুলুল্লাহ (সা)-কে একটি বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যা ওহী নাযিল হওয়ার সময় অবতীর্ণ আয়াতগুলো সম্পর্কিত। সূরার শুরু থেকে বক্তব্যের যে ধারাবাহিকতা ছিল এখানে এসে আবার সে ধারাবাহিকতা শুরু হয়েছে। কখখনো না, অর্থ হলো, তোমাদের আখেরাতকে অস্বীকার করার আসল কারণ এটা নয় যে, বিশ্ব-জাহানের সৃষ্টিকর্তা কিয়ামত সংঘটিত করতে কিংবা মৃত্যুর পর তোমাদেরকে আবার জীবিত করতে পারবেন না বলে তোমরা মনে করো বরং আসল কারণ হলো এটি।

وَ تَذَرُوۡنَ الۡاٰخِرَةَ

২১. আর তোমরা আখেরাতকে উপেক্ষা কর।

এটি আখেরাতকে অস্বীকার করার দ্বিতীয় কারণ। প্রথম কারণটি ৫ নং আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছিল। কারণটি হলো, মানুষ যেহেতু অবাধে পাপাচার চালাতে চায় এবং আখেরাতকে মেনে নিলে অনিবার্যরূপে যেসব নৈতিক বিধিবন্ধন মেনে চলার দায়িত্ব বর্তায় তা থেকে বাঁচতে চায়। তাই তার কুপ্রবৃত্তি তাকে আখেরাতকে অস্বীকার করতে উদ্বুদ্ধ করে এবং তার এ অস্বীকৃতিকে যুক্তিসঙ্গত বলে প্রমাণ করার জন্য সে সুন্দর করে সাজিয়ে যৌক্তিক প্রমাণাদি পেশ করে। এখন দ্বিতীয়, কারণটি বর্ণনা করা হচ্ছে। আখেরাত অস্বীকারকারীরা যেহেতু সংকীর্নমনা ও স্বল্পবুদ্ধি সম্পন্ন হয় তাই তাদের দৃষ্টি কেবল এ দুনিয়ার ফলাফলের প্রতি নিবদ্ধ থাকে। আর আখেরাতে যে ফলাফলের প্রকাশ ঘটবে তাকে তারা আদৌ কোন গুরুত্ব দেয় না। তারা মনে করে, যে স্বার্থ বা ভোগের উপকরণ বা আনন্দ এখানে লাভ করা সম্ভব তারই অন্বেষণে সবটুকু পরিশ্রম করা এবং প্রচেষ্টা চালানো উচিত। কারণ, তা যদি তারা লাভ করে তাহলে যেন সবকিছুই তারা পেয়ে গেল। এতে আখেরাতে তাদের পরিণাম যত খারাপই হোক না কেন। একইভাবে তারা এ ধারণাও পোষণ করে যে, যে ক্ষতি, কষ্ট বা দুঃখ-বেদনা এখানে হবে তা থেকে মূলত নিজেদের রক্ষা করতে হবে। এক্ষেত্রে দেখার দরকার নেই যে, তা বরদাশত করে নিলে আখেরাতে তার বিনিময়ে কত বড় পুরস্কার লাভ করা যাবে। তারা চায় নগদ সওদা। আখেরাতের মত বহু দূরের জিনিসের জন্য তারা আজকের কোন স্বার্থ যেমন ছাড়তে চায় না তেমনি কোন ক্ষতিও বরদাশত করতে পারে না। এ

ধরনের চিন্তাধারা নিয়ে যখন তারা আখেরাত সম্পর্কে যৌক্তিক বিতর্কে অবতীর্ণ হয় তখন আর তা খাঁটি যুক্তিবাদ থাকে না। বরং তখন তার পেছনে এ ধ্যান-ধারণাটিই কাজ করতে থাকে। আর সে কারণে সর্বাবস্থায় তার সিদ্ধান্ত এটাই থাকে যে, আখেরাতকে মানা যাবে না। যদিও ভেতর থেকে বিবেক চিৎকার করে বলতে থাকে যে, আখেরাত সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা এবং তার অনিবার্যতা সম্পর্কে কুরআন যেসব দলীল-প্রমাণ পেশ করা হয়েছে তা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত আর তার বিপক্ষে যেসব যুক্তি তারা দেখাচ্ছে তা অত্যন্ত ভোঁতা ও অন্তসারশূন্য।

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ

২২. সেদিন কোন কোন মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে,

খুশীতে তারা দীপ্তিময় হয়ে উঠবে। কারণ, তারা যে আখেরাতের প্রতি ঈমান এনেছিল তা হুবহু তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী চোখের সামনে বিদ্যমান থাকবে। যে আখেরাতের প্রতি ঈমান আনার কারণে তারা দুনিয়ার যাবতীয় অবৈধ স্বার্থ পরিত্যাগ করেছিল এবং সত্যিকার অর্থেই ক্ষতি স্বীকার করেছিল তা চোখের সামনে বাস্তবে সংঘটিত হতে দেখে নিশ্চিত হয়ে যাবে যে, তারা নিজেদের জীবনাচরণ সম্পর্কে অত্যন্ত সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। এখন তার সর্বোত্তম ফলাফল দেখার সময় এসে গেছে।

اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ

২৩. তারা তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে।

সেদিন কিছু মুখমন্ডল হাসি-খুশী ও সজীব হবে এবং তারা তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, আখেরাতে জান্নাতীগণ স্বচক্ষে আল্লাহ তা'আলার দীদার (দর্শন) লাভ করবে। আহলে সুন্নাত-ওয়াল-জামা'আতের সকল আলেম ও ফেকাহবিদ এ বিষয়ে একমত। বহু সংখ্যক হাদীসে এর যে ব্যাখ্যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে তাহলো, আখেরাতে আল্লাহর নেককার বান্দাদের আল্লাহর সাক্ষাত লাভের সৌভাগ্য হবে। এক হাদীসে এসেছে, “তোমরা প্রকাশ্যে সুস্পষ্টভাবে তোমাদের রবকে দেখতে পাবে” [বুখারী: ৭৪৩৫, ৫৫৪, ৪৭৩, ৪৮৫১, ৭৪৩৪, ৭৪৩৬]

অন্য হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, বেহশতবাসীরা বেহেশতে প্রবেশ করার পর আল্লাহ তা'আলা তাদের জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা কি চাও যে, আমি তোমাদের আরো কিছু দান করি? তারা আরয করবে, আপনি কি আমাদের চেহারা দীপ্তিময় করেননি? আপনি কি আমাদের জান্নাতে প্রবেশ করাননি এবং জাহান্নাম থেকে রক্ষা করেননি? তখন আল্লাহ তা’আলা পর্দা সরিয়ে দেবেন। ইতিপুর্বে তারা যেসব পুরস্কার লাভ করেছে তার কোনটিই তাদের কাছে তাদের রবের সাক্ষাতলাভের সম্মান ও সৌভাগ্য থেকে অধিক প্রিয় হবে না। এটিই হচ্ছে সে অতিরিক্ত পুরস্কার যার কথা কুরআনে এভাবে বলা হয়েছে, অর্থাৎ “যারা নেক কাজ করেছে তাদের জন্য উত্তম পুরস্কার রয়েছে। আর এ ছাড়া অতিরিক্ত পুরস্কারও রয়েছে।” [সূরা ইউনুস: ২৬] [মুসলিম: ১৮১, তিরমিযী: ২৫৫২, মুসনাদে আহমাদ: ৪/৩৩৩]

অন্য হাদীসে এসেছে, সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আমরা কি কিয়ামতের দিন আমাদের রবকে দেখতে পাবো? জবাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যখন মেঘের আড়াল থাকে না তখন সূর্য ও চাঁদকে দেখতে তোমাদের কি কোন কষ্ট হয়? সবাই বলল, না। তিনি বললেন, তোমরা তোমাদের রবকে এরকমই স্পষ্ট দেখতে পাবে। [বুখারী: ৭৪৩৭, মুসলিম: ১৮২] এ সমস্ত হাদীস এবং অন্য আরো বহু

হাদীসের ভিত্তিতে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অনুসারীগণ প্রায় সর্বসম্মতভাবেই এ আয়াতের যে অর্থ করেন তাহলো, জান্নাতবাসীগণ আখেরাতে মহান আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হবে। কুরআন মজীদের এ আয়াত থেকেও তার সমর্থন পাওয়া যায়। "কক্ষনো নয়, তারা (অর্থাৎ পাপীগণ)" সেদিন তাদের রবের সাক্ষাৎ থেকে বঞ্চিত হবে। [সূরা আল-মুতাফফিফীন: ১৫] এ থেকে স্বতই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, এ বঞ্চনা হবে পাপীদের জন্য নেককারদের জন্য নয়। [ইবনে কাসীর]

وَ وُجُوۡهٌ یَّوۡمَئِذٍۭ بَاسِرَۃٌ

২৪. আর কোন কোন মুখমণ্ডল হয়ে পড়বে বিবর্ণ,

تَظُنُّ اَنۡ یُّفۡعَلَ بِهَا فَاقِرَۃٌ

২৫. আশংকা করবে যে, এক ধ্বংসকারী বিপর্যয় তাদের উপর আপতিত হবে।

كَلَّاۤ اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِیَ

২৬. অবশ্যই, যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হবে,

وَ قِیۡلَ مَنۡ ٜ رَاقٍ

২৭. এবং বলা হবে, কে তাকে রক্ষা করবে?

মূল আয়াতে راق শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এটি رقية ধাতু থেকেও উৎপন্ন হতে পারে। এর অর্থ তাবীজ-কবচ এবং ঝাড়-ফুঁক। আবার رقي ধাতু থেকেও উৎপন্ন হতে পারে। এর অর্থ ওপর দিকে ওঠা। যদি প্রথম অর্থটি গ্রহণ করা হয় তাহলে যা বুঝাবে তাহলো, শেষ মুহূর্তে যে সময় রোগীর সেবা শুশ্রূসাকারীরা সব রকমের ওষুধ পত্র সম্পর্কে নিরাশ হয়ে যাবে তখন বলবেঃ আরে, কোন ঝাড় ফুঁককারীকেই অন্তত খুঁজে আনো যে এর জীবনটা রক্ষা করবে। আর যদি দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করা হয় তাহলে যা বুঝাবে তা হলো, সে সময় ফেরেশতারা বলবেঃ কে এ রূহটা নিয়ে যাবে? আযাবের ফেরেশতারা না রহমতের ফেরেশতারা? অন্য কথায় সে সময় সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে, ঐ ব্যক্তি আখেরাতের দিকে কি মর্যাদা নিয়ে যাত্রা করেছে। সৎ মানুষ হলে রহমতের ফেরেশতারা নিয়ে যাবে। অসৎ মানুষ হলে রহমতের ফেরেশতারা তার ছায়াও মাড়বে না। আযাবের ফেরেশতারাই তাকে পাকড়াও করে নিয়ে যাবে।

وَّ ظَنَّ اَنَّهُ الۡفِرَاقُ

২৮. তখন তার প্রত্যয় হবে যে, এটা বিদায়ক্ষণ।

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে কিয়ামতের হিসাব-নিকাশ এবং জান্নাতী ও জাহান্নামীদের কিছু অবস্থা বর্ণনা করার পর এই আয়াতে মৃত্যুর প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, যাতে সে মৃত্যুর পূর্বেই পরকালে মুক্তি পাওয়ার জন্য ঈমান ও সৎ কর্মের দিকে ধাবিত হয়। আয়াতে মৃত্যুর চিত্র অংকন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে গাফিল মানুষ যখন বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে থাকে, তখন তার মাথার উপর মৃত্যু এসে দণ্ডায়মান হয় এবং আত্মা কণ্ঠনালীতে এসে ঠেকে। শুশ্রূষাকারীরা চিকিৎসায় ব্যর্থ হয়ে ঝাড়ফুককারীদেরকে খুঁজতে থাকে এবং পায়ের গোছা অন্য গোছার সাথে জড়িয়ে যায়। এটাই আল্লাহর কাছে যাওয়ার সময়। এ সময়ে কোন তওবা কবুল হয় না এবং কোন আমলও করা যায় না। কাজেই বুদ্ধিমানের উচিত এর আগেই সংশোধনের চেষ্টা করা।

وَ الۡتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ

২৯. আর পায়ের গোছার সঙ্গে পায়ের গোছা জড়িয়ে যাবে।

ساق এর প্রসিদ্ধ অর্থ পায়ের গোছা। গোছার সাথে জড়িয়ে পড়ার এক অর্থ এই যে, তখন অস্থিরতার কারণে এক গোছা দ্বারা অন্য গোছার উপর আঘাত করবে। দ্বিতীয় অর্থ এই যে, দুর্বলতার আতিশয্যে এক পা অপর পায়ের উপর থাকলে তা সরাতে চাইলেও সক্ষম হবে না। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, তখন হবে দুনিয়ার শেষ দিন এবং আখেরাতের প্রথম দিনের সম্মিলন। তাই মানুষ দুনিয়ার শেষ দিন এবং আখেরাতের বিরহ-বেদনা এবং আখেরাতে কি হবে না হবে তার চিন্তায় পেরেশান থাকবে। অর্থাৎ সে সময় দুটি বিপদ একসাথে এসে হাজির হবে। একটি এ পৃথিবী এবং এর সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার বিপদ।। আরেকটি, একজন অপরাধী হিসেবে গ্রেফতার হয়ে আখেরাতের জীবনে যাওয়ার বিপদ যার মুখোমুখি হতে হবে প্রত্যেক কাফের মুনাফিক এবং পাপীকে। [ইবনে কাসীর]

اِلٰی رَبِّکَ یَوۡمَئِذِ الۡمَسَاقُ

৩০. সেদিন আপনার রবের কাছেই সকলকে হাঁকিয়ে নেয়া হবে।

فَلَا صَدَّقَ وَ لَا صَلّٰی

৩১. সুতরাং সে বিশ্বাস করে নি এবং সালাতও আদায় করে নি।

وَ لٰکِنۡ کَذَّبَ وَ تَوَلّٰی

৩২. বরং সে মিথ্যারোপ করেছিল এবং মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল।

ثُمَّ ذَهَبَ اِلٰۤی اَهۡلِهٖ یَتَمَطّٰی

৩৩. তারপর সে তার পরিবার পরিজনের কাছে চলে গিয়েছিল অহংকার করে,

যে ব্যক্তি আখেরাতকে মানতে প্রস্তুত ছিল না সে পূর্ব বর্ণিত আয়াতগুলোতে উল্লেখিত সবকিছু শোনার পরেও তা অস্বীকার করে যেতে থাকলো এবং এসব আয়াত শোনার পর দর্পভরে নিজের বাড়ীর দিকে চলে গেল। মুজাহিদ, কাতাদ ও ইবনে যায়েদের মতে এ লোকটি ছিল আবু জেহেল। আয়াতের শব্দসমূহ থেকেও এটাই প্রকাশ পায় যে, সে এমনকোন ব্যক্তি ছিল যে সূরা কিয়ামার ওপরে বর্ণিত আয়াতগুলো শোনার পর এ আচরণ ও কর্মপন্থা গ্রহণ করেছিল।

আয়াতের "সে সত্যকে অনুরসণ করেনি, নামাযও পড়েনি" কথাটি বিশেষভাবে মনযোগলাভের যোগ্য। এর থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে আল্লাহ এবং তাঁর রসূল ও তাঁর কিতাবের সত্যতা স্বীকার করার পর তার প্রাথমিক এবং অনিবার্য দাবী হলো, মানুষ যেন নামায পড়ে। আল্লাহর দেয়া শরীয়াতের অন্য সব হুকুম-আহকাম তামীল করার পর্যায় বা অবকাশ তো আসে আরো পরে। কিন্তু ঈমান আনার পর কিছু সময় যেতে না যেতেই নামাযের সময়

এসে হাজির হয়। আর তখনই জানা যায় সে যা মেনে নেয়ার অঙ্গীকার মুখ থেকে উচ্চারণ করেছিল তা সত্যিই তার হৃদয়ের প্রতিধ্বনি, না কি কয়েকটি শব্দের আকারে মুখ থেকে উচ্চারিত ফাঁকা বুলি মাত্র।

اَوۡلٰی لَکَ فَاَوۡلٰی

৩৪. দুর্ভোগ তোমার জন্য, দুর্ভোগ!

ثُمَّ اَوۡلٰی لَکَ فَاَوۡلٰی

৩৫. আবার দুর্ভোগ তোমার জন্য, দুর্ভোগ!

أَوْلَىٰ অর্থ ধ্বংস, দুর্ভোগ। সর্বনাশ হোক তোমার! মন্দ, ধ্বংস এবং দুর্ভাগ্য হোক তোমার! এখানে কাফিরদেরকে খুবই মারাত্মকভাবে সাবধান করে দেয়া হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর] ইবন কাসীর বলেনঃ এটি একটি শ্লেষ বাক্যও হতে পারে। কুরআন মজীদের আরো এক জায়গায় এ ধরনের বাক্য প্রয়োগ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, জাহান্নামে আযাব দেয়ার সময় পাপী লোকদের বলা হবেঃ "নাও, এর মজা আস্বাধন করে নাও। তুমি অতি বড় সম্মানী মানুষ কিনা।" [সূরা আদ-দুখান: ৪৯]

اَیَحۡسَبُ الۡاِنۡسَانُ اَنۡ یُّتۡرَکَ سُدًی

৩৬. মানুষ কি মনে করে যে, তাকে এমনি ছেড়ে দেয়া হবে?

আয়াতের অর্থ হলো, মানুষ কি নিজেকে মনে করে যে তার স্রষ্টা তাকে এ পৃথিবীতে দায়িত্বহীন করে ছেড়ে দিয়েছেন? এ-কথাটিই কুরআন মজীদের অন্য একস্থানে এভাবে বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের বলবেন, "তোমরা কি মনে করেছে যে, আমি তোমাদের অনর্থক সৃষ্টি করেছি? তোমাদেরকে কখনো আমার কাছে ফিরে আসতে হবে না?" [সূরা আল মুমিনুন: ১১৫] এ দু'টি স্থানে মৃত্যুর পরের জীবনের অনিবার্যতার প্রমাণ প্রশ্নের আকারে পেশ করা হয়েছে। প্রশ্নের তাৎপর্য হলো আখেরাত যে অবশ্যই হবে তার প্রমাণ। [ইবনে কাসীর]

اَلَمۡ یَکُ نُطۡفَۃً مِّنۡ مَّنِیٍّ یُّمۡنٰی

৩৭. সে কি বীর্যের স্খলিত শুক্রবিন্দু ছিল না?

ثُمَّ کَانَ عَلَقَۃً فَخَلَقَ فَسَوّٰی

৩৮. তারপর সে 'আলাকা'য় পরিণত হয়। অতঃপর আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেন এবং সুঠাম করেন।

فَجَعَلَ مِنۡهُ الزَّوۡجَیۡنِ الذَّکَرَ وَ الۡاُنۡثٰی

৩৯. অতঃপর তিনি তা থেকে সৃষ্টি করেন যুগল—নর ও নারী।

اَلَیۡسَ ذٰلِکَ بِقٰدِرٍ عَلٰۤی اَنۡ یُّحۡیِۦَ الۡمَوۡتٰی

৪০. তবুও কি সে স্রষ্টা মৃতকে পুনর্জীবিত করতে সক্ষম নন?

এক বর্ণনায় এসেছে, সাহাবীগণের একজন তার ঘরের ছাদে সালাত আদায় করত; যখনই সূরা আল-কিয়ামাহ এর এ আয়াতে পৌছত তখনই সে বলত: سُبْحَانَكَ فَبَلَى (সুবহা-নাকা ফাবালা), অর্থাৎ তুমি পবিত্র, অবশ্যই (তুমি সক্ষম)। (আবূ দাউদ ৮৮৩, ৮৮৪নং, বাইহাক্বী)

ফুটনোট

◘ সূরার শুরুতে দুইটি বিষয়ের শপথ উল্লেখ করা হয়েছে- কিয়ামতের দিনব, এবং নাফসে লাওয়ামা।

◘ মূলতঃ নফস তিনটি গুণে গুণান্বিত হয়। নফসে আম্মারা, লাওয়ামা ও মুতমায়িন্নাহ। নাফসে আম্মারা - সে মানুষকে মন্দ কাজে লিপ্ত হতে জোরদার আদেশ করে। নফসে লাওয়ামা-মন্দ কাজ ও ত্রুটির কারণে অনুতপ্ত হতে শুরু করে। সৎকর্মে উন্নতি ও আল্লাহর নৈকট্যলাভে চেষ্টা করতে করতে যখন শরীয়তের আদেশ-নিষেধ প্রতিপালন তার মজ্জাগত ব্যাপার হয়ে যায় এবং শরীয়তবিরোধী কাজের প্রতি স্বভাবগত ঘৃণা অনুভব করতে থাকে, তখন এই নফসই মুতমায়িন্নাহ বা সন্তুষ্টচিত্ত উপাধি প্রাপ্ত হয়।

◘ আখিরাত অস্বীকারকারীরা নানা যুক্তি দেয় যে, কিয়ামত কখন হবে বা মৃত্যুর পর আবার একত্রিত করা সম্ভব কি না? উত্তরে এখানে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে- শুধুমাত্র বড় বড় হাড়গুলো একত্রিত করে পুনরায় দেহের কাঠামো প্রস্তুত করতে পারবেন এমন কিছুই নয়। বরং আমাদের দেহের সূক্ষ্মতম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এমনকি আঙ্গুলের জোড়গুলোও, রেখাগুলোও পুনরায় ঠিক তেমন করে বানাতে তিনি সক্ষম।

◘ নফসই মুতমায়িন্নাহ যাদের অর্জিত হয় তারা দ্বীনী ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহ বা প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে মুক্ত হয়ে 'কালবে সালীম' বা সুস্থ হৃদয়ের অধিকারী হয়।

◘ আখেরাত অবিশ্বাসকারীদের দু'টি রোগ বা কারণ উল্লেখ রয়েছে সূরাটিতে- এক. মানুষ তার পাপাচার ভবিষ্যতেও করতে চায় (আয়াত ৫) দুই. তোমরা দুনিয়ার জীবনকে ভালবাস আর আখেরাতকে উপেক্ষা করে (আয়াত ২০-২১)

◘ কিয়ামতের দিনের কিছু পরিস্থিতি এই সূরায় উল্লেখ করা হয়েছে-

- যখন চোখ স্থির হয়ে যাবে- অর্থাৎ যখন চক্ষুতে ধাঁধা লেগে যাবে।
- চন্দ্র জ্যোতিহীন হয়ে যাবে
- চাঁদ ও সূর্যের পরস্পর একাকার হয়ে যাবে
- মানুষের পালাবার কোন স্থান থাকবে না, থাকবে আশ্রয়স্থল

◘ কিয়ামতের দিন ঈমানদারদের অবস্থা হবে-

- তাদের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে
- তারা তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে।

◘ সাহাবীগণের একজন তার ঘরের ছাদে সালাত আদায় করত; যখনই সূরা আল-কিয়ামাহ শেষ আয়াতে পৌছত তখনই সে বলত: سُبْحَانَكَ فَبَلَى (সুবহা-নাকা ফাবালা), অর্থাৎ তুমি পবিত্র, অবশ্যই (তুমি সক্ষম)।

কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২৪
প্রস্তুতি সহায়ক তাফসীর নোট পর্বঃ ২১
ইলমুত তাজওঈদ

মাখরাজ

মাখরাজ বলা হয় আরবী অক্ষর গুলো মুখ ও গলা'র যেসব স্থান থেকে উচ্চারিত হয় সেসব স্থানকে। ২৯টি অক্ষর প্রত্যেকটি তার নিজস্ব স্বকীয়তা অনুযায়ী মুখ ও গলার মোট ১৭টি স্থান থেকে উচ্চারিত হয়। তাই 'মাখরাজ' মোট ১৭টি। এই ১৭টি '**মাখরাজ**' আবার উচ্চারিত হয় ৫ স্থান থেকে যাকে '**মাকাম**' বলা হয়। এক অক্ষরের উচ্চারণ আরেক অক্ষরের মতো হয়ে গেলে অর্থের পরিবর্তন হয়ে যায় তাই মাখরাজ জানা ও তা মেনে কুরআন পড়া অতীব জরুরী একটি বিষয়।

৫টি মাকাম

جوف- জওফ অর্থাৎ মুখের মধ্যের খালি জায়গা

حلق- হলক অর্থাৎ কণ্ঠনালী

لسن- লিসান অর্থাৎ জিহ্বা

شفتان- শাফাতান অর্থাৎ দুই ঠোঁট

خيشوم- খাইশুম অর্থাৎ নাসিকামূল

২৯টি অক্ষরের মাখরাজ				
মাকাম অর্থাৎ উচ্চারণের স্থান	মাখরাজ উচ্চারণের উপস্থান ও সংখ্যা	মাখরাজ অর্থাৎ উচ্চারণের উপস্থান	হরফ সংখ্যা	হরফ
জউফ অর্থাৎ মুখের মধ্যের খালি জায়গা থেকে	১ টি	মুখের ভিতরের খালি জায়গা	৩ টি (শর্ত সাপেক্ষে)	وا ي
হলক অর্থাৎ কণ্ঠনালী থেকে	৩ টি	আদনায়ে হলক	৬ টি	خ غ
		অসতে হলক		ع ح
		আকসায়ে হলক		ء ه
লিসান অর্থাৎ জিহ্বা থেকে	১০ টি	আকসায়ে লিসান (আলজিব) ও তালু	১৮ টি	ق
		আকসায়ে লিসান ও তালু থেকে (সামান্য মুখের দিকে সরে)		ك
		ওছতে লিসান (জিহ্বার মধ্যস্থল) ও তালু		ج ش ى

		জিহ্বার ডান/বাম কিনারা ও আদরাসে উলিয়া (পিষণ দাত) এর মাড়ি		ض
		জিহ্বার সামনের কিনারা ও উপরের দাতের মাড়ি ও তালুর কিছু অংশ		ل
		উপরের মাখরাজ থেকে সামান্য মুখের দিকে সরে		ن
		জিহ্বার সামনের অংশের পিঠ ও সানায়া উলিয়া(উপরের মধ্যভাগের দুই দাত) এর মাড়ি		ر
		জিহ্বার অগ্রভাগ ও সানায়া উলিয়ার মাড়ি ও তালুর কিছু অংশ		ت د ط
		জিহ্বার অগ্রভাগ এবং সানায়া উলিয়া ও সানায়া সুফলা (নিচের মধ্যভাগের দুই দাত) এর মধ্যভাগ		ز س ص
		জিহ্বার অগ্রভাগ ও সানায়া উলিয়া এর অগ্রভাগ		ث ذ ظ
শাফাতান অর্থাৎ দুই ঠোঁট থেকে	২ টি	সানায়া উলিয়ার অগ্রভাগ ও নিচের ঠোটের ভিতরের অংশ	৪ টি	ف
		উভয় ঠোটকে মিলিয়ে		ب م و
খাইশুম অর্থাৎ নাসিকামূল থেকে	১টি	নাকের মূল	২ টি (শর্ত সাপেক্ষে)	ن م

মাদ্দ এর পরিচয়

মাদ্দ অর্থ দীর্ঘ করা বা লম্বা করা। পরিভাষায় টেনে বা দীর্ঘ করে পড়াকে মাদ্দ বলে।

মাদ্দের হরফ তিনটি। যেমনঃ (ا, و , ى)

এক আলিফ মাদ্দ তিন প্রকার। যথাঃ

(১) মাদ্দে তবায়ী

(২) মাদ্দে বদল

(৩) মাদ্দে লীন

মাদ্দে তবায়ী: যবরের বাম পাশে খালি আলিফ (ا), যেরের বাম পাশে যযম ওয়ালা ইয়া (يْ), পেশের বাম পাশে যযম ওয়ালা ওয়াও (وْ) হলে এক আলিফ টেনে পড়তে হয়, তাকে মাদ্দে তবায়ী বলে বা মাদ্দে আছলী বলে। যেমনঃ(بَا, بِيْ , بُوْ)

আবার খাড়া যবর (ٰ), খাড়া যের (ٖ), উল্টা পেশ (ٗ) থাকলে এক আলিফ টেনে পড়তে হয়। যেমনঃ
(**قٰلَ, بِهٖ, لَهٗ**)

মাদ্দে বদল: মাদ্দের হরফের পূর্বে “হামযাহ” আসলে এক আলিফ টেনে পড়তে হয়, ইহাকে মাদ্দে বদল বলে।আবার হামযায় খাড়া যবর (ٰ), খাড়া যের (ٖ), উল্টা পেশ (ٗ) হলে তাকেও মাদ্দে বদল বলে ।
যেমনঃ

اِيْمَانًا	اُوْمِنَ	اٰمَنَ
اٰمِيْنٌ	اِلٰفِ	اُوْتِيَ

লীনের হরফ

লীনের হরফ ২টি।যথাঃ

যবর এর বাম পাশে যযম ওয়ালা ওয়াও (وْ)

যবর এর বাম পাশে যযম ওয়ালা ইয়া (يْ)

মাদ্দে লীন: ওয়াও সাকিন অথবা ইয়া সাকিন এর পূর্বে যবর হলে এবং পরবর্তী হরফে ওয়াক্‌ফ (নিঃশ্বাস ও আওয়াজকে শেষ করে পড়ার নাম ওয়াক্‌ফ) করলে এক আলিফ টেনে পড়তে হয় , ইহাকে মাদ্দে লীন বলে।
যেমনঃ **خَوْفُ , بَيْتُ**

এক আলিফ পরিমাণ লম্বা বলতে কতটুকু বোঝায়?

দুটি হরকত পড়তে যতোটুকু সময় লাগে এক আলিফ টেনে পড়তে ততোটুকু সময় লাগে।আবার , একটি আংগুল স্বাভাবিক গতিতে বন্ধ থেকে খুলে সোজা করতে যে সময় লাগে সেই সময় পরিমান হচ্ছে এক আলিফ।

তিন আলিফ মাদ্দ

তিন আলিফ মাদ্দ দুই প্রকার। যথাঃ

(১) মাদ্দে আরেজী

(২) মাদ্দে মুনফাসিল

মাদ্দে আরেজী: মাদ্দের হরফের পরে ওয়াক্‌ফ করলে এবং পরবর্তী হরফটি অস্থায়ী সাকিন হলে তিন আলিফ টেনে পড়তে হয়। ইহাকে মাদ্দে আরেজী বলে। যেমনঃ **يَعْلَمُوْنَ , حِسَابُ**

মাদ্দে মুনফাসিল: মাদ্দের হরফের বাম পাশে আলিফের ছুরতে হামযাহ আসলে তাকে মাদ্দে মুনফাসিল বলে। ইহাকে তিন আলিফ লম্বা করে পড়তে হয়।যেমনঃ **لَآاِلٰهَ اِلَّااللّٰهُ**

চার আলিফ মাদ্দ পাঁচ প্রকার। যথাঃ

(১) মাদ্দে মুত্তাসিল

(২) মাদ্দে লাযিম কালমী মুসাক্কাল

(৩) মাদ্দে লাযিম কালমী মুখাফ্‌ফাফ

(৪) মাদ্দে লাযিম হারফী মুসাক্কাল
(৫) মাদ্দে লাযিম হারফী মুখাফ্‌ফাফ

মাদ্দে মুত্তাসিল: মদের হরফের পরে একই শব্দে হামযাহ্‌ আসলে চার আলিফ টেনে পড়তে হয়, ইহাকে মাদ্দে মুত্তাসিল বলে। যেমনঃ **جَآءَ, سَوَآءٌ**

মাদ্দে লাযিম কালমী মুসাক্কাল : একই শব্দে মাদ্দের হরফের পরে তাশদীদ যুক্ত হরফ আসলে চার আলিফ টেনে পড়তে হয়, ইহাকে মাদ্দে লাযিম কালমী মুসাক্কাল বলে।যেমনঃ **ضَآلِّ, دَآبَّةِ**

মাদ্দে লাযিম কালমী মুখাফ্‌ফাফ: একই শব্দে মাদ্দের হরফের পরে যজম যুক্ত হরফ আসলে চার আলিফ টেনে পড়তে হয়, ইহাকে মাদ্দে লাযিম কালমী মুখাফ্‌ফাফ বলে।যেমনঃ **آلْئٰنَ , آلْآنَ**

মাদ্দে লাযিম হারফী মুসাক্কাল: কোনো শব্দ বা কালিমা ব্যতীত শুধু হরফের মধ্যে মাদ্দের হরফের পর তাশদীদ যুক্ত সাকিন আসলে চার আলিফ টেনে পড়তে হয়, ইহাকে মাদ্দে লাযিম হারফী মুসাক্কাল বলে।যেমনঃ **الٓمّٓ , طٰسٓمّٓ**

মাদ্দে লাযিম হারফী মুখাফ্‌ফাফ: কোন শব্দ বা কালিমা ব্যতীত শুধু হরফের মধ্যে মাদ্দের হরফের পর যজম যুক্ত সাকিন আসলে চার আলিফ টেনে পড়তে হয়, ইহাকে মাদ্দে লাযিম হারফী মুখাফ্‌ফাফ বলে।যেমনঃ **عٓسٓقٓ, قٓ, نٓ**

কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২৪
প্রস্তুতি সহায়ক তাফসীর নোট পর্বঃ ২২
লুগাতুল কুরআন

لَهُمْ	তাদের উদ্দেশ্যে	يَكْذِبُونَ	তারা মিথ্যা বলতো
نَحْنُ	আমরা	يَعْلَمُونَ	তারা জানে
هُمُ	তারাই	حَتَّىٰ	যতক্ষণ না
كَفَرُوا	অবিশ্বাস করেছে	كُلُّ	সব
الْمُفْسِدُونَ	বিপর্যয় সৃষ্টিকারী	بَعْدِ	পরে
ءَامَنَّا	আমরা ঈমান এনেছি	أُنزِلَ	নাযিল করা হয়েছে
هُدًى	হেদায়াত	كُنتُمْ	তোমরা/আপনি
يَشَآءُ	তিনি ইচ্ছে করেন	يَرْجِعُونَ	ফিরে যাবে
أَنصَارُ	সাহায্যকারী	رَبَّنَآ	হে আমাদের রব
طَيْرًۢا	পাখি	وَٱشْهَدْ	এবং তুমি সাক্ষী থাক
الطِّينِ	মাটি	إِذْ	যখন
بِغَيْرِ	ব্যতীত	نَفْسٍ	ব্যক্তি
لَكَ	তোমার জন্য	رَءُوفٌ	দয়াশীল
الْمُلْكِ	রাজত্বের	يُظْلَمُونَ	জুলুম করা হবে
عَزِيزٌ	পরাক্রমশালী	شَدِيدٌ	কঠিন

উলুমুল কুরআন

কুরআনে উল্লেখিত রাসূলদের নামঃ

রাসূলগণের মধ্য থেকে ২৫ জনের নাম প্রায় ৫১০ টি আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে-

১. আদম (আঃ) ২৫ বার।

২. ইদরীস (আঃ) ২ বার।

৩. নূহ (আঃ) ৪৩ বার। .

৪. হুদ (আঃ) ৮ বার।

৫. সালিহ (আঃ) ৯ বার।

৬. ইবরাহীম (আঃ) ৬৯ বার।

৭. লুত (আঃ) ১৭ বার।

৮. ইসমাঈল (আঃ) ১২ বার।

৯. ইসহাক (আঃ) ১৭ বার।

১০. ইয়াকূব (আঃ) ১৬ বার।

১১. ইউসুফ (আঃ) ২৭ বার।

১২. আইয়ুব (আঃ) ৪ বার।

১৩. শুয়াইব (আঃ) ১১ বার।

১৪. মূসা (আঃ) ১৩৬ বার।

১৫. হারুন (আঃ) ২০ বার।

১৬. ইউনুস (আঃ) ৪ বার।

১৭. দাউদ (আঃ) ১৬ বার।

১৮. সুলাইমান (আঃ) ১৭ বার।

১৯. ইল্‌ইয়াস (আঃ) ৩ বার।

২০. ইয়াসআ (আঃ) ১ বার।

২১. যুলকিফল (আঃ) ২ বার।

২২. যাকারিয়া (আঃ)৭ বার।

২৩. ইয়াহিয়া (আঃ) ৫ বার।

২৪. ঈসা (আঃ) ২৫ বার।

২৫. মুহাম্মাদ (সাঃ) ৪ বার।

মুহাম্মাদ (সাঃ) এর নাম সূরা আল-ইমরান ১৪৪, সূরা আহযাব ৪০, সূরা মুহাম্মাদ ২ ও সূরা ফাতহ ২৯ আয়াত। আল্লাহ কুরআনে সকল নবী-রাসূলের ক্ষেত্রে তাঁদের নাম ধরে সম্বোধন করেছেন এবং তাদের ঘটনা বর্ণনার সময় তাঁদের নাম উলেলখ করেছেন। কিন্তু মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর ক্ষেত্রে কুরআনে ‘‘হে নবী’’ বা ‘‘হে রাসূল’’ বলে তাঁকে সম্বোধন করা হয়েছে। আর তাঁর সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে ‘‘নবী’’, ‘‘রাসূল’’ বা ‘‘আবদ’’ বলা হয়েছে। এজন্য কুরআনে শুধুমাত্র ৪টি স্থান ছাড়া কোথাও তাঁর নাম উল্লেখিত হয় নি।

কুরআন মাজীদে বর্ণিত মূল প্রতিপাদ্য বিষয়াদি পাঁচ প্রকার :

এক. ইলমুল আহকাম বা সাংবিধানিক জ্ঞান। অর্থাৎ ইবাদাত-উপাসনা, লেনদেন, ঘর-সংসার, আচার-অনুষ্ঠান ও রাজনীতিসহ যে কোন ক্ষেত্রে ওয়াজিব, মুবাহ, মাকরুহ ও হারাম বিষয়াদির জ্ঞানই হল সাংবিধানিক জ্ঞান।

দুই. ‘‘ইলমুল মুখাসামা তথা তর্ক শাস্ত্রীয় জ্ঞান। অর্থাৎ ইয়াহুদী, নাছারা, মুশরিক ও মুনাফিক এ চার ভ্রষ্টদলের সাথে তর্ক শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করা ।

তিন. ইলমুত তাযকীর বি আলাইল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর নিদর্শন সংক্রান্ত জ্ঞান।

চার. ইলমুত তাযকীর বি আয়্যামিল্লাহ তথা আল্লাহ্ তা'আলার সৃজিত বিশেষ ঘটনাসমূহের জ্ঞান।

পাচ. ‘‘ইলমুত তাযকীর বিল মাউত তথা পারলৌকিক জ্ঞান। অর্থাৎ মৃত্যু ও তৎপরবর্তী অবস্থা, হাশর-নাশর, হিসাব, মীযান এবং জান্নাত-জাহান্নাম সম্পর্কিত জ্ঞান।

কুরআন মাজীদ নাযিল সংশ্লিষ্ট প্রকারসমূহঃ

নাযিল হওয়ার ক্ষেত্রে কুরআনের প্রকারভেদ হলো বারটি। যথা-

১. মাক্কী।

২. মাদানী।

৩. হাযারী অর্থাৎ গৃহে অবস্থানকালে অবতীর্ণ হওয়া।

৪. সাফারী অর্থাৎ ভ্রমণ অবস্থায় নাযিল হওয়া।

৫. নাহারী অর্থাৎ দিবাকালে নাযিল হওয়া।

৬. লাইলী অর্থাৎ রাত্রিকালীন নাযিল হওয়া।

৭. গ্রীষ্মকালে নাযিল হওয়া।

৮. শীতকালে নাযিল হওয়া।

৯. শয্যাবস্থায় নাযিল হওয়া।

১০. আসবাবে নুযূল অর্থাৎ কোন ঘটনার পূর্বে বা পরে না িল হওয়া।

১১ সর্বপ্রথম নাযিলকৃত আয়াতসমূহ ।

১২. সর্বশেষ নাযিলকৃত আয়াত, সূরা ।

কুরআনের অবতরণ

আল-কুরআন মহান আল্লাহর বাণী। এটা মানব রচিত কোন গ্রন্থের মত গ্রন্থ নয়। মহান আল্লাহ বিশ্বমানবতার হিদায়াতের জন্য তার মনোনীত সর্বশেষ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর নিকট বিভিন্ন প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ অহীর সমষ্টি। যা নবী জীবনের সুদীর্ঘ ২৩ বছর কালব্যাপী নাযিল হয়েছিল। এটি ‘‘লাওহে

মাহফুযে” সুরক্ষিত গ্রন্থ। কুরআন মাজীদ “লাওহে মাহফুয” থেকে মহানবীর (সাঃ) কাছে দু’পর্বে অবতীর্ণ হয়। প্রথমত, লাওহে মাহফুয হতে বাইতুল ইয্যাতে তথা “বাইতুল মামুরে” দ্বিতীয়, বাইতুল ইয্যাত হতে মহানবীর (সাঃ) প্রতি।

ওহীর লিখকবৃন্দ

হযরত যায়িদ ইব্ন সাবিত রো) ছাড়াও খারা ওহী লিপিবদ্ধ করে রাখার দায়িত্ব পালন করতেন, তাদের মধ্যে প্রথম চার খলীফা, হযরত উবাই ইব্ন কাব, হযরত আয্ যুবাইর ইবনুল আওয়াম, হযরত মু’আবিয়া, হযরত আববাস ইব্ন সা'ঈদ, আবদুল্লাহ ইবৃন রাওয়াহা, ইব্ন মাসউদ, খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ, মুগীরা ইব্ন শুবা ও হানযালা রাযিয়াল্লাহু আনহুম-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে ।

আল-কুরআন মুদ্রণ

মুদ্রণযন্ত্রের প্রচলন হওয়ার আগ পর্যন্ত আল-কুরআন হাতে লেখা হতো। যুগে যুগেই এমন একদল নিবেদিতপ্রাণ লোক ছিলেন, যাদের একমাত্র সাধনা ছিল আল-কুরআন লিপিবদ্ধ করা । আল-কুরআনের প্রতিটি অক্ষর সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করার লক্ষ্যে এ সাধক লিপিকারগণ যে অনন্য সাধনার স্বাক্ষর রেখে গেছেন, ইতিহাসে এর অন্য কোন নযীর নেই। কুরআনের সে লিপি সৌন্দর্যের ইতিহাস এতই দীর্ঘ যে, এজন্য স্বতন্ত্র গ্রন্থ প্রণয়ন করা যেতে পারে। মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কারের পর সর্বপ্রথম জার্মানীর হামবুর্গ শহরে হিজরী ১১১৩ সনে আল-কুরআন মুদ্রিত হয়। মুদ্রিত সেই আল-কুরআনের একটি কপি মিসরের দারুল কুতুবে এখনো সংরক্ষিত রয়েছে। কিন্তু মুসলিম-জাহানে সে সমস্ত মুদ্রিত কপি গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়নি।

মুসলিমদের মধ্যে সর্বপ্রথম মাওলায়ে উসমান কর্তৃক রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গ শহরে ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে আল-কুরআন মুদ্রিত হয়। প্রায় একই সময়ে কাযান শহর থেকেও একটি কপি মুদ্রিত হয়। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে ইরানের তেহরানে লিথু মুদ্রণযন্ত্রে আল-কুরআনের আর একটি কপি মুদ্রিত হয়। এরপর থেকে দুনিয়ার অন্যান্য এলাকাতেও ব্যাপকভাবে ছাপাখানার মাধ্যমে আল-কুরআনের কপি যুদ্রণের রেওয়াজ প্রচলিত হয় ।

আমসালুল কুরআন

দৃষ্টান্ত বর্ণনা এক প্রকার ভাষা অলঙ্কার। প্রত্যেক ভাষায় দৃষ্টান্তের ব্যবহার দেখা যায়। আল্লাহ তা ‘আলাও কুরআনে অসংখ্য দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। এগুলোকে আমসালুল কুরআন বলা হয়। পবিত্র কোরআনের প্রায় ৪০ জায়গায় এ ধরনের উপমা ব্যবহৃত হয়েছে।

আকসামুল কুরআন

কসম শব্দের বহুবচন হলো আকসাম। যার অর্থ শপথ করা, হলফ করা, দৃঢ়তার সাথে কিছু ব্যক্ত করা। আল কুরআনে মহান আল্লাহ্ বিভিন্ন বিষয়ে কসম করে বক্তব্য দিয়েছেন। কুরআনে বর্ণিত শপথগুলোকেই আকসামুল কুরআন বলে।

ইজাযুল কুরআন

পারিভাষিক অর্থে, ই’জায হল এমন এক গুণ যা অনুরূপ কোনো কিছু নিয়ে আসার ক্ষেত্রে সাধারণ ক্ষমতাকে অতিক্রম করে যায়। কুরআন মুসলমানদের মূল ধর্মগ্রন্থ। এটি আল্লাহ্‌র বাণী এবং এর ই’জায গুণ রয়েছে। মহান আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনের সূরা বনী ইসরাইলের ৮৮ নম্বর আয়াতে বলেন- “বলে দাও, এই কুরআনের মত বাণী তৈরি করে আনার জন্য যদি সমস্ত মানুষ ও জিন একত্র হয়ে যায়, তবুও তারা এ রকম কিছু আনতে পারবে না,

তাতে তারা একে অন্যের যতই সাহায্য করুক।" এই আয়াতে মহান আল্লাহ তায়ালা সমগ্র মানব ও জিন জাতিকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন এই কোরআনের মতো একটি আয়াত রচনা করার। সাধারণ অর্থে পৃথিবীর কোন মানুষের রচিত কিতাব বা বই এর বিষয়ে সেই বইয়ের লেখক এরকম চ্যালেঞ্জ দিতে পারেনি। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা এই কোরআনের বিষয়ে চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন। মূলত এটাই হলো ইজাযুল কোরআন বা কুরআনের অলৌকিকতা।

কাসাসুল কুরআন

কাসাসুল কুরআন শব্দের অর্থ কুরআনের গল্প। কুরআনে বর্ণিত ঘটনাবলির অধিকাংশই প্রাচীনকালের বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী ও তাদের প্রতি প্রেরিত নবি-রসূল সম্পর্কিত। আল্লাহ তা'আলা এইসব ঘটনাপ্রবাহের মাঝেই সকল যুগের অধিবাসীদের জন্য শিক্ষা রেখেছেন। বিশুদ্ধ তাওহীদ, প্রকৃত মুমিনের বৈশিষ্ট্য, যুলুম-যালিমের পরিচয় এবং ধরণ, দাওয়াতি নীতি, দ্বীনের প্রায় সকল বুনিয়াদি শিক্ষা আল্লাহ তা'আলা এসব উদাহরণের মাধ্যমে দিয়েছেন। কুরআনে উল্লেখিত গল্পগুলোকেই কাসাসুল কুরআন বলা হয়।

তাদাব্বুরে কুরআন

তাদাব্বুর (تَدَبُّر) অর্থ গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করা। অনুধ্যান করা। সাধারণত কুরআন কারীমের আয়াত নিয়ে চিন্তাভাবনাকে তাদাব্বুর বলে। কুরআনের তাদাব্বুর সমস্ত শরীয়তের যাবতীয় ইলমের চাবিকাঠি। তাদাব্বুরের মাধ্যমে কুরআন থেকে কল্যাণকর দিক-নির্দেশনা লাভ করা যায়। ঈমান বৃদ্ধি পায়।

সমাপ্ত

মাউন পরিচিতি

আমাদের সমাজের বিশাল অংশ মানুষ নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত । আমাদের দেশে মানুষের সমস্যাগুলো সমাধানে পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে না। যার ফলে দিনে দিনে সমস্যা বাড়ছে। মানুষ অপরাধের দিকে পা বাড়াচ্ছে এবং নৈতিক শিক্ষাগতলো ভুলে যাচ্ছে। আমাদের সমাজে কিছু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন মানুষকে ও সমাজকে কল্যাণমুখী করার এবং সমস্যাগুলো সমাধানে কাজ করার কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা অতি নগণ্য । আপনার-আমার এবং আমাদের উপরও সমাজের এবং সমস্যাগ্রস্থ ব্যক্তিদের অধিকার রয়েছে যে আমারও সমস্যাগুলোর সমাধানে কাজ করি।

ইসলাম যেহেতু আমাদেরকে একটি সুন্দর ব্যবস্থাপনা দিয়েছে। যার শিক্ষা ও দিক-নির্দেশনার আলোকে কাজ করলে একটি সুন্দর, সমৃদ্ধ এবং ভারসাম্যপূর্ণ সমাজব্যবস্থা গড়া সম্ভবনা। একটি সমৃদ্ধ এবং ভারসাম্যপূর্ণ সমাজব্যবস্থা গড়ার স্বপ্নকে সামনে নিয়ে ২০২১ সাল থেকে আমরা মাউন ফাউন্ডেশনের কাজ শুরু করেছি।

আলহামদুলিল্লাহ্, ইতিমধ্যে আমরা অনেকগুলো কর্মসূচী বাস্তবায়ন করেছি এবং কয়েকটি প্রজেক্ট চলমান। আমাদের প্রজেক্টগুলো হলো-

* মক্তব প্রজেক্ট - মক্তবের শিক্ষার্থীদের মক্তব শিক্ষার প্রতি আগ্রহী করে তুলার জন্য আমরা শিক্ষার্থীদের মাঝে কুরআন, কায়দা, আমপারা, রেহাল, তাজভীদ ও দোয়ার বই ইত্যাদি বিভিন্ন উপকরণ বিতরণ করে থাকি।

* যাকাত ম্যানেজমেন্ট- ভারসাম্যপূর্ণ সমাজব্যবস্থার জন্য ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ সমাধান হচ্ছে যাকাতব্যবস্থা। যাকাত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং এর থেকে উপকৃত হওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হচ্ছে সঠিকভাবে এর ম্যানেজমেন্ট। যাকাত সচেতনা বৃদ্ধি করা, যাকাত আদায় করা এবং প্রাপকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার সামগ্রিকবিষয় থাকবে এই প্রকল্পে।

* সিস্টার্স কেয়ার প্রজেক্ট গরীব, অসহায়, অসচ্ছল ও ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত মহিলাদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান। সুন্দর এক সমৃদ্ধ সমাজ বিনির্মানে মহিলারা যাতে তাদের ভূমিকা পালন করতে পারে যেজন্য তাদেরকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করাই এই প্রজেক্টের উদ্দেশ্য ।

* জরুরী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা- যেকোন প্রাকৃতিক ও সামাজিক দুর্যোগে আক্রান্তদের সবোচ্চ সহযোগিতা প্রদান, ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম, পূর্ণবাসন কার্যক্রাম সহ দৃযোর্গ মোকাবেলায় দ্রুত ও প্রয়োজনীয় সকল প্রদক্ষেপ থাকবে এই প্রকল্পের আওতাধীন।

* খাদ্য বিতরণ কর্মসূচী- রামাদান ফুড প্যাক বিতরণ, ঈদ খাবার সামগ্রী বিতরণ সহ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জেলায় আমাদের খাদ্য বিতরণ কর্মসূচী রয়েছে।

* কুরবানী প্রজেক্ট- এই প্রজেক্টের মাধ্যমে আমরা চেষ্টা করছি যেসব গ্রামে বা এলাকায় কুরবানীর গোশত পৌঁছায় না সেসব এলাকায় পৌঁছে দেওয়া এবং গরীব, মধ্যবিত্ত, নিম্ম মধ্যবিত্ত সবার কাছে কুরবানীর গোশত পৌঁছে দেওয়ার ।

এছাড়াও কর্দে হাসানা ব্যবস্থাপনা, ইসলামিক ওয়াফক/ইনভেস্টমেন্ট সহ আরো কিছু প্রজেক্ট পরিকল্পনাধীন রয়েছে।

আল্লাহ্ আমাদের প্রত্যকে বিভিন্নভাবে নিয়ামত দিয়ে পরিপূর্ণ করে রেখেছেন। কাউকে দিয়েছেন জ্ঞান বা প্রজ্ঞা, কাউকে দিয়েছে প্রাচুর্যতা এবং কাউকে দিয়েছেন সময়ের নিয়ামত। আমরা প্রত্যকে নিজস্ব যোগ্যতা, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা আলোকে প্রচেষ্টা চালালে ভালো কিছু সমাজ ও উম্মাহকে উপহার দিতে পারবো। ইনশাআল্লাহ্

কুরআন
অধ্যয়ন
প্রতিযোগিতা

প্রস্তুতি সহায়ক তাফসীর নোট

মাউন ফাউন্ডেশন

মাউন ফাউন্ডেশন
Maun Foundation